ডাঃ দাসের

এভারেস্ট ডায়েরী

(১৯৬০)

DR. DAS'S "EVEREST DIARY"

"Second Five Year Plan—Development of regional languages. The popular price of the book has been possible through a subvention received from Government."

ডাঃ দাসের

এভারেস্ট ডায়েরী

ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাস

প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের
সদস্য, বর্তমানে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারীং
ইনস্টিটিউটের ডাক্তার ও ফিজিওলজিস্ট
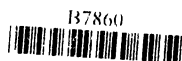
সম্পাদনা

হিমাংশুকুমার দাস

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

CHIEF MINISTER
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

কলিকাতা
৮. ১২. ৬১

হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ শুধু ভৌগোলিক, রাষ্ট্রিক বা ভূতাত্ত্বিক নয়। চেতনার রাজ্যেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তা ছাড়া, এর দুস্তর গিরিশৃঙ্গগুলি সারা পৃথিবীর লোককে বীর্যের, শৌর্যের, সহনশীলতার দ্বন্দ্বে আহ্বান করছে। গত একশো বছরে কতো অভিযান এই দুরারোহ পর্বতমালার দিকে দিকে আক্রমণ চালিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। স্বাধীন ভারতে আমরাও পেছিয়ে নেই। ভারতবাসীর কাছে হিমালয়ের কথা কিছু অভিনব নয়। যুগ যুগ ধ'রে তার যোগী-ভোগী-ত্যাগী-তপস্বী-মনস্বী-পরিব্রাজকের দল হিমালয়ের নিশির ডাক শুনে পথে নেমেছেন—কন্যাকুমারিকা থেকে বদরিকায় গেছেন, ব্রহ্মপুত্র থেকে গঙ্গা-যমুনার উৎস-সন্ধানে। দক্ষিণের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ শংকরাচার্য এখানে এসে তাঁর এক 'ধাম' প্রতিষ্ঠা করলেন, উজ্জয়িনী থেকে কবি কালিদাস নগাধিরাজের প্রশস্তি গাইলেন, বাংলার দীপংকর শ্রীজ্ঞান বেরিয়ে পড়লেন এর পথে পথে ধর্মের আলো নিয়ে, ভারতপথিক রামমোহন ঘুরলেন এর শৃঙ্গে শৃঙ্গে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেখলেন ভারতের সঞ্চিত তপস্যার মহিমাকে।

আজকের যুগে চলমান জীবনের সঙ্গে তাল রেখে হিমালয়কে শুধু ভাবমুগ্ধতার চোখে দেখলেই চলবে না। আশা করবো, আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা শুধু কল্পনার রঙিন চশমা দিয়েই বা হিল্‌স্টেশনের 'ম্যালে' ব'সেই হিমালয়কে গ্রহণ করবেন না—বেরিয়ে পড়বেন তার দিকে দিকে, তার পাহাড়ে-জঙ্গলে, তার উপত্যকা-

অধিত্যকায়। কতো অফুরন্ত তথ্য সেখানে আছে, কতো ভেষজ, কতো রত্ন, কতো জ্ঞানবিজ্ঞানের ইঙ্গিত, কতো প্রাকৃতিক সম্পদের মালমশলা।

দার্জিলিঙের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারীং ইন্‌স্টিটিউটের কথা অনেকেই ভালো ক'রে জানেন না। তেনজিংএর এভারেস্ট-জয়ের পরেই এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন। প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট-অভিযানের ডাক্তার-সদস্য এই ইন্‌স্টিটিউটের ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাসের এভারেস্ট ডায়েরী, ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিংএর নেতৃত্বে ভারতীয় প্রচেষ্টার অপূর্ব কাহিনী। আশা করি দেশের যুবকরা এই ডায়েরী পাঠ ক'রে শুধু জ্ঞান ও আনন্দই লাভ করবেন না, উৎসাহ ও উদ্দীপনাও পাবেন।

উ ৎ স র্গ

পিতৃদেবের পাদপদ্মে

ভূমিকা

বই লেখার স্বপ্ন আমি কোনদিন দেখিনি। তাই ঐ অসাধ্য সাধনে চেষ্টাও করিনি কোনদিন। কিন্তু দায়ে পড়ে দেখলুম সবই করতে হয়। অন্ততঃ আমাকে তা করতে হল।

আমার ছোট ভাই, এই বইয়ের সম্পাদনা যে করেছে, তারই মন রাখতে আজ আমার এই অনুশীলন। সহসা স্টেথিস্‌কোপ, ছুরি-কাঁচি ফেলে খাতা-কলম হাতে বসেছি। অধ্যয়ন আর রচনায় মনোনিবেশ করেছি। সহযাত্রী বন্ধুরা বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রে ব্যঙ্গ করে বলেছে—ডাক্তারীর সঙ্গে সাহিত্য, এ যে একেবারে পরস্পর-বিরোধী সংকল্প। হালে পানি পাবে তো শেষ পর্যন্ত ?

—দেখা যাক্,—বলে থামিয়েছি ওদের। কিন্তু সন্দেহ ছিল খুব এ গুরু দায়িত্বের ব্যাপারে।

তবু, এ কথা ঠিক, আমি প্রতিশ্রুতিভ্রষ্ট হইনি। ভাইকে অভিযানে আসার দিন 'লিখব' বলে যে কথা আমি দিয়েছি, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিত্য আমি ডায়েরী লিখতে বসেছি। অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমায় লিখতেই হবে অভিযানের কথা—এই ছিল আমার স্থির সংকল্প। ডায়েরীটাকে সাজাবার গোছাবার, এক কথায় সম্পাদনা করবার সব দায়িত্ব ওর—এ চুক্তি ওর সঙ্গে আমার আগে থেকেই হয়েছে। তাই তার ভাবনা আমার কিছু ছিল না।

সত্য কথা বলতে কি, শহরের সান্নিধ্য ছেড়ে যতই পাহাড়ের সান্নিধ্যে আমি গিয়েছি, ততই আমি অভিভূত হয়েছি—ততই লেখালেখির সম্ভব-অসম্ভবের যুক্তিতর্ক আমার কাছে হার মেনেছে। আমি উপলব্ধি করেছি, শহরের জন-সমারোহে সমস্যাজর্জরিত

মনোবৃত্তির কেমন যেন আপনা-আপনি পরিবর্তন হচ্ছে—তুচ্ছ স্বার্থ কি মান-মর্যাদার হীন মাপ-পরিমাপের মোহ দূরীভূত হচ্ছে—উদার প্রকৃতির অনির্বচনীয় রূপরাশির মধ্যে আমি যেন ভেতরে ভেতরে এক কবি-মনের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছি—তারই নিত্য নতুন ছন্দে আলোকে আনন্দে আমি ভাব পেয়েছি ভাষা পেয়েছি, সুর পেয়েছি ছন্দ পেয়েছি—আমি লিখে গেছি। রহস্যময় হিমালয়ের কত অজানাকে আমি জেনেছি—কত অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানে যাযাবরের মত আমি ঠাঁই নিয়েছি—স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন ছেড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক কঠিন কর্মময় জীবনে আমি পদক্ষেপ করেছি—লেখার প্রেরণা সেখান থেকেও আমি কম পাইনি। আমি লিখে গেছি।

এ ছাড়াও আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি—হিমালয়ের পথে প্রান্তরে, অরণ্যে গহ্বরে, উপত্যকায় অধিত্যকায় যারা আড়ম্বরহীন দীনদরিদ্রের জীবন যাপন করে তারা প্রাণপ্রাচুর্যে, মহত্ত্বে, শৌর্য-বীর্যে তথাকথিত সভ্যসমাজের মানুষদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বরং স্নেহে ভালবাসায় ও অতিথিবাৎসল্যে তারা যেন তাদেরও অনেক উর্ধ্বে। তারা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। দীর্ঘদিনের আত্মীয়-বিচ্ছেদের বেদনা মুছিয়ে দিয়েছে। তাদেরই মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি ফেলে-আসা পথে আমার মা বাবা ভাই ও বোনেদের। লিখতে বসে তাদের কথা আমি বিস্মৃত হইনি; বরং নানাভাবে তাদেরই কথা আমার সর্বাগ্রে মনে পড়েছে। আর তাই যেমন করে পেরেছি, যেমন করে দেখেছি, ঠিক তেমন করে তাদেরও রূপায়িত করতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি আমি আমার লেখায়।

দলের সভ্যদের মধ্যে যে সব কথোপকথন আমি লিপিবদ্ধ করেছি তার কিছু কিছু ব্যঙ্গাত্মক। বইটাকে রসোত্তীর্ণ করতে সেগুলো এককথায় অপরিহার্য। কাউকে আক্রমণ কিংবা খেলো করার হীন প্রবৃত্তি নিয়ে আমি লিখতে বসিনি। অসাবধানতাবশে কোন জায়গায় যদি কারো প্রতি সে অন্যায় হয়ে থাকে, তার জন্যে আগে

থেকেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ডায়েরীটা যে আমার বেস্‌ক্যাম্পেই সমাপ্ত নয়, একথা বলাই বাহুল্য। কারণ, রসিক পাঠকদের নিশ্চয়ই সংবাদপত্রের সঙ্গে পরিচয় আছে, আর তারই মাধ্যমে তাঁরা জেনে থাকবেন, বেস্‌ক্যাম্পের পরই আমাদের সত্যিকার দুরূহ অভিযান শুরু হয়। আর তা অনেক দিন ধরেই।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, ডায়েরীটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছি। প্রথমভাগে বলতে চেয়েছি বেস্‌ক্যাম্প পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের একটা ধারা-বিবরণী—আর সেই সঙ্গে জায়গাবিশেষে ও আবহাওয়াভেদে হিমালয়ের বিস্ময়কর রূপান্তর, উচ্চতাভেদে উদ্ভিদের আমূল পরিবর্তন। সবশেষে স্থানীয় অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনধারা।

ঐ সমস্ত অধিবাসীদের ঘরের মানুষ আমাদের সহযাত্রী শত শত শেরপা, শেরপানী ও পোর্টাররা। তাদের সঙ্গে বিশেষ করে তাই যেখানে সংযোগ হারিয়েছি সেখানেই আমি প্রথম ভাগের যবনিকা টেনেছি। কারণ, তাদের জীবনদর্শনের বিরাট একটা অংশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে বেস্‌ক্যাম্প পর্যন্ত আমার পথটুকুতে।

বেস্‌ক্যাম্পের পরবর্তী কর্মসূচী এই একই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করতে গেলে ডায়েরীটার মূল আকর্ষণ নষ্ট করা হয়। তাই ডায়েরীটাকে দু'ভাগে ভাগ করা আমার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

অভিযান থেকে ফিরে এসে লেখার সবকিছু আমি ভায়ের হাতে তুলে দিই। দীর্ঘ দিন ধরে সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে সে তার সম্পাদনা শেষ করে, আর তার পরেই আমি তা প্রকাশের জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যাই।

এই প্রসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বান্তঃকরণে ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিংকে। কারণ, তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যতীত এ ব্যাপারে আমার এক পা-ও অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য হত। কৃতজ্ঞতা

জানাই Sponsoring Committee (I. M. E. E.)-এর সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দকে, বিশেষ করে মাননীয় শ্রী এইচ. সি. সারীন ও তাঁর আগুার-সেক্রেটারী শ্রী আর. এন. চক্রবর্তীকে। কারণ, বই প্রকাশে প্রথমোক্ত জনের সচেষ্ট সহানুভূতি এবং শেষোক্ত জনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা ও মতামত বইটাকে একটা বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ও শিক্ষাদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী ডি. এম. সেনকে। কারণ, তাঁদের উভয়ের সময়োচিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমার লেখা প্রকাশের ব্যয়বাহুল্যের অক্ষমতাকে চিন্তামুক্ত করেছে। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার অভিযানের প্রতিটি সভ্য, শেরপা, শেরপানী ও পোর্টারকে। কারণ, আমার বইয়ের অন্যতম প্রেরণা তাঁরাই। আর কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসব প্রথিতযশা সাহিত্যিক, অভিজ্ঞ অভিযাত্রী, শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারীং ইন্‌স্টিটিউটের কর্মীবৃন্দকে, যাঁদের বিবিধ তথ্য, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা আমার লেখার প্রতিটি ছত্রের প্রাণস্বরূপ। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার ছোট ভায়ের বন্ধু শ্রীবৈদ্যনাথ দাসকে, যার অকৃপণ সাহায্যে বইটির সম্পাদনা ত্বরান্বিত হয়েছে। আর উল্লেখ করি আমার স্ত্রী মীনাক্ষীর কথা, যার অকৃপণ সহযোগিতা, আন্তরিক সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা ব্যতীত এ বই প্রকাশ সম্ভব হত না।

হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারীং ইন্‌স্টিটিউট, দার্জিলিং

ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাস,
এ. এম. সি., ফিজিওলজিস্ট

'নম নম হিমাচল !
কত তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাম্যফল ;
মোরে দেছ তুমি নব আনন্দ,—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ
তোমারে হেরিয়া পরাণ ভরিয়া উছলিছে অবিরল।
নম নম হিমাচল !'

হিমালয় প্রসঙ্গে এভারেস্ট

এভারেস্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে আমাদের বিস্মৃত অতীতের দিকে ক্ষণেকের জন্যে একবার ফিরে তাকাতে হবেই। একদিনের বিলাসস্বপ্নে কিংবা মুহূর্তের উত্তেজনায় এভারেস্ট জয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি নিশ্চয়ই। এর পিছনে রয়েছে হারানো দিনের কত বেদনাময় ইতিহাস—সংগ্রামী মানুষের কর্মময় জীবনের কত রোমাঞ্চকর কাহিনী। এভারেস্ট তো দূরের কথা, ওই তুষারধবল নগাধিরাজ হিমালয়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শৃঙ্গও মানুষের কাছে দুরতিক্রম্য দুস্তর রহস্য হিসেবে পরিত্যক্ত ছিল কতকাল। ভয় আর বিস্ময়ের কুহেলিকায়, অজ্ঞতা আর সংস্কারের ঘনান্ধকারে পশুর মত মানুষ সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আত্মমগ্ন ছিল কতদিন।

তারপর এল সভ্যতার এক মহান লগ্ন। তারই আলোয় ধীরে ধীরে সে আত্মপ্রত্যয় লাভ করল…ধীরে ধীরে সে জ্ঞানের দীপ্তিতে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, সংযম ও অধ্যবসায়ের কৃচ্ছ্রসাধনে শক্তিমান হয়ে উঠল। নির্দিষ্ট সীমার মাঝে তাই একঘেয়ে জীবন তার কাছে কারাগার হয়ে উঠল। সে জানতে চাইল জানার বাইরে অজানা জগৎটাকে। কী তার রহস্য? কেন সে মানুষের নাগালের বাইরে যুগ যুগ ধরে দুর্ভেদ্য বিস্ময় হয়ে থাকবে? এই কৌতূহলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে সে ঘরছাড়া হল। দুর্গম গিরি আর দুস্তর কান্তার তার যেন একান্ত উৎসাহের কেন্দ্র হয়ে উঠল। ভয় আর কুসংস্কারের জটিলগ্রন্থি অতি অবজ্ঞার সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলে সে সপ্রতিভ ভাবে এসে দাঁড়াতে চাইল বিরাট উদার প্রকৃতির বিস্ময়কর রূপের মধ্যে। মুগ্ধবিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে সে মনে মনে সঙ্কল্প গ্রহণ করল—'একে জানতে হবে, বুঝতে হবে, অনুভব করতে হবে।'

আরম্ভ হল এইভাবে মানুষের দুঃসাহসিক অভিযান। কত

অজানার কালো যবনিকা অপসারিত হল··কত রহস্যের সমাধান হল···আবিষ্কারও হল কত কী !

সমগ্র হিমালয় দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় হাজার মাইল ও প্রস্থে দু শো মাইলেরও অধিক। এর অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলোর মধ্যে অন্তত কুড়িটা শৃঙ্গ কমপক্ষে চব্বিশ হাজার ফুট উঁচু। ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে আজকের হিমালয় একদিন সমুদ্রগর্ভে বিলীন ছিল। এই সমুদ্রের নাম তাঁরা দিয়েছেন—টেথিস সমুদ্র। ভূমধ্যসাগর এই টেথিসেরই অংশবিশেষ। আজ থেকে সাড়ে পাঁচ কোটি বৎসর পূর্বে এই টেথিসের তলস্থিত ভূস্তরে এক বিরাট আলোড়নের শুরু হয়, ফলে উক্ত স্তরভাগের একটা বিরাট অংশ ক্রমোন্নত হয়ে কালক্রমে তা এই আজকের হিমালয়ে রূপান্তরিত হয়। এই হিমালয়ের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে সুদূর আফগানিস্তানে, কুমায়ুন-পাঞ্জাব-কাশ্মীরে, ভূটানে-নেপালে, তিব্বতে, ব্রহ্মদেশের প্রান্ত-সীমায়। চিরতুষারমণ্ডিত এর বিরাট বিস্তৃত ভূভাগ আজ দুর্ভেদ্য। আজ অভিভাবকের ন্যায় এই হিমালয় ভারতের শিয়রে অতন্দ্র প্রহরায় রত। এক দিকে তার সুউচ্চ শৃঙ্গমালা উত্তর মেরুর হিমতুহিন কনকনে বায়ুপ্রবাহকে প্রতিহত করে আমাদের শীত-কষ্ট নিবারণ করছে, অন্য দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর পথরোধ করে আমাদের এই ভারতের মাটিকে সুজলা সুফলা করে তুলছে। হিমালয় তাই দেবতার আসন লাভ করেছে ভারতবাসীর কাছে।

হিমালয়ের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এইটুকুতেই কিন্তু শেষ নয়। মানুষ জানার আগ্রহ নিয়ে যখন তার সম্ভব অসম্ভব সকল ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল তখন সে সবিস্ময়ে দেখল, নানা স্থানে আবহাওয়াভেদে হিমালয়ের কী বিস্ময়কর রূপান্তর। কোথাও ঊষর অনুর্বর গিরিপ্রান্তর···যতদূর দৃষ্টি যায় জলাভাবে বিরাট শূন্যতা ও রুক্ষতায় হাহাকার করছে—জীবনের সম্পর্কহীনভাবে···আবার কোথাও নির্ঝরিণীর স্নেহমধুর স্পর্শে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অত্যাশ্চর্য উর্বরতায় প্রাণময় হয়ে রয়েছে···সেখানে জীবনের জয়গান প্রতিমুহূর্তে ধ্বনিত

হচ্ছে···তপোবনের শান্তি সর্বত্র বিরাজ করছে···পাখির কাকলী-কূজন. জীবজন্তুর সহজ সরল বিচরণ মানুষের হিংস্র আক্রমণে কোথাও বিঘ্নিত নয়···সেখানে পাইন, স্প্রুস, দেবদারু, চির, চেনার, ফার্ণ প্রভৃতি বৃক্ষরাজির সুদীর্ঘ সারির মধ্যে বিচিত্র বর্ণের গোলাপ রডোডেনড্রন অর্কিডের সমারোহ এক অনির্বচনীয় শোভায় বাঙ্‌ময় হয়ে রয়েছে।··· সে পায়ে পায়ে সাবধানে, সতর্কভাবে এগিয়ে গিয়ে দেখল কোথাও দুগ্ধশুভ্র তুষারাবৃত মহামৌনী হিমালয়ের শৃঙ্গমালা নিঃসীম স্তব্ধতা আর অকপট গাম্ভীর্যে যোগমগ্ন···আপন পদশব্দেও যেখানে চকিত হতে হয়···আবার কোথাও রুদ্রের সর্বনাশা রূপে মর্মন্তুদ কোলাহলে ভয়াল ভয়ঙ্কর···কালান্ত তুষারঝড়ের অশান্ত নৃত্যে, হিমপ্রপাতের বজ্রনির্ঘোষে, মুহুর্মুহু আবহাওয়া রূপান্তরের অস্বাভাবিকতায় তারা যেন বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলাকে পরিহাস করছে।

হিমালয়ের এই ভিন্ন ভিন্ন নৈসর্গিক রূপের সঙ্গে যাদের প্রথম পরিচয় হয় তারা ভারতবাসী। জৈবিক প্রয়োজনের বাইরে সর্বকালে সর্বসময়ে সমগ্র চিত্তসত্তা দিয়ে তারা আরও একটা প্রয়োজন উপলব্ধি করে এসেছে···তা হচ্ছে আধ্যাত্মোপলব্ধি।

অতি প্রাচীনকাল থেকে, ইতিহাসও যে কালের কথা বিস্মৃত হয়েছে, তাই ভারতবাসী এরই এক অপরিহার্য আকর্ষণে অবলীলাক্রমে সর্বস্ব ত্যাগ করে ছুটে এসেছে হিমালয়েরই পাদমূলে। বৈরাগ্যের পরম তৃপ্তি সে বুক ভরে অনুভব করেছে একে দর্শন করে··· আত্মানুরাগের মোহ হারিয়ে সে বিরাটের অনুভূতি পেয়েছে একে কল্পনা করে···আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুসন্ধানে যোগমগ্ন হয়ে তার নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে সে এরই শুচিশুভ্র স্নেহচ্ছায়ায়।

হিমালয় তাই ভারতবাসীর কাছে মহাতীর্থ। এর পথে-প্রান্তরে, কন্দরে-অন্দরে, নিস্তব্ধ নিঃঝুম গিরিশৃঙ্গে ছড়িয়ে আছে ভারতবাসীর সাধনা···বেদপুরাণের শত সহস্র রোমাঞ্চকর কাহিনী—

কোথায় বসে ব্যাসদেব মহাভারতের অমর কাহিনী রচনা

করেছিলেন···বেদব্যাস লিখেছিলেন পবিত্র শিবপুরাণ···ঠিক কোন্ জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে অগস্ত্যমুনি সমুদ্র শোষণ করেছিলেন, আর কপিলমুনি তপস্যা করতেন তা আজ কারও জানা নেই। তবে হিমালয়ই যে আজকের সেই সব অখ্যাত অজ্ঞাত অঞ্চলের ধারক ও বাহক তাতেও কারও সন্দেহ নেই।

আজ হিমালয়ের যে-কোন প্রান্তে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যায় একটা-না-একটা তীর্থ, কিছু-না-কিছু মঠ ও মন্দির। ওইগুলোর কোন-কোনটির সঙ্গে আবার জড়িয়ে রয়েছে একটুখানি কাব্য···তু-একটি কথা···সামান্য একটুকরো কাহিনী।

দেবপ্রয়াগে রাবণ-নিধনকারী রামচন্দ্র পিতৃপুরুষের তর্পণ করেছিলেন আর লছমনঝোলায় পুজো করেছিলেন চার ভাই কমলেশ্বর শিবের—তাই তো সেখানে চার ভায়ের নামে চারটি মন্দির। ধ্রুবঘাটে ভক্ত ধ্রুব চির-আরাধ্য হরির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন···তাই তো ধ্রুবঘাট হিন্দুদের কাছে পুণ্যতীর্থ। স্বজনবিয়োগে কাতর হয়ে পঞ্চপাণ্ডব গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে···আমরা বার বার ছুটে যাই স্বচক্ষে দেখতে সে কেমন পথ! হর-পার্বতীর বিবাহযজ্ঞের আগুন আজও অনির্বাণ রয়েছে ত্রিযুগী-নারায়ণের মন্দিরে···এর আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারে না তীর্থযাত্রীর দল। এমন অগণিত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংখ্যাতীত তীর্থ, এক জীবনে ঐগুলি পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে দেখে শেষ করা যায় না। এ ছাড়া সেখানে আছে তুষারতীর্থ কেদারনাথ ও বদরীনাথের মন্দির, মহাবুদ্ধ ও পশুপতিনাথের মন্দির। আছে তুষারলিঙ্গ অমরনাথ আর নরসিংহ ও নবমাতৃকার বিগ্রহ। সহস্র সহস্র বছরের পুরনো অতীত আজও যেন মহাস্থবির হিমালয় থেকে হাতছানি দিচ্ছে মন্দাকিনীর তীরে, অলকানন্দার কোলে নন্দনকাননের ছায়ায় ছায়ায়···যেখানে ঋষিকুল তপশ্চর্যায় দিব্যজ্ঞান লাভ করতেন···যেখানকার হাওয়ায় হাওয়ায় মিশে আছে সত্য, শিব আর কল্যাণের শাশ্বত বাণী।

আত্মশুদ্ধির শপথ নিয়ে যুগে যুগে তাই ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী গেছে হিমালয়ের আশ্রয়ে আর সাফল্যের নিদর্শনরূপে সে প্রতিষ্ঠা করে এসেছে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় জায়গাগুলিতে এক-একটি তীর্থকেন্দ্র। কোথাও তা পৌরাণিক যুগের ঘটনাস্থলকে উপলক্ষ্য করে আবার কোথাও তা আত্মগত প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে। কবে তা তৈরী হয়েছে···কে তা তৈরি করেছে···কেমন করে তার উপকরণ এসেছে— সে সব প্রশ্ন আজ অবান্তর। তবে আজও যে সেগুলো অম্লান রয়েছে আর তীর্থযাত্রীরা দলে দলে সমস্ত বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করে প্রতি বছর সেখানে ছুটছে এইটেই অভ্রান্ত সত্য, নিছক বাস্তব।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে এই তীর্থ-পরিক্রমা। পুরাতন বিদায় নিয়েছে, নতুনরা শুরু করেছে। জন্ম থেকে জন্মান্তরে চলেছে এর প্রতিক্রিয়া···কোথাও তা ব্যাহত হয়নি···কখনও তা হবেও না। কারণ একমাত্র পুণ্যার্জনের সঙ্কল্প নিয়েই সব তীর্থযাত্রী এই পর্যটনে বেরুত না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দল বেঁধে যেত ওই ভয়ঙ্কর অগম্য পথে। গন্তব্যস্থল হয়তো সবারই এক ছিল কিন্তু উদ্দেশ্য সবার এক ছিল না। কেউ হয়তো যেত আত্মবিশ্লেষণ করতে, কেউবা হয়তো জ্ঞানার্জন করতে, কারও উদ্দেশ্য ছিল হয়তো চিত্তবিনোদনের, কারও বা আবার পর্যবেক্ষণের।

এপথে এসেছেন ভগবান বুদ্ধ, সম্রাট অশোক, মহাকবি কালিদাস, শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর, কর্মবীর শরৎদাস, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথের ভিন্ন ভিন্ন মহান যাত্রী। হিমালয় সকলকেই অভিভূত করেছে। সকলেই অভূতপূর্ব প্রেরণা পেয়েছেন আপন আপন উদ্দেশ্যকে নিবিড়ভাবে অনুশীলন করতে। হিমালয় তাই দেবতার আসন লাভ করেছে নিখিল অন্তরের অন্তরতম স্থলে।

হিমালয়ের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশেরও পরিচয় কমদিনের নয়। খ্রীষ্ট জন্মাবার ৩২৫ বছর পূর্বে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারতে এসেছিলেন আর সেই থেকেই হিমালয় ইউরোপীয়দের কাছে পরিচয় লাভ করেছে।

আলেকজাণ্ডারের সৈন্যাধ্যক্ষরা হিমালয়ের অভ্যন্তর ভাগে কোনদিন গিয়েছিলেন কি না তার যদিও কোন প্রমাণ নেই তবে একথা সত্য হুণজার মীর নিজেকে স্বয়ং আলেকজাণ্ডারের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন আর তাঁরই দাবির সাক্ষ্য বহন করে আজও রয়েছে হুণজা উপত্যকায় ছোট্ট একটি গ্রাম—নাম তার সেকেন্দ্রাবাদ।

এর পর অনেক—অনেক বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হিমালয়ের সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে কোন ইউরোপীয় আর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করতে পারেনি।

কালের ঘূর্ণিপাকে এল আর-এক উৎসাহ ও উদ্দীপনার ঝড়। তারই প্রবাহে নতুন করে দীক্ষা নিল ইউরোপের জনগণ···ঘরছাড়া হল তারা অজানাকে জানতে···অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করতে। হিমালয়ের বিশালতার প্রতি অকারণ ভয় দূরীভূত করে এগিয়ে এল তারা তার সত্য পরিচয় নিতে। এমনি করে শুরু হল হিমালয়ের বুকে বিদেশীয়দের অভিযান।

হিমালয়ের প্রতি ভারতবাসীর ভয় কোনদিনই ছিল না। তাই বার বার জীবন বিপন্ন করেও ভারতবাসী ছুটে গেছে তার নানা দুর্ভেদ্য অঞ্চলে প্রয়োজনবোধে।

শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করের নাম আজ আর কে না জানে? তিনিও গিয়েছিলেন তিব্বতে···অন্তরের আহ্বানে।

৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তন্ত্রশাস্ত্র, হিন্দু দর্শন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বৌদ্ধ সাহিত্য অধ্যয়ন করেন তিনি ধর্মকীর্তি নামে তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞের কাছে বর্মার অন্তর্গত পেগুতে। দীর্ঘদিন অধ্যয়নের ফলে তিনি ওই শাস্ত্রে যথার্থ সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন ও বিক্রমশীলার প্রসিদ্ধ মঠে অধ্যক্ষের পদও লাভ করেন।

এর পর একদিন তিব্বতের দলাই লামার কাছ থেকে তিব্বত পরিদর্শনের আমন্ত্রণ পেঁয়ে তিনি তিব্বত অভিমুখে রওনা হন (১০৩৮

খ্রীঃ)। তখন তাঁর বয়স ষাট। দৈবশক্তিতে তিনি মহাশক্তিমান। কথিত আছে, ওই সময় পথে অশ্বারোহণকালে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অন্তত আধহাত উঁচুতে অর্থাৎ শূন্যে উপবেশন করে দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন।

দীর্ঘ তেরো বছর তিব্বতে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার জনগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের এক নতুন ভাবধারা বিস্তার করেন।

এর পর (১০৫১ খ্রীঃ) তিনি লাসায় যান ও সেখানকার বিখ্যাত মঠ সি-থান পরিদর্শন করেন।

এ ছাড়াও তিনি সংস্কৃত ও তিব্বতী ভাষায় বহু ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। ফলে স্বদেশে ও বিদেশে আজও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছেন।

প্রঃ রোয়েরিচ বলেন—লাসা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি এক বিশেষ পরীক্ষার সম্মুখীন হন। স্থানীয় কৃতী সন্ন্যাসী মিলারিপা তাঁর দৈবশক্তি কতখানি আয়ত্তাধীন পরীক্ষার জন্য তাঁর সম্মুখস্থ তৃণগুচ্ছের শীর্ষদেশে উপবেশন করেন। দীপঙ্কর সেই দেখে তৎক্ষণাৎ অনায়াসে অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। উল্লেখযোগ্য সাফল্য তাঁর এখানে এই, মিলারিপার ক্ষেত্রে তৃণপত্রগুলো ভারাক্রান্ত হয়ে যদিও বা ঈষৎ অবনত হয়েছিল, তাঁর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটুকুও হয়নি।

ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম জনএক স্পেনিস মিশনারী ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে হিমালয় সম্পর্কিত ছোটখাটো একটা নক্‌শা আকবরের সভায় পেশ করেন। এর পর বেনডিক্ট ডি. গোস্‌ নামে আর একজন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ১৬০৩-১৬০৭ সন পর্যন্ত পরিব্রাজকদের সঙ্গে হিমালয়ের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। আর এই ঘুরে বেড়ানোর কালেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইউরোপীয়দের মধ্যে দুজন ধর্মপরিব্রাজকই সর্বপ্রথম হিমালয়ের উত্তর-দক্ষিণের বিস্তৃত ভূভাগ পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা যাত্রা করেছিলেন ১৬২৪ সনে ৩০শে মার্চ আগ্রা থেকে—তিব্বতে বসবাসকারী একদল

খ্রীষ্টানের অনুসন্ধানার্থে। পথ ছিল তাঁদের বদরীনাথ ও মোনাপাসের মধ্য দিয়ে। জুন মাসের গোড়ার দিকে তাঁরা ওই পথ অতিক্রম করতে গিয়ে ভীষণ তুষার-ঝড়ে অতি নিষ্ঠুরভাবে ক্ষতবিক্ষত হন। তাঁদের সেই অভিজ্ঞতার কথা আজও আমরা বিস্মৃত হইনি।—

'Our feet were frozen and frost-bitten so much so that we did not feel it when later they touched a piece of red hot iron.'

যা হোক, জুলাই মাসের শেষের দিকে কিছু তিব্বতী গাইডের সহযোগিতায় তাঁরা ওই যাত্রায় সাফল্য লাভ করেন।

১৬৩০ সনে ফ্রান্সিস্কো ডি এজিভেডো একটা দুঃসাহসী অভিযান চালান ও পর-বৎসর আগস্ট মাসে কৃতিত্বের সঙ্গে মোনাপাস অতিক্রম করে 'লী'-এর অভিমুখে রওনা হন। লীয়েতে পৌঁছে তিনি বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হন ও কুলু হয়ে ভারতে ফিরে আসতে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধেও পান। ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম নভেম্বর মাসে তোগালুংলা (১৭৫০০ ফুঃ), লাচালুংলা (১৬৬০০ ফুঃ), বড়লাচা (১৬২০০ ফুঃ), রোটাং (১৩০৫০ ফুঃ) প্রভৃতি পাসগুলো অতিক্রম করেন। আজ যদিও ওই সব 'পাস' বিশেষ করে ওই মাসটাতে বন্ধ থাকে।

১৭১৪ সনে মিঃ দেসিদেরি নামে আর-একজন ইউরোপীয় মুঘলদের প্রাচীন পথ ধরে পীর-পাঞ্জাল অতিক্রম করে ওই একই মাসে শ্রীনগরে পৌঁছান। মে মাসের শেষের দিকে তিনিই প্রথম জোজীলা ছাড়িয়ে ২৫শে জুন লীয়েতে যান। তারপর পাঁচ বছর লাসাতে কাটিয়ে কাঠমাণ্ডু হয়ে ভারতে ফিরে আসেন।

এইসব ইউরোপীয় অভিযাত্রীর মধ্যে কেউ কেউ ভূগোলবিদ্যায়, কেউ কেউ জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ও স্ব-স্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁরা কিছু কিছু তথ্যও সংগ্রহ করেছিলেন।

১৭৯২ সনে তিব্বতের সঙ্গে গুর্খাদের ছোটখাটো একটা যুদ্ধ হয়

আর ওই যুদ্ধে গুর্খারা কলকাতা থেকে উপযুক্ত সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠায়। মিঃ এন্‌সাইন গেরার্ড এই সুযোগে সুশিক্ষিত একটা বাহিনী নিয়ে কাঠমাণ্ডু অভিমুখে যাত্রা করেন আর ওই ফাঁকে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের একটা সুন্দর মানচিত্রও তৈরি করে ফেলেন।

১৭৭৪-১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মোট ছটি মিশন ভূটান, নেপাল, তিব্বত পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা ব্যবসা ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেও হিমালয়ের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ ব্যাপারে তেমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিন্তু দেখা গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ওই সময় কুমায়ুন ও পাঞ্জাব হিমালয়ের অন্যতম উপত্যকাগুলোর অধিকাংশই অতিক্রমনীয় হয়েছিল এবং অনেক উঁচু উঁচু পর্বতচূড়ার অবস্থিতি ও উচ্চতাও নির্ণয় করা গিয়েছিল।

১৮০১-১৮০৩ সন পর্যন্ত চার্লস ক্রফোর্ড কাঠমাণ্ডুতে অবস্থানকারী একদল সুশিক্ষিত বাহিনীর প্রথম পরিচালনাকালে সমগ্র নেপাল পরিদর্শন করেন আর সেইসঙ্গে তিনি নেপাল উপত্যকা ও বাগমতী নদীর একটা পূর্ণ মানচিত্র রচনা করেন। ১৮০৪ সনে তিনি পূর্ব-নেপালে কোমী যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালায় বিভক্ত হয়ে গেছে সেই সমস্ত ভূভাগও পরিদর্শন করেন। আর সেই প্রথম তিনি তুষারশৈল eange-এর সর্বোচ্চতা ঘোষণা করেন।

বাংলার সার্ভেয়র-জেনারেল রবার্ট কোলব্রুক আবিষ্কারের ব্যাপারে ও মানচিত্র রচনায় খুব উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু তখন কুমায়ুন-হিমালয়ের অধিকাংশ ভূভাগ নেপালশাসিত থাকায় আর নেপাল সরকার সে সময় সর্বব্যাপারে বিদেশী বর্জন করায় তাঁর সে উৎসাহ মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি। যা হোক, এর পর বহু চেষ্টায় নেপাল সরকারের অনুমতি আদায় করে উপরোক্ত অঞ্চলে কিছু কিছু আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

এ পর্যন্ত ভারতের বাইরের ভূগোলবিদ্যাবিদ্‌রা আন্দিজকেই পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বত বলে জানতেন ও ভারতের জরিপ-বিভাগের দ্বারা নির্ণীত ধবলগিরির ২৬৮২৬ ফুট উচ্চতাটাকে সন্দেহবশে কৌতুক করতেন। বর্তমানে ধবলগিরির সরকারী সমর্থিত উচ্চতা ২৬৭৯৫ ফুট, পূর্বোক্ত হিসেব থেকে মাত্র ৩১ ফুট কম। সুতরাং আদি সার্ভেয়রদের এই পরিমাপ-সাফল্য নিঃসন্দেহে গৌরবের।

১৮১২ সনে মে মাসে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন প্রাক্তন চিকিৎসক মূরক্রফ্‌ট ও তাঁর সঙ্গী হেয়ারসি ফকিরের ছদ্মবেশে 'মায়াপুর' ও 'হরগিরি' কপট নাম নিয়ে রামনগর থেকে পর্বত অভিযানে বার হন। তাঁরা রামগঙ্গাকে অনুসরণ করে তার উৎসের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন ও কর্ণপ্রয়াগে অলকানন্দা হয়ে যোশীমঠে পৌঁছান। তার পর তাঁরা ধৌলি আবিষ্কার করেন ও নিতিপাসের মধ্য দিয়ে তিব্বতে পৌঁছান। জুলাইয়ের শেষের দিকে তাঁরা মানস সরোবরে যান। ১৭১৫ সনে দেসিদেরির পর তাঁরা ছাড়া আর কারও পক্ষে ওখানে যাওয়া কিংবা নিতিপাস অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি।

ফিরতি পথে তিব্বতীয়রা তাঁদের দাহা জোং-এ আটক করে। এর পর তাঁরা সীমান্তের অপর পারে মিলাম জেলায় বীর সিং ও দেব সিং নামে দুজন ভুটিয়ার সহায়তা লাভ করেন। তাঁরা পুনরায় নিতিপাস অতিক্রম করেন, কিন্তু এবার গুর্খারা তাঁদের কুমায়ুনে বন্দী করে। যা হোক, এ যাত্রায়ও তাঁরা অব্যাহতি পেয়ে নভেম্বর মাসে একজন মেষপালকের সঙ্গে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁরা কেউই সার্ভেয়র ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের বিবরণ ও পথের মানচিত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ করল—'No branch of the Ganges had any source so far north, while the Sutlej rose in Rakas Tal.'

১৮১৪-১৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপালী যুদ্ধের পর নেপালের পশ্চিমভাগ 'কালি'তে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় আর সেই থেকেই কুমায়ুন-হিমালয়

ইংরেজ শাসনাধীনে আসে। এর পর ওই সব ক্ষেত্রে কি আবিষ্কার কি জরিপ ব্যাপারে আর কোন রাজনৈতিক বাধাই থাকে না—বাধা এবার যা কিছু তার সবটাই শরীরের ওপর ওখানকার প্রাকৃতিক আবহাওয়ার।

এদিকে নেপাল সরকার তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র থেকে বিদেশী-বহিষ্করণের নীতি অবলম্বন করলেন। ইংরেজ এ নীতিকে বরাবর শ্রদ্ধা করেছে। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত এভারেস্ট-অভিযাত্রীদের চুম্বী ভ্যালী হয়ে তিব্বতের মধ্য দিয়ে যেতে হত। আর ক্বচিৎ তিব্বত সরকার এই যাওয়ার অনুমতি দিতেন। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সনে নেপাল সরকার এই নীতি কিছুটা শিথিল করেন।

১৮১৭ সনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিছু কর্মচারী সিমলে যান ও সেখান থেকে তাঁরা বাসপা-ভ্যালীর প্রায় সমস্ত পাসগুলো অতিক্রম করেন।

এর পর কুমায়ুনের প্রথম ডেপুটি কমিশনার জি. ডব্লু. ট্রেল নন্দাদেবী ও নন্দাকোটের মধ্যবর্তী বিরাট হিমালয় অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। পীনদরী গ্লেসিয়ার থেকে তিনি ঘোড়ায় চড়ে ১৭৭০০ ফুট উঁচু গোরীগঙ্গা উপত্যকাস্থিত মারটোলীতে পৌঁছান—আজও কতকগুলো বিশেষ কারণে তা ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল স্থান বলে পরিচিত। সুতরাং তাঁর সময় এ ধরনের সাফল্য যে অসামান্য গৌরবের, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। পর্বতারোহীদের কাছে আজও এই পাসটা 'ট্রেলস্ পাস' বলে পরিচিত। ১৯২৬ সনে রাটলেজ সর্বপ্রথম উত্তর দিক দিয়ে এটাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৩০ সনে রঞ্জিৎ সিংয়ের সময় সুপ্রসিদ্ধ অভিযাত্রী আলেকজাণ্ডার গার্ডনার ইয়ারকন্দ থেকে কাশ্মীর যাত্রাকালে কারাকোরাম পাসের নিকটবর্তী ক্যাডপো-ওমপো-লা অতিক্রম করেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীনগর থেকে গিলগিটের পথে বুরজিল গিরিপথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮২৩ সনে সার্ জর্জ এভারেস্ট 'ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন ও ১৮৩০ সনে তিনি সার্ভেয়র-জেনারেলের পদে উন্নীত হন। গণিত ও বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। জরিপ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পন্থায় নতুন অথচ সুবিধাজনক কোন উপায় গবেষণা করতে করতে তিনি 'এক্স-রে সিস্টেম' নামে এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কার উত্তরকালে জরিপ ব্যাপারে সমগ্র ভারতে তথা এশিয়ায় এক বিরাট আলোড়ন এনেছিল।

হিমালয় অঞ্চলে জরিপের কাজ নিয়ে তখন ইংরেজ-মহলে বেশ একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়। জর্জ এভারেস্ট এই কাজকে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনার জন্যে ও তাঁর আবিষ্কৃত উপায়ের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্যে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডঃ টাইটলারের কাছে গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্ট কোন মেধাবী ছাত্রের খোঁজ করে পাঠান।

রাধানাথ শিকদার তখন ওই কলেজের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। দুরূহ অঙ্কশাস্ত্রে তখন তাঁর তুলনা বিরল। বিনয় আর মধুর স্বভাবে তিনি সকল অধ্যাপকেরই অতিশয় স্নেহভাজন। টাইটলার দ্বিধাহীন চিত্তে রাধানাথকেই মনোনীত করেন ও তিনি সার্ভেয়র-জেনারেলের দপ্তরে কাজ করতে ইচ্ছুক কি না জানতে চান। রাধানাথের সম্মতি পেয়ে তিনি সোৎসাহে তাঁকে এভারেস্টের কাছে পাঠিয়ে দেন আর জর্জ এভারেস্টও কথামত তাঁকে তাঁর দপ্তরে নিযুক্ত করে নেন।

তখন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। জরিপ-বিভাগের কাজে প্রথম ভারতীয় হিসেবে যোগ দিয়ে রাধানাথ সর্বপ্রথম অনুধাবন করতে চাইলেন কর্মক্ষেত্রের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলো। উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব কোনদিনই তাঁর ছিল না। তুচ্ছ বলে কোনদিনই তিনি কোন কাজকে উপেক্ষা করেননি। এই একাগ্রতা ও নিষ্ঠা তাঁর পদোন্নতির পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। তাঁর গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে এভারেস্ট স্বয়ং তাঁকে উচ্চগণিত শাস্ত্রে শিক্ষা দেন। অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তার জোরে

তিনি অতি অল্পকালে উক্ত শিক্ষা ব্যাপারে অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখান। ফলে তিনি এভারেস্টের একেবারে আপন-জন হয়ে ওঠেন। যতদিন এভারেস্ট সার্ভেয়র-জেনারেলের পদে ছিলেন রাধানাথকে তিনি কোনদিন কোনমতেই হাতছাড়া করেননি। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, রাধানাথই সর্বপ্রথম এভারেস্ট আবিষ্কৃত 'এক্স-রে সিস্টেম'কে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

১৮৪৩ সনে এভারেস্ট অবসর গ্রহণ করলে এণ্ড্রু-অ তাঁর স্থানে সার্ভেয়র-জেনারেল হয়ে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে রাধানাথ তাঁরও অতি প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন! এরও কিছুকাল পর থেকে বেশ কয়েক বছর হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণশেষে রাধানাথ সেগুলোর গাণিতিক ফলাফল নির্ণয়ে মনোনিবেশ করেন। ওইগুলোর মধ্যে ৩৯টা গিরিশৃঙ্গের স্থানীয় নাম পাওয়া গিয়েছিল, বাকীগুলোর কোন নাম না পাওয়াতে সেগুলোকে (১, ২, ৩,···) সংখ্যার দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৮৫২ সনে উপরোক্ত সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত ১৫ নম্বরের শৃঙ্গটাকে রাধানাথ পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বলে ঘোষণা করেন। বলাবাহুল্য, ওই শৃঙ্গটিরই নাম দেওয়া হয় পরে 'মাউন্ট এভারেস্ট'—এভারেস্টের নামানুসারে।

এণ্ড্রু-অ-র সুপারিশে তিনি মাসিক ছ'শো টাকা বেতনে চীফ কমপিউটরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। এবার স্বয়ং কর্তৃপক্ষ তাঁর এই অসামান্য সাফল্যে প্রীত হয়ে তাঁকে চীফ কমপিউটর পদের সঙ্গে অবজারভেটরি-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে উন্নীত করেন।

১৮৬১ সনে এণ্ড্রু-অ অবসর গ্রহণ করলে তাঁর স্থলে সার্ভেয়র-জেনারেল হয়ে আসেন থুলিয়ে। তাঁর সময় থেকেই শুরু হয় রাধানাথের জীবনে এক বেদনাময় ইতিহাস। রাধানাথের সাফল্যকে অনেক ঈর্ষাপরায়ণ ইংরেজ সুনজরে দেখত না। একজন নেটিভের এত বড় প্রতিভাকে তারা স্বীকৃতি দিতে মোটেই রাজী নয়। তাদের

দীর্ঘদিনের চাপা অসন্তোষ থুলিয়ের সময় থেকে প্রকট হয়ে ওঠে। রাধানাথ এ ধরনের আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না—তিনি পেনসন নেন (১৮৬২ সন)।

এখানেও তাঁকে এক মর্মান্তিক আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। তখনকার বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ভুলক্রমে রাধানাথ 'Took Pension'-এর জায়গায় 'Took Poison' ছাপে। ফলে সারাদেশে রাষ্ট্র হয়ে যায় রাধানাথ বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন।

সমগ্র কাশ্মীর জরিপ ব্যাপারে মণ্টগোমারি নামে একজন ইংরেজ কর্মচারী প্রধান উদ্যোগী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি শেলভারটনের সহযোগিতায় কারাকোরাম পর্বতমালার উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করেন—পর্যবেক্ষণশেষে দেখা যায় ২৮২৫২ ফুট উঁচু গডউইন অস্টেন-ই পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ।

গডউইন অস্টেন তখনকার দিনে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পর্বতারোহণ সম্পর্কে তাঁর কোন টেকনিকাল জ্ঞান না থাকলেও জরিপ সম্বন্ধীয় কাজে তিনি আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। ১৮৫৬-৬১ সনে তিনি কাশ্মীরে আবিষ্কার ব্যাপারে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

তিব্বত, নেপাল, সিকিম ও ভূটান প্রবেশে ইউরোপীয়দের ওপর বিধিনিষেধ থাকায় কিছু সংখ্যক ভুটিয়াকে আবিষ্কার সম্বন্ধে দেরাদুনে শিক্ষা দেওয়া হয়। তারা কৌণিক দূরত্ব-মানযন্ত্রের ও পকেট কম্পাসের ব্যবহার শেখে…নক্ষত্র চিনতে ও পরীক্ষা করতে শেখে…ফুটন্ত জলের সাহায্যে উচ্চতা নির্ণয় করতে ও পথের হিসেব নিকেশ রাখতেও শেখে। ওই সমস্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত আবিষ্কারকের মধ্যে যে পণ্ডিত নামে খ্যাতি লাভ করে—সে নইন সিং। সুদীর্ঘ ১২০০ মাইল পর্যটনে সে আবিষ্কারের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্‌ঘাটন করে।

হরিরাম নামে আর-একজন হিন্দু পণ্ডিত ১৮৭১ সনে প্রথম

এভারেস্টমণ্ডলী পরিভ্রমণ করেন। এর পর তিনি ১৮৭৩ সনে কুমায়ুনের পিথরগড় হয়ে নেপালে যান। তিনি পশ্চিম থেকে পূর্বে সুদূর মুক্তিনাথ পর্যন্ত নেপালের উত্তরভাগ পরিভ্রমণ করেন।

রিনঝিন নামগিয়াল সিকিমে কতকগুলো পার্শ্ব-উপত্যকা আবিষ্কার করার পর কাংলা হয়ে নেপালে যান। সার্ভেয়রদের মধ্যে তিনিই প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘার পরিধি মানচিত্রে রূপায়িত করেন। তাঁরই চেষ্টায় (১৮৮৫-৮৬) আজ আমরা ভূটান সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে সমর্থ হচ্ছি।

বিদেশী যাত্রীদের মধ্যে ডব্লু. ডব্লু. গ্রাহামই প্রথম পর্বতারোহণের মৌলিক সঙ্কল্প নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে আসেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের চেয়ে তাঁর স্পোর্টস ও অ্যাডভেঞ্চারের দিকেই ঝোঁকটা ছিল বেশী। একজন সুইস গাইডের সহযোগিতায় তিনি ১৮৮৩ সনে মার্চ মাসে সিকিম পরিদর্শন করেন। তারপর কাংলা হয়ে সিঙ্গলীলা শৈলমালা অতিক্রম করে ২০০০০ ফুট উঁচু একটা চূড়ায় আরোহণ করেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রদক্ষিণ যে আর মাত্র ন দিনে শেষ করা যেত এও তিনি হিসেব করেন। জুলাই মাসে তিনি নন্দাদেবী আরোহণ করার দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে ঋষিগঙ্গার সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু নানা অসুবিধের সম্মুখীন হয়ে তিনি সে সঙ্কল্প প্রত্যাহার করেন। এর পর তিনি দুনাগিরি (২৩১৮৪ ফুট) অভিযান করেন, কিন্তু এক্ষেত্রেও অতিরিক্ত খারাপ আবহাওয়ার জন্যে ২২৭০০ ফুট উঁচুতে উঠে ফিরে আসেন।

১৮৮৫ সন থেকে হিমালয়ের ওপর বেশ একটা পরিবর্তন আসতে থাকে। রাস্তাঘাটের উন্নতি হতে থাকে, অগম্য পার্বত্য অঞ্চলগুলোও বেশ সুগম হয়ে ওঠে। ইঞ্জিনীয়ার, কনট্রাকটর, ফরেস্ট-অফিসাররা নিজ নিজ এলাকার কাজ বেশ সুনিপুণভাবে সুসম্পন্ন করতে থাকেন···। পরিব্রাজক ও পর্বতারোহীরা দূর দূর অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে থাকেন। কিন্তু তখনও পর্বতশীর্ষ জয়ের কঠিন সঙ্কল্প নিতে

একজনও সাহসী হননি। গিরিচূড়ার চেয়ে সঙ্কীর্ণ গিরিপথগুলোর কিনারা করার ওপরেই তখন ঝোঁকটা ছিল বেশী। তখনও ২৪০০০ ফুট উঁচুতে উঠতে কেউই সক্ষম হননি। এভারেস্ট তো আরও দূরের পথ।

যা হোক, ১৮৮৫ সন থেকে হিমালয়ের উল্লেখযোগ্য উন্নতির ফলে ইউরোপের পর্বতারোহীরা ভারতে জমায়েৎ হয়ে উচ্চতম কতকগুলো শৃঙ্গের টেকনিকাল পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। এই সময় মার্টিন কন্‌ওয়ে, এ. এফ. মামেরি, নরম্যান কোলী, ডগলাস ফ্রেসফিল্ড, চার্লস ব্রুস প্রভৃতি বিখ্যাত পর্বতারোহীরা পেশাদার আলপাইন গাইডদের সহযোগিতায় স্থানীয় অধিবাসীদের পাহাড় সম্পর্কে মানসিক ভয় জয় করে তাদের বিশ্বাসভাজন হতে থাকেন। মিশনারিরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

এই সময় ইংল্যাণ্ড থেকে মার্টিন কনওয়ে প্রথম বড় রকমের একটা অভিযাত্রী দল গঠন করেন ও তার পরিচালনা করেন। এই দল হিস্‌পার, বায়াফো, কেরোলুংমা গ্লেসিয়ার আবিষ্কার করেন ও হরকবীর আর করবীর নামে দুজন গুর্খার সহযোগিতায় ২২০০০ ও ২৩৩৯০ ফুট উঁচুতে উঠতে সক্ষম হন। এই অভিযাত্রী দলের সদস্য ব্রুস সর্বপ্রথম ১৯০৭ সনে এভারেস্ট অভিযানের পরিকল্পনা করেন। প্রাথমিকভাবে তিনি শেরপা ও পোর্টার নির্বাচনও করেছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা সাময়িকভাবে বাতিল করতে হয়।

ক্যাপ্টেন জে. বি. নোয়েল কিন্তু যুদ্ধ চলার সময়েই রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সঙ্গে একমত হয়ে ওই প্রস্তাবকে ফলবান করতে এগিয়ে এলেন। ফলে তিনি বিশিষ্ট মহল থেকে, বিশেষ করে আলপাইন ক্লাবের সভাপতি ফারারের কাছ থেকে, অকুণ্ঠ সমর্থন পেলেন। ঠিক এই সময় সিকিমস্থিত ভাইসরয়ের প্রতিনিধি সার্‌ চার্লস বেলও তিব্বতের দলাই লামার কাছ থেকে তিব্বতের মধ্য দিয়ে একটা অভিযান চালানোর অনুমতি আদায় করে নেন।

সেই থেকেই শুরু হয় এভারেস্ট অভিযানের এক মহান যুগ। আর সেই যুগসন্ধিক্ষণে রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি ও আলপাইন ক্লাব এভারেস্ট ব্যাপারে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধের জন্যে মিলিতভাবে একটা কমিটী তৈরি করেন। বলা বাহুল্য, তাতে ইংরেজদের প্রাধান্য সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হত।

প্রথম ও প্রকৃত এভারেস্ট অভিযান শুরু হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল হাওয়ার্ড-বেরির নেতৃত্বে। এই দলের অন্যতম সভ্যদের মধ্যে ছিলেন— ম্যালরি, বুলক ও ডক্টর কেলাস। ৫ই জুন অভিযাত্রী দলটি ১৭০০০ ফুট উঁচুতে উঠলে ডাঃ কেলাস অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

যা হোক, এর পর ম্যালরি ও বুলক কিছুসংখ্যক শেরপা নিয়ে রংবুকে পৌঁছান ও সেখানেই বেস-ক্যাম্প স্থাপন করেন। ২৯শে জুন তাঁরা ১৭৫০০ ফুট উঁচুতে ২নং ও ৮ই জুলাই পশ্চিম-রংবুক গ্লেসিয়ারে ৩নং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু সুবিধে না হওয়ায় তাঁরা ক্যাম্প গুটিয়ে নেমে আসেন।

হাওয়ার্ড-বেরি এদিকে খাত্রা জেলায় ক্যাম্প করে জোর পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন। ২৯শে জুলাই ম্যালরি সদলবলে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এর কিছুদিন পরে অনুসন্ধিৎসু ম্যালরি আবার এভারেস্টের পথ অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন ও অনেক চেষ্টার পর ২৪শে সেপ্টেম্বর নর্থ কল ছাড়িয়ে আরও কিছু উঁচুতে উঠতে সক্ষম হন। এভারেস্টকে দেখে তিনি একটি চিত্তাকর্ষক কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন—'A prodigious white fang excrescent from the jaws of the world'.

দ্বিতীয় অভিযান চালানো হয় ১৯২২ সনে জেনারেল সি. জি. ব্রুসের নেতৃত্বে। এই দলে উল্লেখযোগ্য সভ্যদের মধ্যে ছিলেন—ম্যালরি, নর্টন, ফিন্‌চ্‌। ১লা মে দলটি ১৬৮০০ ফুট উঁচুতে বেস-ক্যাম্প স্থাপন করেন। ওখানে ফিন্‌চ্‌ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে বাদ দিয়েই বাকী

দলটি ১৭৮০০ ফুট উঁচুতে ১নং, ১৯৮০০ ফুট উঁচুতে ২নং ও ২১০০০ ফুট উঁচুতে ৩নং ক্যাম্প স্থাপন করেন। কিন্তু আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় পথে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অবস্থাতেও ম্যালরি সহযাত্রীদের সঙ্গে বেশীদিন কাটাতে পারেননি। নর্টন প্রমুখ দু-একজন সদস্য ও শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নর্থকল অভিমুখে যাত্রা করেন ও ২১শে মে ২৬৯৮৫ ফুট উঁচুতে উঠে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন।

এদিকে ফিন্চ্ সুস্থ হয়ে জেনারেল ব্রুস ও তেজবীরের সহযোগিতায় নতুন করে অভিযান শুরু করেন এবং অক্সিজেনের সহায়তায় সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে ২৭৩০০ ফুট উঁচুতে উঠতে সক্ষম হন। দুর্ভাগ্যবশত এই অভিযানে ন জন শেরপা বরফ চাপা পড়ে মারা যায়।

তৃতীয় অভিযান চালানো হয় ১৯২৪ সনে ব্রুসেরই নেতৃত্বে। এই দলেও ছিলেন ম্যালরি। এ ছাড়া আরভিন, নর্টন প্রমুখ দুঃসাহসী পর্বতারোহীরা। রংবুক হয়ে তাঁরা ১৯শে মে ৩নং ক্যাম্পে এসে পৌঁছান। এই অভিযানে নর্টন ২৮১২৬ ফুট উঁচুতে উঠে আর-এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

ম্যালরি ও আরভিন তখন অ্যাডভান্স ক্যাম্প থেকে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন। চারদিন সেখানে থাকার পর তাঁরা অক্সিজেনের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে চূড়ান্ত লক্ষ্যে অর্থাৎ এভারেস্টের শীর্ষ সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। ২৮০০০ ফুট উঁচুতে তাঁদের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু পাওয়া গিয়েছিল। চাক্ষুষ সাক্ষাৎ আর তাঁদের সঙ্গে কারও হয়নি। রহস্যময় এভারেস্টের অতল রহস্যে তাঁরা নাকি চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ওডেল বলেন—

'But bearing in mind all the circumstances I have set out above and considering their position when last seen, I think myself there is a strong probability that Mallory and Irvine succeeded.'

. যা হোক, অপূর্ব দক্ষতা আর অনমনীয় মনোবল নিয়ে বিশেষ করে ম্যালরি এভারেস্ট ইতিহাসে যে বিস্ময়কর কর্মক্ষমতার পরিচয় রেখে গেছেন তা চিরদিন তাঁকে অমর করে রাখবে।

এর পর তিব্বতের দলাই লামা এক ইস্তাহারে তিব্বতের মধ্য দিয়ে কোন অভিযান চালানো নিষেধ করায় সুদীর্ঘ আট বছর আর অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দলাই লামা আবার অনুমতি দিলে চতুর্থ এভারেস্ট অভিযাত্রী দল সংগঠন করা হয় হিউজ্ রাটলেজের নেতৃত্বে। এই দলে অন্যতম সভ্যদের মধ্যে ছিলেন ফ্রাঙ্ক স্মিথ, গ্রীন ও বার্নি। ২২শে মে তাঁরা ২৫৭০০ ফুট উঁচুতে ৫নং ও ২৯শে মে ২৭৪০০ ফুট উঁচুতে ৬নং ক্যাম্প স্থাপন করেন। এর পর তাঁরা ২৮০০০ ফুট উঁচুতে উঠে একটা তুষার-কাটা-কুঠার (আইস-অ্যাক্স) দেখতে পান। অনেকের মতে ওটা ম্যালরি অথবা আরভিনের। যা হোক, ৪ঠা জুন ফ্রাঙ্ক স্মিথ ২৮১২৬ ফুট উঁচুতে উঠে নর্টনের রেকর্ডেরই পুনরাবৃত্তি করেন।

এভারেস্ট সম্বন্ধে স্মিথের একটা মন্তব্য আজও আমরা বিস্মৃত হইনি—

'Other mountains may be climbed by an application of mere force and skill but Everest will ever remain a pilgrimage of the spirit as much as an adventure of the body.'

১৯৩৪ সনে সম্পূর্ণ এককভাবে এক অভিনব অভিযান চালিয়েছিলেন মরিস উইলসন। তাঁর খামখেয়ালীপনায় সত্যই বিস্মিত হতে হয়। তিনি স্থির করেছিলেন প্লেনে চড়ে এভারেস্ট যাবেন আর সেখান থেকে সোজা পায়ে হেঁটে তিনি নেমে আসবেন মাটির পথে। প্লেন চালানো তিনি জানতেন না, কিন্তু শিখে নিতে তাঁর দেরি হয়নি মোটে। পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না, কিন্তু তাতে তাঁর কিছু যায়-

আসে না। কোনরকমে একটা প্লেন কিনে তিনি ভারতে এলেন, তারপর পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে অগ্রসর হলেন।

ভারত সরকার তাঁর এই খেয়ালীপনায় বিরক্ত হয়ে প্লেনটা আটকে রাখেন। তিনি তাতেও নিরুৎসাহ হলেন না। পায়ে হেঁটেই তিনি এভারেস্ট যাওয়া স্থির করেন। সন্ন্যাসজীবনের ওপর তাঁর ছিল পরম অনুরাগ। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনে তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। কৃচ্ছ্রসাধনে ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন সর্বজনধন্য।

সামান্য চাল আর একটা তাঁবু নিয়ে তিনি ১৯৫০০ ফুট উঁচুতে উঠে কিছুদিন বিশ্রাম নেন। তারপর সেখান থেকে কয়েকজন শেরপা জোগাড় করে তিনি আগের বছরের অভিযাত্রীদের ৩নং ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হন। শোনা যায়, ২৯শে মে তিনি নর্থকলের ভয়ঙ্কর একটা ঢালু জায়গা অতিক্রম করতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৯৩৫ সনে শিপটনের নেতৃত্বে পঞ্চম এভারেস্ট অভিযাত্রীদল গঠন করা হয়। এই দলে বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ছিলেন টিলম্যান, কেম্পসন ও ওয়ারেন। আজকের এভারেস্টজয়ী তেনজিং ছিলেন এই দলের নগণ্য একজন শেরপা। ৪ঠা জুলাই এঁরা রংবুকে এসে পৌছান ও ৮ই জুলাই ৩নং ক্যাম্পে উপস্থিত হন। ৯ই জুলাই তেনজিং ওখান থেকে কয়েকশত গজ দূরে উইলসনের মৃতদেহটা আবিষ্কার করেন।

প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে দলটা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। নর্থ-কল পর্যন্ত গিয়েই অভিযান বাতিল করতে হয়।

১৯৩৬ সনে হিউজ্ রাটলেজ আর-একবার এভারেস্ট অভিযানের নেতৃত্ব করেন। এই দলেও ছিলেন শিপটন, কেম্পসন, ওয়ারেন প্রভৃতি গত বছরের অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরা। এ ছাড়া বিশিষ্ট অভিযাত্রী পূর্বপরিচিত ফ্রাঙ্ক স্মিথও এই দলে অংশ গ্রহণ করেন। ২৫শে এপ্রিল দলটা রংবুকে এসে হাজির হয়। আবহাওয়া তখন ভাল ছিল। কিন্তু তা অল্প সময়ের জন্য। দু-একদিনের মধ্যেই তার ভীষণ অবনতি দেখা দেয়। অভিযাত্রী দলটি কিন্তু হাল ছাড়েনি।

দুর্যোগের মধ্যেই তাঁরা এগিয়ে গিয়ে ৩নং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর শিপটন ও স্মিথ সাহসের ওপর নির্ভর করে আরও এগিয়ে ৪নং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন বটে, কিন্তু আবহাওয়ার ক্রমাবনতিতে ভয় পেয়ে শেষে নেমে আসেন।

এর পর অভিযাত্রী দলটি ভাল আবহাওয়ার জন্যে কিছুদিন অপেক্ষা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে আসেন।

১৯৩৮ সনে সপ্তম এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব করেন এইচ. ডব্লু. টিলম্যান। এই দলেও ছিলেন শিপটন, ফ্রাঙ্ক স্মিথ প্রমুখ পূর্ব-পরিচিত বিশিষ্ট অভিযাত্রীরা।

৭ই এপ্রিল অভিযাত্রী দলটি রংবুকে এসে পৌঁছান ও ২৬শে এপ্রিল ৩নং ক্যাম্পে হাজির হন। এর পর আরম্ভ হয় ভীষণ তুষারপাত। অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা নেমে আসেন। ১৮ই মে টিলম্যান সঙ্গীদের নিয়ে আবার ৩নং ক্যাম্পে গিয়ে ওঠেন। সেখান থেকে তিনি বহু চেষ্টার পর শিপটন ও স্মিথকে সঙ্গে নিয়ে ২৫৮০০ ফুট উঁচুতে ৫নং ও ২৭২০০ ফুট উঁচুতে ৬নং ক্যাম্প স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যবশত আবহাওয়া এবারও মারাত্মক খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে অভিযান প্রত্যাহার করতে হয়।

এর পর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—মহাকালের কুটিল ভ্রূকুটি যেন মানুষকে এক বিরাট ধ্বংসনেশায় প্রলুব্ধ করলো। শুরু হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পৃথিবী জুড়ে। ছারখার হয়ে গেল মানুষের-হাতে-গড়া শান্তির ঘর, সাধের সাধনা, আবিষ্কারের নিত্য-নতুন সঙ্কল্প। থেমে গেল দীর্ঘদিনের এভারেস্ট অভিযান।

…যুদ্ধ থামল। আবার উঠল শান্তির চিরোজ্জ্বল সূর্য। ঘরছাড়া মানব-পশু ফিরল প্রেম ও প্রীতির ঘরে…। সমষ্টির কল্যাণে তারা নিল সঙ্ঘবদ্ধ সঙ্কল্প। এভারেস্ট আবিষ্কারের রুদ্ধ বাসনাও সেই সঙ্গে অবারিত হল।

১৯৫১ সনে চার্লস হাউসটনের নেতৃত্বে আবার একটা অভিযাত্রী

দল গঠিত হল। এই দলটি প্রথম নেপালের মধ্য দিয়ে অভিযান শুরু করেন। রাজনৈতিক জটিলতার জন্যে এই ধরনের কর্মসূচীর প্রয়োজনও হয়েছিল যথেষ্ট। খুম্বু-গ্লেসিয়ার পর্যন্ত গিয়ে দলটি ফিরে আসেন। স্মরণ রাখা উচিত, ভারত থেকে পরবর্তী অভিযানগুলো নেপালের মধ্য দিয়ে চালানো হয়ে আসছে।

এই বছরেই শরৎকালে পূর্বখ্যাত শিপটনের নেতৃত্বে এভারেস্ট কমিটি আবার একটি অভিযান চালিয়েছিলেন। এই দলের অন্যতম সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মারে, হিলারি, বুঁদিলো ও রিডিফোর্ড। ২৩শে আগস্ট দলটি যোগবাণীতে এসে পৌঁছান। তারপর নামচেবাজার হয়ে ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮০০০ ফুট উঁচু পুমোরিতে বেস-ক্যাম্প স্থাপন করেন। এই পুমোরি সম্বন্ধে রাটলেজের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

'Pumori stands up alone, ivory-coloured, like a tooth of some gigantic tiger.'

যা হোক, ২রা অক্টোবর তাঁরা লো-লার নিকটবর্তী হন ও সেখানে আর-একটি ক্যাম্প করে কিছুদিন পর্যবেক্ষণ চালাতে থাকেন। ফলে খুম্বু-গ্লেসিয়ারের মধ্য দিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ পথ আবিষ্কৃত হয়।

১৯৫২ সনে সুইস্ অভিযানের নেতৃত্ব করেন উইস্‌ডুরাণ্ট। কাঠমাণ্ডু হয়ে দলটি নামচেবাজারে এসে পৌঁছান ও সেখান থেকে ২০শে এপ্রিল খুম্বু আইস-ফলের পার্শ্ববর্তী বিশেষ একটি স্থানে প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করেন। এই কাজের প্রধান অগ্রণী ছিলেন তেনজিং। তাঁরই সাহায্যে ও আবহাওয়ার আনুকূল্যে দলটি একটির পর একটি ক্যাম্প করতে করতে সাউথ-কল্ ছাড়িয়ে চরম গন্তব্য পথে এগিয়ে যান। পথে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তেনজিং ও ল্যাম্বেয়ার অনমনীয় মনোবল নিয়ে ২৮২১৫ ফুট উঁচুতে উঠে পূর্ববর্তীদের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেন। এই সময় অক্সিজেন-যন্ত্রের গোলযোগের ফলে ল্যাম্বেয়ার অভিযান প্রত্যাহার করেন।

এই বছরেই শরৎকালে ৪২ জন রুশিয়ান নর্থ-কল্ দিয়ে শীর্ষ

অভিযান চালিয়েছিলেন। রুশিয়ানদের এইটেই ছিল প্রথম এভারেস্ট অভিযান। এঁদের মধ্যে ছজন আরোহী বহুকষ্টে ২৭০০০ ফুট উঁচুতে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা কেউই নাকি আর ফিরে আসতে পারেননি।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। নতুন অভিযানের দামামা আবার বেজে উঠল কমনওয়েলথ এভারেস্ট অভিযাত্রীদের সঙ্ঘবদ্ধ পদক্ষেপে। সার্ জন হাণ্টের নেতৃত্বে ও তেনজিং, হিলারি, বুর্দিলোঁ, ইভান্স প্রভৃতি অভিজ্ঞ দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের সহযোগিতায় সাফল্যমণ্ডিত হল এই অভিযান। ইতিহাসের আর-একটা ঘটনা অমরত্ব লাভ করল। লিপিবদ্ধ হল তার পাতায় পাতায় তেনজিং আর হিলারির বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। সুদীর্ঘ অতীতের বহু বহু একনিষ্ঠ অভিযাত্রীর অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্তি পেল তাঁদের এই সাফল্যে। সহস্র ধারায় বর্ষিত হল অলক্ষ্যে তাঁদের অকৃপণ আশীর্বাদ। এতদিন যা দুর্লঙ্ঘ্য ছিল, দুর্জ্ঞেয় ছিল মানুষের কাছে, ২৯শে মে সকাল সাড়ে এগারোটায় তাও আয়ত্তাধীন হল মানুষেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে। 'At long last, Mount Everest is tangible, no longer the fabric of dreams and visions.'

১৯৫৬ সনের ২৩শে ও ২৫শে মে—এই দু'টি দিনও মানুষের অমর কীর্তির অক্ষয় স্বাক্ষর। এবারের অভিযান সুইস্‌দলের। পরিচালনা করেছিলেন এলবার্ট এগ্‌লার্। প্রথম দিন আরনেস্ট স্মিড্ ও জারগ্ মার্মেট্ আর পরের দিন অ্যাডল্‌ফ রিস্ট ও হ্যানস্‌রুডল্‌ফ ভল্ গাণ্টেন পর পর এভারেস্ট জয়ের গৌরব অর্জন করেন।

প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের গোড়ার কথা

১৯৫৮ সনে ভারতীয় চৌ-ঔ অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব করেন বুনসা। ওই দলের প্রতিভূরূপে ছিলেন ভারত সরকারের বিশিষ্ট কর্মকর্তারা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই অভিযানে বিখ্যাত অভিযাত্রী তদানীন্তন হিমালয়ান-মাউণ্টেনিয়ারীং-ইনস্টিটিউটের প্রধান অধ্যক্ষ মেজর জয়াল মৃত্যুমুখে পতিত হন। যা হোক, এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র ও চৌ-ঔ অভিযাত্রী

দলের অন্যতম সদস্য মিঃ সোনাম গিয়াটসো পোর্টার সর্দার পাসাং দামালামাকে সঙ্গে নিয়ে ২৬২৪০ ফুট উঁচুতে উঠেছিলেন।

এর পর ওই দল কাঠমাণ্ডুতে ফিরে এলে স্পন্সরিং কমিটী ওই দলের নেতাকে দিয়ে ১৯৬০ ও ১৯৬২ সনের জন্যে এভারেস্টকে রিজার্ভ করে ফেলেন। গত ১৭ই মার্চ এই কমিটীর প্রথম অধিবেশন হয়।

ওই কমিটীর সদস্যদের নাম যথাক্রমে—

১। মিঃ এন. আর. পিল্লাই—সেক্রেটারি-জেনারেল, মিনিস্ট্রি অব এক্সটারনাল অ্যাফেয়ারস্

২। মিঃ এস. এস. খেরা—সেক্রেটারি, স্টীল, ফুয়েল এণ্ড মাইনস্

৩। মিঃ এ. কে. রায়—সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অব ফাইনান্স, ইকনমিক্ অ্যাফেয়ারস্

৪। প্রফেসার এম. এস. থেকর—সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অব সাইন্টিফিক্ রিসার্চ অ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাফেয়ারস্

৫। লেফ্টেনাণ্ট-জেনারেল সার্ হেরল উইলিয়ামস্—ডাইরেক্টর, সেণ্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট—রুর্কী

৬। মিঃ এইচ. সি. সারীন—জেনারেল সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স

৭। মিঃ এ. কে. ঘোষ—জেনারেল সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অব সাইন্টিফিক রিসার্চ অ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাফেয়ারস্

এঁরা ভারতীয় অভিযানকে মূর্ত করে তুলতে একজন সুদক্ষ নেতার অনুসন্ধান করছিলেন। জুলাই মাসে এই কমিটীর আবার অধিবেশন হয় ও তাতে হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারীং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কর্ণেল (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) জ্ঞান সিংকেই তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে নেতা হিসেবে নির্বাচিত করেন। জ্ঞান সিং তখন বিলেতে ছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ফিরে এলে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত তাঁকে জানানো হয় আর তাতে তাঁর সমর্থনও আদায় করে নেওয়া হয়।

১৯৫৯ সনে জুলাই মাসে তিনি ফরাসী জাতীয় পর্বতারোহণ-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আহূত এক আন্তর্জাতিক পর্বতারোহী সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি সুইস্-পর্বতারোহণ-জুবিলি সপ্তাহেও অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি অস্ট্রিয়া, জার্মানি, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ডের পর্বতারোহণ-প্রতিষ্ঠানগুলোও পরিদর্শন করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে জ্ঞান সিং ফিরে এলে এভারেস্ট অভিযাত্রীদের চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্যে একটা প্রাথমিক মহড়া দেবার কথা ওঠে। এই মহড়া তেনজিংয়ের নেতৃত্বে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারীং ইনস্টিটিউটের চতুর্থ অ্যাডভান্স কোর্সের সঙ্গে কাবরু আইস্-ফলে দেওয়ানো হয়। বলা বাহুল্য, কাবরু আইস-ফলটা খুম্বু-গ্লেসিয়ারের মতই ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল। যা হোক, এই মহড়ায় পর্বতারোহণের সব রকম সাজ-সরঞ্জাম, যেমন—পোশাক-পরিচ্ছদ, তাঁবু, বরফ-কাটা কুঠার, অক্সিজেন-সিলিণ্ডার দিয়ে প্রত্যেক সভ্যকে নানাভাবে পরখ করা হয়।

তারপর তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হয় কী করে পাহাড়ের উচ্চতম সীমায় উঠতে হয়, কী করে অভিযাত্রীদল গঠন করতে হয়, কেমন করে অক্সিজেনের সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয়, কেমন করে বিপদ-আপদ অতিক্রম করে ভয়ঙ্কর দুর্গম অঞ্চলে ক্যাম্প করতে হয় ও একটির সঙ্গে আর-একটির যোগাযোগ রাখতে হয়। এই দলের সভ্যদের অধিকাংশই ছিলেন হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারীং ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র অথবা শিক্ষক অথবা কোন বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মচারী।

এ ছাড়া এই দলে ২৩জন ছাত্রকে একটি বৃহত্তর অভিযান পরিকল্পনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁরা প্রতি তিন-চার জনে এক-একটি দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত অভিযানের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়গুলো অনুশীলন করেন ও শেষে পরিকল্পনা-সূচী প্রণয়ন করেন। এইভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নির্বাচন শেষ হয়। আর সেই সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শুরু হয়।

এই ঐতিহাসিক ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের সদস্যদের নাম যথাক্রমে—

১। ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং (লীডার)

২। শ্রী কে. এফ. বুনসা (ডেপুটি লীডার)

৩। ফ্লাইট লেফ্‌টেনাণ্ট এম. এস. ভগ্নানী (ডাক্তার)

৪। ফ্লাইট লেফ্‌টেনাণ্ট এ. কে. চৌধুরী

৫। ক্যাপ্টেন এস. কে. দাস (ডাক্তার)

৬। শ্রী নয়াং গাম্বু

৭। শ্রী সি. ভি. গোপাল (ক্যামেরাম্যান)

৮। ফ্লাইট লেফ্‌টেনাণ্ট এ. জে. এস. গ্রেওয়াল (ট্রানস্‌পোর্ট অফিসার)

৯। শ্রী সোনাম গিয়াটসো

১০। ক্যাপ্টেন এ. বি. জঙ্গলওয়ালা

১১। ইন্সট্রাক্টর লেফ্‌টেনাণ্ট এম. এস. কোলী

১২। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র কুমার

১৩। শ্রী বি. ডি. মিশ্র

১৪। লেফ্‌টেনাণ্ট এস. সি. নন্দা (সিগ্‌নাল্‌ অফিসার)

১৫। শ্রী এস্‌. ইউ. শঙ্কর রাও (মেটারোলজিষ্ট)

১৬। শ্রী আর. বিক্রম সিং

১৭। শ্রীসোহন সিং

১৮। শ্রী আঙ তেম্বা

১৯। শ্রীদানামগিয়াল

২০। শ্রী সি. পি. ভোরা (জিওলজিষ্ট)

২১। শ্রীধনবীর রাই

২২। শ্রীনায়ক বালকিষণ্‌

২৩। শ্রীওম্‌প্রকাশ ভেইদ

হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারীং ইনস্টিটিউট

এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে অনেকেরই হয়তো সঠিক ধারণা নেই। অনেকেরই হয়তো জানা নেই—পর্বতরোহণের প্রাথমিক শিক্ষা আজ কয়েক বছর আগে থেকে এখানেই দেওয়া হচ্ছে। তাই এর গোড়াপত্তনের কথা আমি সর্বাগ্রে সকলকে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি।

১৯৫৩ সনে তেনজিং এভারেস্ট জয় করলে তাঁর সাফল্যগৌরবে জন্ম নিলো আজকের এই প্রতিষ্ঠান। এর মূল উদ্যোক্তা হচ্ছেন প্রধান মন্ত্রী নেহরু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তেনজিং পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা সম্মানে বিভূষিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রকৃত সম্মান তিনি পেয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাই এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। এর মাধ্যমে আজ কত ছেলে দুরূহ পর্বতারোহণে অসীম সাহসের পরিচয় দিচ্ছে—কত ছেলে কৈশোরের স্বপ্ন যৌবনে মেটাচ্ছে এখানে এসে কে তার হিসেব রাখে। তবে এ কথা খুবই সত্য, পর্বতারোহণ ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় স্পোর্টস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদিও এই স্পোর্টস ভীষণ কষ্টসাধ্য, ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল।

এই প্রতিষ্ঠানটি চলছে একটা স্বায়ত্তশাসিত গোষ্ঠীর দ্বারা। এর কার্যনির্বাহক বিভাগে আছেন ঃ প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু—সভাপতি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—সহঃ সভাপতি। আর সব সভ্য, যেমন—পাতিয়ালার মহারাজা, সিকিমের মহারাজকুমার, বিড়লা, টাটা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গের কেউ কেউ। ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং হচ্ছেন এর অধ্যক্ষ আর তেনজিং ডাইরেক্টর অব্ ফিল্ড ট্রেণিং।

এই প্রতিষ্ঠানের Capital Expenditure-এর শতকরা সত্তর ভাগ ব্যয় বহন করেন কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিশ ভাগ বহন করেন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার; আর Recurring Expenditure-এর পঞ্চাশ ভাগ কেন্দ্রীয় আর পঞ্চাশ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

এখানে বছরে চারটি বেসিক কোর্স করান হয়। এক একটা বেসিক কোর্সে চব্বিশটি ছাত্র নেওয়া হয়। তার মধ্যে প্রতিরক্ষা-দপ্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যে থাকে ছ'টি আসন, এন. সি. সি.র জন্যে ছ'টি, আর বাকী সব বেসরকারী শিক্ষার্থীদের জন্যে। প্রতি ছাত্রকে ফি জমা দিতে হয় ৪২০ টাকা হিসেবে প্রতি কোর্সের জন্যে।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যে খরচ করেন প্রতিরক্ষা বিভাগ। এন. সি. সি.র ছাত্রদের জন্যে খরচ করেন এন. সি. সি.-র কর্তৃপক্ষ আর বেসরকারী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে খরচ দিতে হয় ৪২০ টাকা হিসেবে নিজেদের পকেট থেকে।

এ পর্যন্ত ছাব্বিশটি বেসিক কোর্স ও সাতটি অ্যাডভান্স কোর্স নেওয়া হয়েছে। আডভান্স কোর্সে এখন নেওয়া হয় মোট ছ'টি ছাত্র। বেসিক কোর্সে যে সব ছাত্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারে তাদেরই মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয় ঐ ছ'টি ছাত্র।

বেসিক কোর্সের বেস-ক্যাম্প হয় ১৫০০০ ফুট উঁচু চৌরিকিয়াঙে। সেখানে ঐ সব ছাত্রকে বারো দিন থাকতে হয়। সর্বসমেত ৪২ দিন হচ্ছে ওদের কোর্স। তার মধ্যে প্রথম ১০ দিন শিক্ষা চলে খাস দার্জিলিঙে। সকাল ছ'টায় আরম্ভ হয় ব্যায়াম শিক্ষা। তারপর হাঁটা অভ্যাস। ৩।৪ মাইল থেকে ১০।১২ মাইল পর্যন্ত প্রত্যেক দিন। পিঠে রাখতে হয় ২০ পাউণ্ডের বোঝা। এ হাঁটা অভ্যাস সমতল ভূমিতে নয়, সম্পূর্ণ অসমতল পার্বত্য অঞ্চলে। কখনো হয়তো অনেকটা উঁচুতে উঠতে হয়, আবার কখনো হয়তো বহু নীচে নামতে হয়। এইভাবে চলে হাঁটার প্রাথমিক শিক্ষা। এ ছাড়া প্রচুর বক্তৃতাও দেওয়া হয় নানা বিষয়ে, যেমন—অভিযান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, হিমবাহ, হিমপ্রপাত, হিমালয় ও আল্পস্। তারপর প্রায় ৭০ মাইল হেঁটে যেতে হয় বেস-ক্যাম্পে আর ফিরতেও

হয় হেঁটে। সুতরাং এই আসা-যাওয়াতেই প্রায় ১৫।১৬ দিন লেগে যায়।

বেসিক কোর্সের ছাত্রদের বেস-ক্যাম্পে থাকাকালীনই প্রকৃত কার্যকরী শিক্ষা হয়। এখানে ছাত্রদের শেখানো হয়—কি করে পাহাড়ে উঠতে হয়, কি করে কঠিন শিলাস্তূপ পার হতে হয়, কি করে হিমবাহ অতিক্রম করতে হয়, কি করে তুষারের চোরাফাটল থেকে মুক্তি পেতে হয় ও হিমবাহে ধাপ কাটতে হয়। প্রত্যেক দিন সকালে ছেলেদের পিঠে রুক-স্যাক নিয়ে যেতে হয় ৭।৮ মাইল হেঁটে ১৭০০০।১৯০০০ ফুট উঁচু কোন গ্লেসিয়ারে বা শৃঙ্গে ঐসব কার্যকরী শিক্ষার জন্যে। এ ছাড়াও ওদের নিয়ে যাওয়া হয় ২০০০০।২১০০০ ফুট উঁচু কোন চূড়ায়।

অ্যাডভান্স কোর্সই হচ্ছে প্রকৃত অভিযান যাতে থাকাকালীন ছাত্রদের ২৪০০০।২৬০০০ ফুট উঁচু কোন শৃঙ্গ আরোহণ করতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই অ্যাডভান্স কোর্স প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালে ৪ জন ছাত্রকে নিয়ে। তাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে কামেত (২৫৪৪৭ ফুট) ও আবি গামিন (২৪১৩০ ফুট) আরোহণ করেন।

দ্বিতীয় অ্যাডভান্স কোর্স হয় ১৯৫৬ সালে আট জন ছাত্রকে নিয়ে। তাঁরা কারাকোরাম রেঞ্জে সসের কাংড়ি অভিযানে বের হন। কিন্তু শীর্ষারোহণের কোন উপযুক্ত পথ না পাওয়া যাওয়ায় তাঁরা সিকাং (২৪১৫০ ফুট) অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সাফল্যের সঙ্গে তা উত্তীর্ণ হন।

তৃতীয় অ্যাডভান্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে ৬ জন ছাত্রকে নিয়ে। তাঁরা ভারতের অন্যতম উচ্চ শৃঙ্গ নন্দাদেবী (২৫৬৪৫ ফুট) অভিযানে যান। শীর্ষ থেকে মাত্র ৬০০ ফুট নীচু পর্যন্ত পৌঁছে তাঁরা ভীষণ তুষারঝঞ্ঝার সম্মুখীন হন। ফলে তাঁদের সমস্ত চেষ্টা শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

চতুর্থ অ্যাডভান্স কোর্স সম্পাদন করা হয় কাবরু আইস্‌ফলে তেনজিং-এর সুদক্ষ নেতৃত্বে, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ অভিযানে আমাকেও অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। কারণ ভারত সরকার একটা জীবতত্ত্ব-গবেষণা (Physiological Research) বিভাগ খোলবার পরিকল্পনা নিয়েছেন এই পর্বতারোহণ প্রতিষ্ঠানে। এখানে উঁচু ভূভাগে (High altitude) ব্যাধি সম্পর্কে গবেষণা হবে। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে খুব কমই গবেষণা হয়েছে।

আজকের এই হাই অল্টিচ্যুড রিসার্চ ল্যাবোরেটরীর পরিকল্পনা ও গোড়াপত্তন থেকে যাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রী এইচ. সি. সারীন ও ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ডি. জি. এ. এফ. এম. এস. ও ডিফেন্স মাইন্‌স ল্যাবোরেটরীর অবদানও বড় কম নয়। সর্বোপরি ডাঃ হীরালাল সাহার (প্রফেসর অব্‌ ফিজিওলজি, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) সক্রিয় সাহায্য ল্যাবোরেটরী স্থাপনের কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। ডাঃ সাহা এখন এই বিভাগের অনারারী অ্যাডভাইসার।

বলা বাহুল্য, এই ধরনের একটা গবেষণা কেন্দ্রের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ, কতকগুলো বিশেষ ঘটনা আমাদের এই প্রয়োজনীয়তাকে নিঃসন্দিহান করেছে।

আমরা দেখেছি, ষোড়শ বেসিক কোর্সে একটি ছাত্রকে ভীষণ জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তেও তার ডানদিকের ফুসফুস আক্রান্ত হতে। কিন্তু তাকে নীচে নামিয়ে আনার পর দেখেছি সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছে।

সপ্তদশ কোর্সের সময়ও একজন ছাত্র বেস-ক্যাম্পে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় কিন্তু সেও নীচে নেমে আসার পর সুস্থ হয়ে ওঠে।

এও দেখা গেছে, অনেক দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলে উঁচু ভূভাগে খুব নরম প্রকৃতির হয়ে গেছে, আবার অনেক নরম প্রকৃতির ছেলে অতি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির হয়ে উঠেছে ওখানকার আবহাওয়ায়।

যা হোক, কর্তৃপক্ষ এর জন্যে বেশ কিছুদিন আমায় দিল্লীর ডিফেন্স সায়েন্স ল্যাবোরেটরীতে নিয়োগ করেছিলেন ; ফলে সেখানে অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে।

থাক সে কথা—এবার প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির সম্বন্ধে কিছু বলি।

এখানে একটি লাইব্রেরী আছে। তাতে অনেক মূল্যবান বই রাখা হয়েছে এবং আরও রাখবার চেষ্টা চলছে। কোন বই পর্বতারোহণ সম্পর্কে কোনটা অভিযান বা আবিষ্কার সম্বন্ধে আবার কোনটা বা জ্যোতির্বিজ্ঞান অথবা ভূতত্ত্ব সম্পর্কে—এমন নানা রকমের। জ্ঞান সিং ইউরোপ ভ্রমণকালে এই লাইব্রেরীর জন্যে অনেক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন—সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জাপান, জার্মান, ক্যানাডা ও সুইস আলপাইন ক্লাব, গ্রেটব্রিটেনের স্কাই ক্লাব ও সোভিয়েট রাশিয়া ও ফ্রান্সের পর্বতারোহণ প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যতম। এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে সাহায্য করেছেন। জন হাণ্টের সাহায্যও এ ব্যাপারে কিছু কম নয়।

প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ মেজর জয়ালের (নান্দু) স্মৃতিরক্ষার্থে এখানকার সভাকক্ষটির নাম রাখা হয়েছে 'জয়াল হল'। এই হলে নান্দুর একটা বিরাট আলেখ্য রাখা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে একটা 'শো-কেসে' তাঁর ব্যবহৃত ব্যাজ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও যন্ত্রপাতি-গুলোও রাখা হয়েছে। এ ছাড়া এখানে 'জয়াল মেমোরিয়াল ফাণ্ড' নামে একটা সাহায্য তহবিল আছে। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুধু দার্জিলিং থেকেই এ যাবৎ দশহাজারেরও অধিক টাকা এই তহবিলে সংগ্রহ করা হয়েছে। দরিদ্র, অক্ষম শেরপাদের আর্থিক সাহায্য করাই এই ফাণ্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রতিষ্ঠানটিকে জনপ্রিয় করতে এখানকার বর্তমান অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং ও ফিল্ড ডাইরেক্টর তেনজিং নোরগে প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বেড়ান। দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মহীশূর, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ এমন কোন স্থানই আজ আর তাঁদের

বাদ নেই। বিভিন্ন অঞ্চলে পর্বতারোহণ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তৃতা দিয়ে নানান দলিল-চিত্র দেখিয়ে তাঁরা জনসাধারণকে প্রতিষ্ঠানটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটি আজ ক্রমেই জন-সমাদর লাভ করছে। দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এটিকে পরিদর্শন করবার জন্যে আজ এখানে এসে ভিড় করছেন। ভিজিটর্‌স্ বইয়ে এখন রেজেষ্ট্রী করা দর্শকের সংখ্যাই তো প্রায় ১৪০০০।

এ ছাড়া বিভিন্ন Hiking ক্লাব ও ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান পর্বতারোহণ শিক্ষার জন্যে এখানে সাহায্য চেয়ে পাঠাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠান তাই ঠিক করেছে ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে দু'জন করে ট্রেনার পাঠাবে, পক্ষান্তরে তাঁরা ঐ ট্রেনারদের দুপিঠের ট্রেন-ফেয়ারের সঙ্গে থাকা-খাওয়ার খরচ দেবেন।

পর্বতারোহণকে জনপ্রিয় করতে ভারতীয় ফিল্ম ডিভিসন 'Call of the Mountains'-এর ইংরেজী ও হিন্দি অনূদিত ১৬ কপি প্রামাণিক চিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান জার্মান ও কানাডার দূতাবাস থেকেও কিছু কিছু ফিল্ম ঋণ হিসেবে নিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধান—

১। Skiflyers—on Ski-Jumping Olympics
২। Meteorological Observation Station
৩। Nanga Parbat—১৯৫৩ সালে অষ্ট্রো-জার্মান অভিযানের সম্পূর্ণ রঙিন চিত্র
} জার্মান

৪। How to Climb Mountain
৫। Ski-Skills
৬। Cliff Hangers
} কানাডা

প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম আকর্ষণ—মিউজিয়াম। ১৯৫৭ সালে ২৫শে ডিসেম্বর এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন প্রধান মন্ত্রী নেহরু। এর দর্শনীয় জিনিসগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—গিরিশৃঙ্গগুলোর উচ্চতা ও পর্বতারোহণের চিত্রাবলীসহ বিবরণ, বেসিক ও অ্যাডভান্স কোর্সের কার্যাবলীসহ ছবি, এভারেস্ট অভিযানে তেনজিং-এর সাজ-সজ্জা,

পৃথিবীর পর্বতারোহণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ফ্লাগ ও ব্যাজ, উচ্চতম ভূভাগের পাখি মাছ প্রজাপতি ও পাহাড়ী জাতির পোশাক-পরিচ্ছদ।

প্রতিষ্ঠানটিতে প্রথম পর্যায়ে পাঁচ হাজার টাকার জিনিস সুইজারল্যাণ্ড থেকে আনানো হয়েছিল। তারপর অতিরিক্ত আরও এগারো হাজার টাকার জিনিস আনানো হয়। বর্তমানে পর্বতারোহণের যাবতীয় জিনিস দেশীয় ব্যবসা কেন্দ্রগুলো থেকে সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। আর সেদিক থেকে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী ও বাটা সু কোম্পানি আশানুরূপ ফল দেখাতে পেরেছে।

ইনস্টিটিউটের সম্মুখভাগে একটা বাগান তৈরীর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই বাগানে থাকবে বহুবিধ বাহারে গাছ, ফুলের গাছ ও উল্লেখযোগ্য পাহাড়ী চারা। বিচিত্র বর্ণের ফুল ও নানাবিধ গাছের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এবং বোটানি শিক্ষার প্রয়োজনে সুশোভিত হয়ে থাকবে এর বিস্তৃত ভূভাগ।

মহিলাদের উৎসাহিত করাতে কর্তৃপক্ষ ছাব্বিশতম বেসিক কোর্সটি (২২শে এপ্রিল থেকে ২রা জুন, ১৯৬১) সম্পূর্ণ মহিলা ছাত্রীদের নিয়ে পরিচালনা করতে মনস্থ করেন। এ ব্যাপারে মহিলাদের তরফ থেকে আশাতীত সাড়া পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, তাঁরা এই কোর্সে পর্বতারোহণ শিক্ষায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিক বিস্ময়কর। সাহস ও সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও সংযম কিছুরই অভাব কোন সময়েই তাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। বরং উৎসাহ ও উদ্দীপনায় প্রথম শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁরা ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষদেরও যেন হার মানিয়েছেন।

শ্রীতেনজিং নোরগে

ডাইরেক্টর অব্ ফিল্ড ট্রেনিং, হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারীং ইন্স্টিটিউট
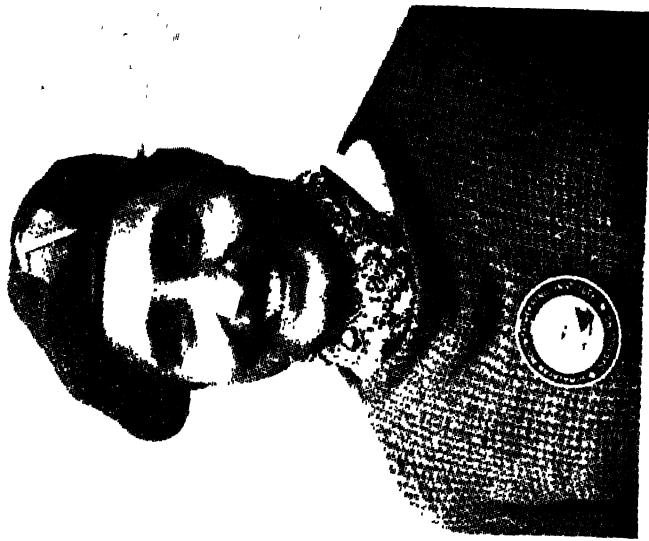
ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং

প্রিন্সিপাল, হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারীং ইন্স্টিটিউট ও লীডর, ভারতীয় এভারেস্ট অভিযান, ১৯৬০

এভারেস্ট ডায়েরী

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, শত শত পোর্টার ও শেরপা ইতিমধ্যেই স্টেশনে এসে হাজির হয়েছে। দেখে বুঝলুম, ওরা আমাদেরই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। ওদের মধ্যে আমাদের জানাশোনা কয়েকজন দার্জিলিংয়েরও শেরপা রয়েছে। গাড়ি থামার সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা এসে আমাদের অভিবাদন করল ও আমাদের জিনিসপত্র নামিয়ে আনার ভার নিল। দেখলুম কয়েকজন প্রেস-রিপোর্টারও ওখানে জমায়েত হয়েছেন। আমরা নামার সঙ্গে সঙ্গে নানা কোণ থেকে তাঁরা আমাদের ফোটো তুললেন। তারপর আমরা গেলুম ডাকবাংলোয়।

আমাদের নির্বাচিত ফোটোগ্রাফার গোপাল। ও আমাদের সঙ্গে আসেনি। বিশেষ কারণে আটকে পড়েছে বোধ হয় বম্বেতে। কিন্তু তাতে কী আসে-যায়! আমাদের বন্ধু সদাশিব কেকী এফ বুনসা এ বিষয়ে ভীষণ উৎসাহী। ফোটো তোলাতে হাতও ওর নিখুঁত। শেরপা, পোর্টারদের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ও ফোটো তুলে যেতে লাগল। আমাদেরও ফোটো তুলল বিস্তর। বেলা বাড়তে লাগল। নটা নাগাদ আমরা ওয়াগন-বোঝাই আমাদের মাল খালাস করাতে লাগলুম। আঠারো টন মাল। পোর্টাররা মাথায় করে একে একে যাবতীয় মাল নিয়ে ডাকবাংলোর বাগানে জমা করতে লাগল। এই ভাবে এক সময় মালও খালাস হল, আর আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

বিকেলের দিকে কোলীকে নিয়ে বেড়াতে বেরলুম। চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে বেশ ভাল লাগছে। গ্রাম্য পরিবেশ। শহরের উগ্র কোলাহল কোথাও নেই। কাঁচা রাস্তা। দু'দিকে আম ঝাউ দেবদারুর বন। তারই ছায়ায় ছায়ায় ছোট-বড় কুঁড়েঘর। পাকা বাড়িও রয়েছে বিস্তর। কোথাও আবার বিরাট সবুজ ধানের ক্ষেত—কৃষক আপন মনে কাজ করছে। গ্রামের ছেলেরা ছোটাছুটি করছে, দল বেঁধে খেলাধুলো করছে বাড়ির আশেপাশে। সবই আমরা দেখতে দেখতে যাচ্ছি। এই ভাবে এক সময় আমরা এসে পৌছলুম ওখানকার নামজাদা সিনেমা-গৃহের কাছে। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লুম। টিনের

নড়বড়ে চেয়ার। ভয় করছে, ব্যালেন্স ঠিকভাবে না রাখতে পারলে পড়ে মরবার সম্ভাবনা ষোল আনা। সেদিকে সচেতন হয়ে দু'পাশে একবার ভাল করে চেয়ে দেখলুম। দেয়ালগুলোতে দু'পুরু ময়লা জমে রয়েছে। বাড়িটা তৈরি হওয়ার পর থেকে বোধ হয় আর ধোয়ামোছা হয়নি কোন দিন। আবর্জনাতে বোঝাই মেঝেটা। যা হোক, কোলী আর আমি পাশাপাশি বসে শো আরম্ভের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। এক সময় ফাইন্যাল বেল বেজে উঠল। আর সেই সঙ্গে সমবেত দর্শকের বিকট একটা উল্লাসধ্বনি মুহূর্তের জন্যে আমাদের বিহ্বল করে দিল। তারপর 'শো' আরম্ভ হল। কিছুই বোঝা যায় না। অস্পষ্ট আলো, অস্পষ্ট আওয়াজ। তবুও চেষ্টা করে বোঝবার চেষ্টা করছি, ঠিক সাত মিনিট পরে আর ধৈর্য রাখা গেল না, ফিল্ম কেটে গেল। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে 'শো'ও বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে আমরাও উঠে পড়ে পুনর্জন্ম লাভ করলুম।

৫ই মার্চ ॥ শনিবার

লীডার ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং ঠিক সময়মত তেনজিংকে নিয়ে পৌঁছলেন। হাসিমুখে তিনি সকলকে অভিনন্দন জানালেন। শেরপা ও পোর্টাররা কোলাহল করে উঠল। মৌখিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া হল।

আগেই বলেছি তেনজিং হচ্ছেন আমাদের মাউণ্টেনিয়ারীং ইনস্টিটিউটের (পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের) প্রধান পরামর্শদাতা। ভারি অমায়িক লোক এই এভারেস্ট-জয়ী তেনজিং। মিষ্টি হাসি সবসময়েই ওঁর মুখে লেগে আছে। অপরিচিতকে আপন করে নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ওঁর। আমাদের বিরাট বাহিনীকে দেখে উনি যেমনটি খুশী হলেন তেমনটি মুগ্ধও হলেন।

সামনের বাগানে আঠারো টন মালবোঝাই বাক্স। ওগুলোর মধ্যে আছে আমাদের অভিযানের যন্ত্রপাতি, রেশন, নানারকমের পোশাক-পরিচ্ছদ, দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র। রেশনের মধ্যে পাহাড়ের উর্ধ্বভাগে ব্যবহারের জন্যে আছে স্বতন্ত্র রেশন। তাতে আছে চা চিনি কফি পাউডার-মিল্ক বিস্কুট। টিনবন্দী খাদ্যের মধ্যে আছে মাছ মাংস সসেজ হ্যাম ফল ও লাড্ডু। এ ছাড়া আছে মাখন পনীর বাদাম আখরোট কিসমিস স্যুপ-পাউডার ফলের রস ওভালটিন হরলিক্‌স আরও কত কী। বর্তমান ব্যবহারের জন্যে আছে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ কলা আপেল বাঁধাকপি ইত্যাদি। এ ছাড়া মুরগী, টাটকা শাকসব্জী কিংবা প্রয়োজনীয় আর-সব জিনিস তো আমরা ইচ্ছেমত গাঁয়ের বাজার থেকে পাবই।

প্র্যাক্‌টিক্যাল মানুষ তেনজিং। আশাবাদ ছেড়ে দিয়ে বাস্তবের মাটিতে নেমে এলেন। কোন্ মাল কী ভাবে যাবে, কোন্ বোঝায় কী কী জিনিস থাকবে, ঠিক ষাট পাউণ্ড ওজন হবে কি না প্রত্যেক বোঝার—সবই তিনি তদারক করতে লাগলেন। তাঁরই তদারকে প্রতিটি প্যাকিং-বাক্সে নম্বর দেওয়া হল। আর সেই সঙ্গে একটা তালিকাও করে নেওয়া হল বাক্সের রসদের। যাতে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যেতে পারে বাক্সগুলোকে। সবচেয়ে উঁচুতে যেগুলো ব্যবহার করা হবে তাতে দেওয়া হল লালচিহ্ন, অ্যাডভান্স বেস-ক্যাম্পের বাক্সগুলোতে সবুজ ও বেসক্যাম্পেরগুলোতে হলদে চিহ্ন।

এ দিনটিতে আমারও একেবারে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। প্রত্যেকের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ভার আমার ওপর। ভগ্নানী এ ব্যাপারে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করছে। স্বাস্থ্যপরীক্ষার মধ্যে রক্ত, প্রস্রাব, জীবনীশক্তি পরীক্ষা, নাড়ীর গতি, ওজন সবই দেখতে হচ্ছে। শেরপা ও পোর্টাররা এ ব্যাপারে বেজায় ভীতু। ৫ সি. সি. রক্ত দিতে ওদের হৃৎকম্প লেগে যায়, ভাবে সব গেল। দেহ থেকে রক্তই যদি বার করে দিতে হয় তাহলে বাঁচবে কীসে। এটা ওদের মতে অন্যায়,

অবিচার। মুখ ফুটে ওরা কিছু বলে না···কিন্তু মুখ দেখে বুঝতেও কিছু বাকী থাকে না। ওদের উৎসাহিত করবার জন্যে জ্ঞান সিংকে ঠিক সামনে দাঁড় করিয়ে প্রয়োজনমত রক্ত ওঁর শরীর থেকে নিলুম। কিন্তু ফল তাতে বিশেষ কিছু হয়নি। অসহায়ের মত ওরা শুধু লাফালাফি করে বলছে, 'ডাক্তার সাব্ ছোড় দিজিয়ে, মর জায়গা।' হৈ-চৈ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠছে তখন ধমকানিও লাগাতে হচ্ছে এক-আধবার। জ্ঞান সিং এ-ব্যাপারে সমানে আমায় সাহায্য করছেন। ফলে কাজ দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার শেষে মেম্বারদের নামের ওপর কালির আঁচড় দিচ্ছি, এক সময় দেখলুম সকলের নামের ওপরই আঁচড় পড়েছে—পড়েনি শুধু সোনাম ও কুমারের ওপর। ডেকে পাঠালুম দুজনকে। ওরা এল না। ওদেরও ভয় ওই রক্ত দেওয়াতে। শেষে ওদের কাছে গিয়ে রেগে-মেগে বললুম, —'দেখ, যদি না আস, তোমাদের আমি ফিজিক্যালি আনফিট করে ছাড়ব···জেনে রেখো।' নিরুপায় হয়ে অপ্রতিভের মত হাসতে হাসতে ওরা আমার পিছু নিল।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস অক্সিজেন। সেটা এখনও এসে পৌঁছয়নি। তাই ফ্লাইট লেঃ গ্রেওয়ালকে ফেলে আসা হয়েছে দিল্লিতে। সেখান থেকে সে বম্বে যাবে। ১৬০টি অক্সিজেন-সিলিণ্ডার সে নিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে সে নিয়ে আসবে কতকগুলো ওয়্যারলেস ট্রানজিস্টর সেট আর বিশেষ কতকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

৬ই মার্চ ॥ রবিবার

উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে আমাদের ঘুম ভাঙল। কারণ আজই আমাদের যথার্থ যাত্রা হবে শুরু। মহান্ যাত্রা। পদব্রজে, দীর্ঘ দুর্গম পথে। খুব ভোরে ভোরে উঠেছি সব। তেনজিংও উঠেছেন।

প্রস্তুত হচ্ছি সকলে। দেখতে দেখতে শেরপা, শেরপানী, পোর্টার, ক্যামেরাম্যান ও শত শত সম্ভ্রান্ত স্থানীয় লোকের ভিড়ে ভরে গেল সামনের ময়দানটা। তেনজিং সহাস্যমুখে এগিয়ে এলেন একগাদা স্কার্ফ নিয়ে, সর্বপ্রথম তিনি পরিয়ে দিলেন একটি স্কার্ফ ব্রিগেডিয়ারের গলায়। কানে কানে ওঁর বললেন—'আপনারা জয়যুক্ত হোন।' তারপর একে একে মেম্বার ও শেরপাদের গলায়ও পরিয়ে দিয়ে করমর্দন করলেন তিনি। বিদায়ের এই পরম মুহূর্তটিতে তিনি আমাদের কতকগুলো কথা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, অহংকার ভুলে আমরা যেন পাহাড়কে বন্ধুর মত গ্রহণ করি। চলার পথে পাহাড়ী অধিবাসীদের রীতিনীতিকে যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলি। আর লীডারের প্রতি আনুগত্য কখনও যেন না শিথিল করি। সবশেষে তিনি আর-একটি স্কার্ফ নিয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে ব্রিগেডিয়ারের হাতে দিয়ে বললেন, 'মা চুমালুংগমার (এভারেস্টের) পায়ে আমার এই উৎসর্গটুকু পৌঁছে দেবেন।' তারপর আমাদের দিকে ফিরে একটু থেমে বললেন, 'এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় আপনারা যখন উঠবেন তখন অন্তত একবারের জন্যেও আমার কথা স্মরণ করবেন।'

এর পর স্থানীয় লোকেরা আমাদের মাল্যদান করল। তার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত করমর্দনের পালা সাঙ্গ হল। ক্যামেরাম্যানরা ব্যস্তভাবে ফোটো তুলতে লাগলেন—কাছ থেকে, দূর থেকে। তেনজিংও সেই ফাঁকে কখন ক্যামেরা হাতে ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেছেন—লক্ষ্যও করিনি তা।

সীমান্তে প্রায় কয়েক সহস্র লোক সমবেত হয়েছে আমাদের অভিনন্দন্ জানাতে। আগের দিন রাত্রি থেকে শুধু স্থানীয় লোকেরাই নয়, বহু দূর দূর গ্রাম থেকে দলে দলে লোকেরা এসে ওখানে জমায়েত হয়েছে। এমনকি, তারা এসেছে মিথিলা-জনকপুর থেকেও। রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত তারা কাটিয়েছে বিপুল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে। কারও চোখেই ঘুম ছিল না। না ওদের, না আমাদের। আমরা সকলে যেই সীমান্তরেখায় উপস্থিত হলুম, সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত

আনন্দের গগনভেদী কোলাহল দিক্‌বিদিক্ মুখরিত করে তুলল। সঙ্গে রয়েছে তাদের কাঁসর ঘন্টা ঢাক ঢোল—আরও কত কী! ক্ষণিকের জন্যে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলুম তাদের এই প্রাণস্পর্শী আনন্দোচ্ছ্বাসে। যেন অতি প্রিয়জনের মধ্যে এসে পড়েছি আমরা। মা বাবা ভাই-বোনেদের মাঝখানে। দীর্ঘদিনের বিদায়ের প্রাক্কালে। খুব খানিকটা হৈ-চৈয়ের মধ্য দিয়ে যেন তারা ভুলতে চাইছে এই বিচ্ছেদের বেদনাটাকে। তাই কষ্টকে অপ্রকাশ করে হাসিমুখে সবাই আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে—'জয়তু' বলে।

এবার ছোট্ট একটি মেয়ে প্রদীপ হাতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল, ওদেরই মধ্য থেকে। প্রদীপটাকে ও আমাদের প্রত্যেকের কপালের কাছে বরণের ভঙ্গীতে ঘোরাতে ঘোরাতে আধো-আধো সুরে বলল, 'আপনারা জয়ী হয়ে সুস্থ শরীরে ফিরে আসুন।' এর পর মুহুর্মুহু মাল্যদান, মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি। পুরোহিত উচ্চারণ করলেন পবিত্র মন্ত্র। কপালে দিলেন চন্দন-তিলক। আর-একটি মেয়ে থালা হাতে আরতি শুরু করল। লক্ষ্য করলুম, থালাটিতে কুমকুম দিয়ে ভারত-নেপালের একটি মানচিত্র আঁকা আর তাতে এভারেস্টের বিভিন্ন পথের চিহ্নরেখা। এখানেও ক্যামেরাম্যানদের দৌড়োদৌড়ির অন্ত নেই। ভিড় ঠেলে তাঁরা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় আমাদের ছবি তুলতে লাগলেন।

এখানকার অধিবাসীদের একটা কথায় মস্ত আপত্তি। তা হচ্ছে 'এভারেস্ট বিজয়' কথাটিতে। ওরা ওই কথা শুনলে ভীষণ চটে যায় লক্ষ্য করেছি। নেহেরুজীও তাই আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন ওই কথাটিতে। তিনি বলেছেন আমরা যেন অসাবধানতাবশেও হিমালয় জয়ে যাচ্ছি উচ্চারণ না করি। আমাদের বলা উচিত হিমালয়ের সঙ্গে সখ্যতা করতে যাচ্ছি।

বিদায় নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তটি আরও মধুর, আরও মর্মস্পর্শী। সবাই আমরা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি। এমন সময় লীডার জ্ঞান সিং

বাঁশি বাজিয়ে যাত্রার সংকেত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একতালে পা বাড়ালুম, আমাদেরই অভ্যর্থনার জন্যে ওখানকার শ্রেষ্ঠ মৃৎশিল্পীকে দিয়ে তৈরী বিরাট তোরণের তলা দিয়ে। তোরণের একপাশে গান্ধীজী, অন্যপাশে পণ্ডিতজী, মধ্যিখানে রাজা মহেন্দ্রের প্রতিকৃতি। তাতে বড় বড় হরফে লেখা—'আপকো সফলতা হো'। পথের দু ধারে কাতারে কাতারে লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। সামনে সংশয়হীন অফুরন্ত জীবনের প্রতীক একদল শিশু কুচকাওয়াজ করতে করতে আগে আগে এগিয়ে যাচ্ছে সোজা-পথের শেষ সীমায়। ক্রমে তাদের ফেলে রেখে যখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় মুহূর্তের জন্যে একটি হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন শিশু আমার হাত ধরে বললে, 'আমিও যাব।'

হেসে জিগ্যেস করলুম, 'কোথায় ?'

সে একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, 'কেন, পাহাড়ে—যেখানে তোমরা যাচ্ছ।'

—বড় হও, যাবে বৈকি। একবার কেন, একশোবার যাবে।

—শিখিয়ে দেবে, কেমন করে চড়তে হয় পাহাড়ে।

—নিশ্চয়ই।

শিশুটিকে যে প্রতিশ্রুতি দিলুম তা মিথ্যে নয়। আজকের 'হিমালয় পর্বতারোহণ প্রতিষ্ঠান' যে তার সত্যতা বহন করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই।

নেপাল সীমান্তে মহানুভব নেপাল সরকারের একজন অফিসার আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি আমাদের সঙ্গে মিটিয়ে নিলেন। এবার আমরা নেপালে প্রবেশ করলুম। নেপালের উত্তর-পূর্ব ভাগ দিয়ে আমরা চলতে শুরু করলুম হিমালয়ের দিকে। দীর্ঘ পথ, অনন্ত পথ। চলেছি তো চলেইছি। মনে অফুরন্ত উৎসাহ। প্রাণে অসীম বল। দুটো দলে আমরা ভাগ হয়ে গেছি। প্রথম দলে আছি আমি,

আর জ্ঞান সিং, বুনসা, সোনাম গিয়াটসো, দানামগিয়াল, কোলী, মিশ্র, কুমার, ভোরা ও রাজবিক্রম। এছাড়া আছে তিনশো জন পোর্টার, শেরপা ও পঞ্চাশ জন বিচিত্র সাজে সজ্জিতা শেরপানী। ওদের মধ্যে রয়েছে আমার প্রিয় শেরপা সুশ্রী যুবক রাজেন্দ্র। বহু পূর্ব থেকেই ও আমার সঙ্গে পরিচিত। আদর করে ওকে আমি ডাকি 'রাজু' বলে।

আমাদের পিঠে আছে কুড়ি পাউণ্ডের রুক-স্যাক। এই ব্যাগে আছে আমাদের প্রয়োজনীয় যা-কিছু। রোজকার ব্যবহারের। আছে জামাকাপড়, জলের পাত্র, ফ্লাস্কে-ভর্তি চা, টর্চ, এমনকি, কিছু কিছু খাবারদাবারও। সামনে পেছনে চলেছে আমাদের সুখদুঃখের সাথী পোর্টার, শেরপা ও শেরপানীরা ভারী ভারী মাল পিঠে নিয়ে। ওরা পৌঁছে দেবে ওগুলো আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

মাথার ওপর মেঘমুক্ত আকাশে উজ্জ্বল সূর্যালোক, নরম গরম তার উত্তাপ এখনও আমাদের তেমন পরিশ্রান্ত করে তোলেনি। চারিদিকের ঝিরঝিরে মনোরম হাওয়া আমাদের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাচ্ছে। চারিদিকে গ্রাম্য পরিবেশ। সবুজের ছড়াছড়ি। মনে করিয়ে দিচ্ছে বারে বারে···বহুদূরে—ফেলে-আসা আমার ছোট্ট গ্রামটির কথা। সত্যি বলতে কী, নেপালের গ্রামের সঙ্গে আমাদের গ্রামের কোথাও পার্থক্য নেই। সেই ছোট ছোট কুটির···সামনে পেছনে ছোট বড় জানা-অজানা গাছের ঝোপ-ঝাড়···ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ আলো-আঁধারের আলিম্পন। সেই চারা গাছের ভিড়···সদ্য-গজিয়ে-ওঠা··· বাড়ির সামনে গৃহস্বামীর নিজের হাতে বোনা। সংসারের মাধুর্য-মায়ার যত মধুর সঞ্চয়!

সোনাম গিয়াটসো ব্রিগেডিয়ারের পাশে পাশে চলছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন ও। মনে মনে বোধ হয় ও প্রার্থনা করছে। যা হোক, একটানা এক ঘণ্টা চলার পর আমরা কমলা নদীর তীরে এসে পৌঁছলুম। নদীর নির্মল জলে আমরা কেউ কেউ আমাদের উপহারলব্ধ ফুলের মালা, স্তবক ভাসিয়ে দিলুম। জ্ঞান সিং তাঁর রুক-স্যাক থেকে তাঁর

স্ত্রীর দেওয়া পূজার উপকরণাদি বার করলেন। তারপর হাঁটুজলে নেমে তা তিনি ভাসিয়ে দিলেন প্রবহমান স্রোতে। ভেসে গেল ওগুলো দূরে জলস্রোতে নৃত্যের তালে তালে, চোখের অন্তরালে।

আবার চলতে শুরু করলুম। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে চলেছি আমরা। কোথাও ধানের কোথাও গমের বিস্তৃত ক্ষেত, ছোলা-মুগ-মটরে ভর্তি উর্বর ভূভাগ। কোথাও নদীতীরে···কল্লোলিনীর বালুকা-বেলায় পাতিহাঁসের ঝাঁক, রাজহাঁস ও মৎস্যভুক পাখির আনাগোনা। আবার কোথাও নানা জাতের নানাবর্ণের অগণিত পাখির কলকাকলি। এমনিভাবে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে একসময় আমরা ছত্রীতে এসে পৌঁছলুম। এগারো-বারো মাইলের পথ পার হয়ে এলুম মাত্র পাঁচ-ছ ঘণ্টায়। ছত্রীতে আমাদের প্রথম তাঁবু ফেলা হল।

সামনে একটা ছোট নদী মন্থরগতিতে বয়ে চলেছে। কাঁচের মত তার জল। পারলুম না আমরা তার দুর্নিবার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে। একটুখানি জল। গলাও ডোবে না তাতে। কিন্তু তাতে কী যায়-আসে! ওইতেই আমাদের আনন্দ দেখে কে? ঝকঝকে পরিষ্কার জল ঘুলিয়ে উঠল আমাদের দৌরাত্ম্যে। ওইটুকু জলেতেই হাজার রকম সাঁতারে মশগুল হয়ে উঠলুম সকলে। চিৎ-সাঁতার, ডুব-সাঁতার—যে যত রকম কেরামতি জানে। পোর্টার, শেরপারাও বাদ নেই। মেয়েরাও বসে রইল না। চলল এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত সবুজ ঝোপ-ঝাড়। পরিবেশটা বড় সুন্দর মনোমুগ্ধকর।

তার মাঝখানে খেতে বসলুম আমরা জটলা করে। শাকসব্জী, আলু-কপির তরকারী, ভাত, ডাল, মুরগীর ঝোল। উপাদেয় খাবার, আরও উপাদেয় হয়ে উঠেছে আমাদের 'হেডকুক' থণ্ডুর রান্নায়। ওর রান্না বিখ্যাত, বহুজনবিদিত। বিগতদিনের বহু বহু পর্বতারোহী ওর রান্নার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। বিলিতী রান্নায় ও সিদ্ধহস্ত। ওর রান্না একবার যে খেয়েছে সে ওকে কিছুতেই ভুলতে পারবে না,

এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। বিদেশী অভিযানকারীরা তাদের অভিযানকালে থণ্ডুর খোঁজ করে, এ কথা আমরা শুনেছি অনেকবার অনেকের কাছ থেকে। রান্নাকে গুরুপাক করা ওর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অথচ লঘুপাকে রান্নাকে অমন সুন্দর সুস্বাদু করতে ওর জুড়ি মেলা ভার। নিত্য-নতুন কায়দায় নিত্য-নতুন ওর রান্না। যাত্রাপথে ও তাই আমাদের মূর্তিমান প্রেরণা।

বিকেলের দিকে একটা জীপ এসে হাজির নদীর ওপারে। সাংবাদিক ও প্রেস-ফোটোগ্রাফাররা এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তৎপরতার সঙ্গে ছবি তোলা হল, খবরাখবরও নেওয়া হল। সেই সুযোগে আমাদের জরুরী চিঠিগুলো ওঁদের হাতে দিয়ে দিলুম জয়নগর থেকে পোস্ট করার জন্যে। কিছুক্ষণ পরে ওঁরা বিদায় নিলেন।

ছত্রীতে পৌঁছোনো থেকেই স্থানীয় লোকেদের ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠছে। তাঁবুর মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারা লোকের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বেড়ে উঠছে। শেষে কর্ডন বা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল আমাদের এলাকা। শুধু নিরাপত্তার জন্যেই। এখন থেকে আমার স্থানীয় রুগী দেখা শুরু হল। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে প্রধান কাজ হচ্ছে সকলের শরীর কেমন আছে তার খোঁজ নেওয়া। তারপর যারা অসুস্থ তাদের তদারক করা। সে দলীয়ই হোক আর স্থানীয়ই হোক, নির্বিশেষে চিকিৎসা করতে হবে। আজ থেকে রুগী দেখার সংখ্যা বেড়ে উঠছে। কমপক্ষে পঞ্চাশ জন রুগীকে আজ আমি এখানে বসে দেখলুম।

এখানে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে রাজেন্দ্র বিক্রম ও কোলীর ব্লু-টেপ-রেকর্ডিং অর্থাৎ বিকৃত গলায় বেসুরো গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা, যে যা বলে রেকর্ড করে নেওয়া, তারপর তা বাজিয়ে শোনানো। প্রথমে বিক্রম নিজেরই নানা ঠাট্টাবিদ্রূপের গান, বক্তৃতা রেকর্ড করে সকলকে শোনাল। তারপর আর আর যারা করতে ইচ্ছুক তাদেরও

করল। আমাদের টেন্টটা বড়। কারণ এটা 'মেস টেন্ট'। সাত-আট জনের ভালভাবে থাকবার মত। রেকর্ড বাজানো হচ্ছে আর আমরা জটলা করে শুনছি। এমন সময় সোনাম গিয়াটসো এসে ঢুকল। ওর স্বভাব হচ্ছে যেখানে ও একটু ছড়িয়ে শুতে পায় সেখানেই ও ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুমোনোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় প্রবল নাসিকাগর্জন। সুযোগ এই। হাতছাড়া করলুম না আমরা। আলতো করে মাইকটা ওর নাকের কাছে বসিয়ে রেকর্ড করে নেওয়া হল ওর নাসিকাধ্বনি। তারপর একসময় ওকে ঠেলে তুলে দেওয়া হল। ঘোষণা করা হল মাইকে এই বলে—'এবার আপনাদের কিছু শোনাচ্ছেন আমাদের প্রিয়বন্ধু সোনাম গিয়াটসো।'

রেকর্ড চালিয়ে দেওয়া হল। আর সেই সঙ্গে শুরু হল এক বিকট ঘড়ঘড়ধ্বনি! রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে গেল সোনাম আমাদের তাঁবু থেকে। আজ থেকে ও আর কোনদিন বোধ হয় আমাদের মধ্যে এসে ঘুমোবে না।

সন্ধ্যে থেকেই আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমছিল। রাত দশটা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। পোর্টাররা সব গাঁয়ে চলে গেছে। মুশকিলে পড়লুম আমরা। যে যার তাঁবুতে এখনকার মত আমরা কোনমতে মাথা গুঁজে আশ্রয় নিলুম। খাবারের বাক্স-পেঁটরা সব বাইরে। ভিজছে সব। গোড়া থেকে এভাবে জলে ভিজলে ওসব নষ্ট হয়ে যাবেই। বিপদে পড়তে হবে আমাদের। চিন্তায় পড়েছি। এমন সময় দানামগিয়াল এসে বলল, 'পাহাড় পর যব বারিস্ আউর এইসান হোতা হ্যায় তব্ সব্ কোইকো মদৎ করনা চাহিয়ে।' লজ্জা পেলুম আমরা। ইতিমধ্যেই কখন যে দানামগিয়াল একলাটি কিছু পোর্টার জোগাড় করে ওইসব রেশন, মালমসলার সুনিপুণ রক্ষণাবেক্ষণে লেগে গিয়েছিল তা আমরা টেরও পাইনি। কিট্‌স-ব্যাগ না পৌঁছোনোর জন্যে গরম জামা-কাপড়ের অভাবে যখন আমরা শীতে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছি, দানামগিয়াল তখন ভিজতে ভিজতে সব-

কিছুর তদারক করেছে যোগ্য দায়িত্ববোধ নিয়ে। এমনি কর্মঠ, এমনি স্বাবলম্বী সে।

দানামগিয়ালকে অভিজ্ঞ পর্বতারোহীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার হবে না। কারণ সে আপনা থেকেই সকলের কাছে পরিচিত। তার নাম জানে না এমন এভারেস্ট-অভিযাত্রী বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। সে শেরপা ছিল আগে। এখন সে আমাদের প্রধান সদস্যদের মধ্যে একজন। বিশেষ মর্যাদাসহকারে আমরা তার প্রতিটি পরামর্শ গ্রহণ করি। আর তাকে অবজ্ঞা করবার ক্ষমতাই বা কে রাখে! শান্তপ্রকৃতির মানুষ। সব সময়ই প্রায় চুপচাপ। প্রচুর কাজ করে মুখ বুজে। মুখে সর্বদাই লেগে থাকে মিষ্টি হাসি। বিপদে-আপদে সে সকলের বন্ধু। সকলের ভরসার স্থল। পরোপকার করা তার জন্মগত প্রকৃতি। তাই লেখাপড়া না জানলেও সে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। পাহাড় ও তার খুঁটিনাটি ওর নখদর্পণে। পর্বতারোহণে তাকে 'মহাপণ্ডিত' বলা যেতে পারে। কোথায় তাঁবু ফেললে অ্যাভালাঞ্চকে এড়ানো যেতে পারে তা সে জানে। সে জানে উঁচুতে বরফের ওপর কোথায় ক্যাম্প করা নিরাপদ। অসুখে-বিসুখে সে সেবা করে রুগীদের অকৃত্রিম যত্ন নিয়ে। সকলেই তাকে তাই ভালবাসে। এ ছাড়া সব ব্যাপারে তার যুক্তিও নির্ভুল। আর সেই জন্যেই বোধ হয় দেশ-বিদেশের বহু দায়িত্বশীল পর্বতারোহীরা পর্যন্ত তাকে কম খাতির করেন না। ব্রিগেডিয়ারের এখন প্রধান পরামর্শদাতা তো সেই-ই। আর হবে নাই বা কেন? বিদেশভ্রমণে গিয়েও ব্রিগেডিয়ার সব জায়গাতেই দানামের প্রশংসার কথা পঞ্চমুখে শুনেছেন বড় বড় পর্বতারোহীদের কাছে। জন হাণ্টের বাড়িতে এমনি একদিন যখন তিনি নানা আলোচনায় জমে উঠেছিলেন, তখন দানাম-প্রসঙ্গে হাণ্ট তাঁকে নিজের ড্রইংরুমে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—'চেয়ে দেখুন, আমার ঘরে দুখানা মাত্র ছবি আছে। একটা আমাদের রাণী এলিজাবেথের, অন্যটা দানামগিয়ালের।' স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার কিছুক্ষণ।

৭ই মার্চ ॥ সোমবার

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা দেখলুম চারিদিক জলমগ্ন। গতরাত্রের বৃষ্টির পরিমাণটা এ থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে। আমাদের তাঁবুগুলো খুব মজবুত। বৃষ্টির একটি কণাও তাই ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পায়নি। ফলে রাত্রের ঘুমটা বেশ গাঢ় হয়েছে। এখনও ঝিরঝির করে একটানা বৃষ্টি পড়ছে। বিরাম নেই। এ রকম অবস্থাতেও কিন্তু উদ্যোগী থণ্ডু প্রাতঃকালীন জলযোগের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ফলে খাওয়াটা বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই হয়েছে।

পোর্টাররা তখনও গ্রাম থেকে এসে পৌঁছোয়নি। তাই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার কতকগুলো উপহার-পাওয়া ছাতা আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তারপর একসময় পোর্টাররা সব এসে গেল আর আমরাও আমাদের যাত্রা শুরু করে দিলুম।

আমাদের বিরাট মিছিলটাকে এই মুহূর্তে বেশ দেখতে লাগছে। অতিমাত্রায় বৃষ্টিপাতের জন্যে চলার পথটা ঠিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চারিদিক জলে প্লাবিত হয়ে রয়েছে। তারই মধ্য দিয়ে আমাদের পথ করে নিতে হচ্ছে। একজনের পেছনে আর-একজন আমরা চলেছি মন্থর গতিতে। অত্যন্ত পিচ্ছিল পথ। ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে পা ফেলতে। বিশেষ করে মাল মাথায় ওই সব পোর্টারদের। কিন্তু এই ধরনের অসুবিধেতে অনেকে আনন্দও পাচ্ছে বিস্তর।

যা হোক, হিসেবমত কাজের উন্নতি কিন্তু কিছুই আমাদের এখনও হচ্ছে না। ফলে ভাবনা হচ্ছে যথেষ্ট। পথে একজনকে কাঁচা শাক-সব্জী নিয়ে বাজারে যেতে দেখে তার কাছ থেকে আমরা কিছু শাক-সব্জী কিনলুম। বিনিময়ে আমরা তাকে নেপালী মুদ্রা দিতে গেলুম। সে কিন্তু কোম্পানির নোট চাইলো। বুঝলুম, ভারতীয় নোটকে ওরা কোম্পানির নোট বলেই জানে। ওদের ধারণা বোধ হয় ভারতে এখনও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বই চলছে।
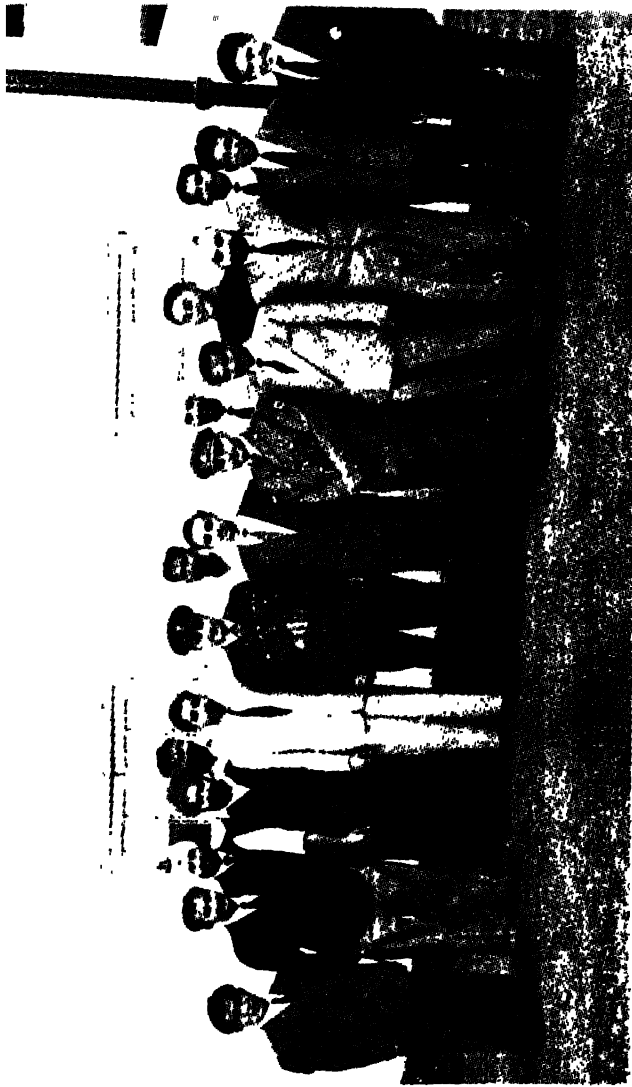
এভারেস্ট অভিযানের সদস্যবৃন্দ, ১৯৬০

বাঁদিক থেকে—শ্রীআঙ তেম্বা, ফ্লাইট লেঃ এ. কে চৌধুরী, লেঃ এম. এস কোলী, শ্রী সি. পি ভোরা, ক্যাপ্টেন এ বি. জংগলওয়ালা, শ্রীকেকী এফ বুনসা, ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং (লীডার), শ্রীশংকর রাও, ফ্লাইট লেঃ এন এস. ভগ্নানী, ক্যাপ্টেন এন কুমার, শ্রীসোহন সিং, ক্যাপ্টেন এস কে দাস, শ্রীসোনাম গিয়াটসো, ফ্লাইট লেঃ এ. জে. এস. গ্রেওয়াল, শ্রী বি ডি মিশ্র, শ্রীদানামগিয়াল, শ্রী এন গাম্বু

যাত্রার প্রাক্কালে পণ্ডিতজীর অভয়বাণী

একটার পর একটা গ্রামকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি আমরা, ধুলোমলিন পথ, আবর্জনাময়। এগিয়ে চলেছে ভারী ভারী মাল নিয়ে পোর্টার, শেরপা, শেরপানীরাও। মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে। মেলা-মেশায় ওদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ সামাজিক কোন বাধানিষেধ নেই। ওরা সহজ সরল অনাড়ম্বর। শুচিশুভ্র ওদের মন। প্রকৃতির কোলে ওরা মানুষ। জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। তাই মনে ওদের কোন প্যাঁচ নেই। যেটাকে ওরা ভাল মনে করে সেটাকে ওরা গ্রহণ করে। মন্দটাকে বর্জন করে তেমনি সহজেই।

ওদের গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত। পুরুষদের দেহে যেমন আছে পেশীর সুশ্রী গঠন—একনজরে কর্মঠ জোয়ান বলেই যেমন মনে হয় ওদের অনেক বয়স পর্যন্ত—মেয়েদেরও তেমন আছে অত্যাশ্চর্য কমনীয়তা আর অপূর্ব স্বাস্থ্যশ্রী—প্রথম দর্শনেই যা আমাদের মতন পরদেশীদের মুগ্ধ করে।

বিশেষ করে ওদের মেয়েদের পরিপুষ্ট আঁটসাঁট দেহের গঠন বুঝতেই দেয় না ওদের বয়স। কুড়িতেই ওরা বুড়ী হয় না। শরীরের জন্যে ওরা গর্ব করতে পারে যে-কোন জাতির কাছে।

ওরা ভাগ হয়ে গেছে ছোট ছোট দলে। এক-এক দলে চার-পাঁচ জন। পরিচয়ের নিবিড়তা অনুসারেই ওদের ওই দল। যাদের সঙ্গে যাদের মিল হয়েছে মনের, আচার-আচরণে ও ব্যবহারে—তারাই একত্রে চলেছে কথা কইতে কইতে একে অন্যের সঙ্গে। এইভাবেই গড়ে উঠেছে আলাদা আলাদা দলগুলো। মেয়েদের বেলায় যেমন পুরুষদের বেলায়ও ঠিক তেমনি।

শুধু লক্ষ্য করছি আমার পূর্বপরিচিত সুশ্রী তরুণ শেরপা রাজুই এর ব্যতিক্রম। ও বিশেষ কোন দলের সঙ্গে জড়িয়ে নেই। যখন যার সঙ্গে পারছে খানিকটা গল্পগুজব, লঘু হাস্যপরিহাস করে চলে আসছে আমার পাশে। ও বলে, আমি না থাকলে ওর এই যাত্রাটাই নাকি অর্থহীন হয়ে যেত। এ কথার তাৎপর্য কী তা আমি বুঝিনি—বোঝার

চেষ্টাও করিনি। তবে ও-ই আমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মেয়েদের একটি বিশেষ দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ও-ই চিনিয়ে দিয়েছে ওদলে কার নাম ঝুরা, কার নাম লছমী, আর কার নাম লামু। ওরই অনুরোধে আমি ওদের চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি ও করছি।

সমস্ত দিন পথ চলার পর ঈপ্সিত হিমালয় আমাদের গোচরীভূত হল। দূরচক্রবালে তার শৃঙ্গগুলো কী যেন এক অস্পষ্টতায় রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার জন্যে তাই আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। একভাবে আরও কিছুক্ষণ চলার পর একসময় আমরা পাহাড়ের সানুদেশে এসে পৌঁছলুম। সামনের জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ডাকপাখি আর কুক্কুটের কর্কশ-ধ্বনি।

সূর্য গেল অস্তাচলে। অন্ধকার নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। থামলে চলবে না। গন্তব্যে আমাদের পৌঁছতেই হবে। যেমন করেই হোক। দ্রুতপদে আমরা হাঁটতে লাগলুম। মাইলখানেক হাঁটার পর শেষে আমরা এসে পৌঁছলুম চিসাপানি। সাঙ্গ হল পথ। তাঁবু ফেলা হল আজকের মত।

এখানকার উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ এখানকার বাজারটা। এত বড় বাজার এ অঞ্চলে আর নেই। সুদূর অঞ্চল থেকেও তাই লোকেরা আসে এখানে তাদের যাবতীয় দরকারী জিনিস কিনতে। পোর্টাররা তাড়াতাড়ি মাল খালাস করে ছুটল বাজারে। আগামী কিছুদিনের রসদ সংগ্রহ করে নিতে।

গ্রামটির কোল ঘেঁষে বয়ে গেছে একটি স্বচ্ছসলিলা নদী। উত্তর থেকে দক্ষিণে।

আজ পথশ্রমে অনেকেই ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। তাঁবু ফেলা মাত্র অনেকে শুয়ে পড়ে ছটফট করছে অবসাদে, মাথার যন্ত্রণায়। অনেকেরই পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়েছে। কোন-কোনটা আবার

গলে গিয়ে বীভৎস আকৃতির হয়েছে। ওদের তদারকে তাই আমি লেগে গেলুম। কিছুক্ষণ পরে রাতের খাওয়ার ঘণ্টা বাজল আর সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে ছুটলুম রান্নাঘরে। থণ্ডু এখানেও তার পূর্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সুগন্ধী বাসমতী চালের ভাত, ডাল, তরকারি, মুরগীর কারি, চাটনি কিছুই রাঁধতে ও বাদ দেয়নি। ভরপুর আমরা খেলুম চোখ বুজে।

খাওয়া শেষে ব্রিগেডিয়ার আমাদের একটা করে 'ফেবার-লিউবা' ঘড়ি উপহার দিলেন। কোম্পানি-প্রেরিত উপহার হিসেবে। ঘড়ি পেয়ে তাঁবুতে বসে আমরা আনন্দে গান জুড়ে দিলুম। একযোগে, বীভৎস, বিকট। তার না আছে স্বর না আছে ছন্দ। যার যা মনে আসে তাই নিয়েই দু-এক কলি। বিরাগ নেই, বিরক্তিও নেই। যতক্ষণ চালানো যায়, ততক্ষণ চলল।

তারপর একসময় থামতে হল। সংবাদ এল, আমাদের পরম বন্ধু দানামগিয়াল হঠাৎ অসুস্থ। ছুটে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলুম। বুঝতে আর বাকী রইল না রোগটা কী। একেবারে অ্যাকিউট গ্যাস্‌ট্রোএন্টারলিস। শুধু তারই নয়—লেঃ কোলীরও। ঘন ঘন পায়খানার সঙ্গে ঘন ঘন বমি। কাহিল করে দেয় যে কোন স্বাস্থ্যবান লোককেও অতি অল্প সময়ে। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে প্রথমেই আমি কম্পাউণ্ড সাল্‌ফাগুয়াডিন ও স্প্যাসমোসিবালজিন খাওয়ালুম। আর 'তরল পথ্যের' ব্যবস্থা করলুম। কড়া নজরে রাখলুম ওদের। ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করতে লাগলুম অসুস্থতার কারণ। শেষে জানতেও পারলুম। গ্রামে গিয়ে ভীষণ তেষ্টায় কুয়োর জল খাওয়ার এই ভয়ঙ্কর পরিণাম।

সেই থেকে 'জল সম্বন্ধে' আরও কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে সবাই আগ্রহী হয়ে উঠল। জল পরিশোধন না হওয়া পর্যন্ত তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে গেলেও কেউ যেন জল না খায়—এই পরামর্শ দেওয়া হল সকলকে। সেইসঙ্গে দলের লোকদের খাওয়াদাওয়া ব্যাপারে আরও

একটা নিয়ম আমি বেঁধে দিলুম। তা হচ্ছে প্রতিদিন আট থেকে দশ পাঁইট জলসেবন। কারণ দীর্ঘ পথশ্রমে প্রচুর পরিমাণে জল আমাদের শরীর থেকে ঘাম হয়ে বার হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং পরিপূরক হিসেবে এই পরিমাণ জল শরীরের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তা না হলে ডি-হাইড্রেশনের ভয় আছে প্রতি পদে।

বুঝলুম, অভ্যাস করিয়ে নেওয়ার জন্যে এ-দিকটাতেও তাই আমায় নজর রাখতে হবে।

৮ই মার্চ ॥ মঙ্গলবার

সকালবেলা পাহাড়ের বনপথ দিয়ে আমরা যাত্রা করলুম। নির্মল আকাশ, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ। ক্রমেই তা অসহ হয়ে উঠছে। ভীষণ গরম হচ্ছে। রাত্রে ঘুমও গাঢ় হয়নি গুমোটে। দিনের বেলায়ও এখানে মশার উৎপাত। রাত্তিরে তো আর কথাই নেই।

কিছুক্ষণ চলার পর একসময়ে আমরা একটা নদীর সম্মুখীন হলুম। নদীটা বেশ চওড়া। কর্দমাক্ত চর। অতিক্রম করে যেতে হবে আমাদের। পাঁক দেখে নাক সিঁটকালে চলবে না। বিরক্ত হলে চলবে না। মাটিতে পা বসে যাচ্ছে। তবু এগিয়ে যেতে হবে আমাদের, সব বাধাকে পেছনে ফেলে।

একটু দূরে জ্ঞান সিংকে চৌধুরী কী যেন দেখাচ্ছে দেখলুম। আর সোহনও যেন সেটাকে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে। ওরা সব দাঁড়িয়ে গেছে। একটু নিকটবর্তী হতেই চৌধুরী আমায় উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'দেখ কাণ্ডটা, আর-একটু হলেই আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল আর কী!'

দেখলুম।

সামনের গাছের ডাল থেকে লিকলিকে একটা লম্বা সাপ

ঝুলছে। সর্বনাশ! কিন্তু সোহন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল, ‘ও কিছু না।’

মানতেই হবে ওর কথাটা। কারণ সোহন হফ্‌কিন ইনস্টিটিউটে একসময় বিভিন্ন সাপের কথা শুনেছে। সুতরাং এ বিষয়ে ও আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। সুযোগ বুঝে ও তাই বিজ্ঞের মত আমাদের বলতে লাগল, ‘সাপের মধ্যে নব্বুই ভাগই হচ্ছে নির্বিষ। তারা সবসময়েই আমাদের পাশ কাটিয়ে বেড়ায়। অথচ আজ যদি ওই সব সাপকে নির্বিচারে বধ করা হয় তাহলে দেখা যাবে অদূর-ভবিষ্যতে পৃথিবীটা ব্যাঙে বোঝাই হয়ে গেছে।’

আমি আর থাকতে পারলুম না। এই সুযোগে একটু বাহবা নেবার জন্যে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। তাই ওকে সমর্থন করে সাপটাকে দেখেই চিনেছি এইভাবে বললুম, ‘আরে, ও সাপটাকে তো আমরা লাউডগা বলি—একেবারে নির্বিষ।’

চৌধুরীর তবু সন্দেহ কাটে না। তাই ওর সন্দেহ নিরসনের জন্যে একটা মনগড়া কাহিনীকে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে বললুম, ‘তখন আমার বয়স অনেক কম। ইস্কুল থেকে ফিরে পেয়ারা গাছটায় উঠেছি। দেখলুম একটা পাকা পেয়ারার কাছে দড়ির মত কী যেন একটা ঝুলছে। অন্যমনস্কভাবে দড়িটার ডগাটা যেই ধরা—আর যায় কোথায়! একেবারে লাফিয়ে উঠল!’

ব্রিগেডিয়ার হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সাপ নিশ্চয়ই?’

—হ্যাঁ, লাউডগা।

চৌধুরী বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করল, ‘ছোবলাল?’

—ছোবলাল না আবার! পেরেকের মতন দুটো দাঁত একেবারে আমূল বসিয়ে দিল হাতের তেলোয়।

—কী করলে তখন?

—কী আবার করবো! যেখানটা ওর ধরেছি সেখানটা ধরেই দুপাক জোরে ঘুরিয়ে দিলুম ছুঁড়ে ফেলে।

সেই হাসির মধ্যে লক্ষ্য করেছি ওদের মুক্তোর মত দাঁতগুলোর অবর্ণনীয় শোভা।

তবু বলব, ঝুরার তুলনা নেই। অল্প বয়স। কচিকচি মুখ। ভ্রমর-কালো ছুটি চোখ সব সময়েই যেন বড় বেশী চঞ্চল। হাসিখুশিতে সব সময়েই ও প্রাণময়ী। ওর হাসিটি দেখার জন্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব, উন্মুখ। ওর তারুণ্য ও সৌন্দর্য এককথায় বিস্ময়কর। ও তাই সকলেরই স্নেহভাজন।

লছমী, লামুও স্নুন্দরী। তবে লছমীকে ওদের মধ্যে একটু বয়স্ক বলে মনে হয়। ওর নাকটা যেন একটু বেশী চাপা, আর চোখ ছুটোও কেমন যেন কটা। রাজুকে নিরাশ করবার জন্যেই তাই বললুম, 'কেন, লছমী।'

রাজু সত্যিই মুষড়ে পড়ল। ওর মুখ দেখে তা বুঝতে পারলুম। দারুণ হাসি পাচ্ছিল ওর অবস্থাটা দেখে। কষ্টে চেপে রইলুম। ও ক্ষীণ প্রতিবাদের চেষ্টায় বলল, 'ধ্যাৎ, আপনি বোধ হয় ভাল করে দেখেনইনি। নইলে ঝুরার কাছে কেউ লাগে না।'

—তা না হয় হল; কিন্তু এ নিয়ে তোমারই বা এত মাথা ঘামাবার কী আছে?

ওর দৃষ্টিটা তখনও ঝুরার দিকে নিবদ্ধ। আমার নীরস কথায় থতমত খেয়ে ও এবার চোখ ফেরাল। কাঁপা-কাঁপা স্বরে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে বলল—'না, তা নয়—মানে ইয়ে'—ঢোক গিলল ও। তারপর নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বলল, 'যাই আপনার ডাক্তারখানাটা ঠিক করে গুছিয়ে রাখিগে। নইলে আবার লোকজনের ভিড়ে সামলাতে পারব না।'

ডাক্তারখানা মানে—এম. আই. আর.—মেডিক্যাল ইন্সপেকশন রুম। নিয়মিত কাজের মধ্যে আমার অন্যতম কাজ হচ্ছে এই এম. আই. আর. খুলে বসা। এর মাধ্যমে আমি চিকিৎসা করি আমার সহকর্মীদের, স্থানীয় অধিবাসীদের। যে আসে তারই। দলীয়-

অদলীয় নির্বিশেষে। আর এর সব-কিছুর তদারক করে আমার এই প্রিয় শেরপা রাজু।

রাজু একরকম ছুটে পালিয়ে বাঁচল। ওর এই অসহায় ভাবটা দেখে বড় মায়া হল। ঠিক করলুম, ভবিষ্যতে আর এমন করে ওকে অপ্রস্তুত করব না। দুদিনের জন্যে এসেছি। ব্যক্তিত্বের বড়াই না করে যেটুকু পারি বরং আনন্দই দিয়ে যাব সকলকে সাধ্যমত। তাতে যদি নিজেকে খাটো হয়ে যেতে হয় সেও ভাল।

তিনটে নাগাদ ডাক্তারখানায় গিয়ে বসলুম। পায়ের ফোস্কা তখনও অনেককে কষ্ট দিচ্ছে। অনেকে পেটের অসুখে ভুগছে। সকলের দিকে এবার আমায় নজর দিতে হবে। কোলী সুস্থ হয়ে উঠেছে। দানামগিয়াল এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। ওকে সারিয়ে তুলতে হবে। পোর্টার, শেরপা, শেরপানীরাও হাত পেতেছে ওষুধের জন্যে। দিতেই হবে। চিনিকে ওষুধ বলে দিলেও ওরা অম্লানবদনে খেয়ে খুশী মনে চলে যাবে। ফিরেও চাইবে না আর। বাইরে থেকে এসেছে কুড়ি-পঁচিশ জন চিকিৎসা করাতে। ওদেরও দেখতে হবে মনোযোগ দিয়ে।

ঘণ্টাখানেক কেটেছে কি কাটেনি, এমন সময় রাস্তায় ডুগডুগি বেজে উঠল। বুঝতে পারলুম কোন দল বা লোক খেলা দেখাতে এসেছে। রুগীরা ছুটল চিকিৎসা ভুলে, ওষুধ ফেলে। আমিও কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে এলুম। দেখলুম, যা অনুমান করেছি তাই। একজন বিহারী বুড়ো আর একটা ছোট ছেলে খেলা দেখাতে এসেছে।

ব্যালেন্সের খেলা। সার্কাসে যেমন আমরা তারের খেলা দেখি হুবহু সেই রকম। এ শুধু যা তারের বদলে দড়ি। খুব আলগা করে টাঙানো। ছেলেটা প্রথমে তার ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। তারপর একটা একটা করে নানা ব্যালেন্সের কৌশল দেখাতে লাগল। সবশেষে দড়ির ওপর একটা বাঁশ খাড়া করে ও তরতর করে অবলীলা-ক্রমে উঠে গেল তার ওপর। তারপর নিজেকে একরকম বিপন্ন করে

দীর্ঘ-অভ্যাসে আয়ত্ত-করা খেলাগুলো ও দেখাতে লাগল একটার পর একটা।

নির্বাক বিস্ময়ে আমরা সব দেখছি। 'টেপ-রেকর্ডার' রাজেন্দ্র বিক্রম অতি মনোযোগের সঙ্গে লেগে গেছে ওদের গানবাজনা রেকর্ড করতে—ভ্রুক্ষেপ নেই ওর কারও দিকে।

খেলা দেখতে দেখতে কুমারেরও খেলা দেখাবার ইচ্ছে হল। আর যেই ইচ্ছে অমনই কাজ। কিছু একটা ও দেখাবেই এবার। এত দর্শকের বাহবা পাবার লোভ কী করে সামলায়! স্থানীয় কোন লোকের কাছ থেকে কখন ও একটা টাট্টু ঘোড়া চেয়ে এনেছে। ভিড় ঠেলে ও ঘোড়াটাকে নিয়ে সকলের সামনে এসে দাঁড়াল। ওটাতে চড়ে ও-ও দেখাবে ব্যালেন্সের নানাবিধ কৌশল।

কিন্তু হায়! সব আশাতেই বুঝি বাদ সাধল ওই পাজী ঘোড়াটা। সেই যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, কিছুতেই আর নড়ে না। কুমার যত তাড়া দেয়, ততই ওটা যেন খুঁটির মত অচল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কুমার নাজেহাল। গালমন্দ শুরু করল। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। হতচ্ছাড়া ঘোড়াটা কুমারের 'প্রেস্টিজ' ঢিলে করে দিতে যেন বদ্ধপরিকর।

এদিকে সকলে ওর রকম-সকম দেখে হেসে মরছে। শেষে কুমার বিরক্ত হয়ে চেপে বসল ওর পিঠে। দু হাতে সজোরে চেপে ধরল ওর ঘাড়টা। মৃদু বুটের আঘাত দিল ওর পেটে।

টাট্টু অনেক সহ্য করেছে এতক্ষণ। আর নয়। এবার সে দৌড়ল তীরবেগে। এলোমেলোভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত। কুমার ভীষণ ঝাঁকুনি খেতে লাগল—শূন্যে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল ও কিছু একটা আশ্রয়ের জন্যে। বেসামাল হয়ে গেছে বোধ হয় বেচারী। নইলে অমন করবে কেন!

শেষে এক সময় ও ছিটকে পড়ল টাট্টুর পিঠ থেকে, কয়েক গজ দূরে। পা দিয়ে দর্‌দর্‌ করে রক্ত বেরুচ্ছে—হাঁপাচ্ছে ও। ওর রকম

দেখে সকলেই হাসছিল। ও কিন্তু তা ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের অসহায়তাকে ঢাকতে গম্ভীর হয়ে বলল, 'পোলো খেলা হলে দেখিয়ে দিতুম।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'কাটল কী করে?'

রাগতভাবে ও জবাব দিল, 'পেরেকে। আবার কিসে?' ঘোড়ার ক্ষুরে যে সত্যিই একটা পেরেক বার হয়েছিল তা এতক্ষণ কেউই লক্ষ্য করেনি।

৯ই মার্চ ॥ বুধবার

আজও খুব গরম হচ্ছে। মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও—তাই বৃষ্টিরও কোন আশা নেই। থণ্ডুর সাজিয়ে-দেওয়া প্রাতঃরাশ তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করে বেরিয়ে পড়লুম। রোদ্দুর চড়া হবার আগে যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় আর কী! এ পর্যন্ত আমরা কত নদী, কত বন, কত প্রান্তর যে অতিক্রম করে এসেছি তার আর হিসেব নেই! কোন সময় জুতো-মোজা হাতে নিয়ে, প্যাণ্টুল গুটিয়ে জল কাদা ঠেলে চলতে হচ্ছে, আবার কোন সময় এবড়ো-খেবড়ো ধানজমির আল ডিঙিয়ে, ধুলোমাখা আবর্জনাময় পথে এসে নামতে হচ্ছে, কিছুরই ঠিক নেই।

আমরা একটা উপত্যকার ওপর দিয়ে চলেছি এখন। কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই। তবে মোটেই কষ্টসাপেক্ষ নয়। হঠাৎ নজরে পড়ল আমাদেরই পথে একটি ছেলে উটের পিঠে চড়ে আগে আগে যাচ্ছে। ছেলেটি বিহারী। ভারি সুন্দর দেখতে লাগছে এই মুহূর্তে ওকে। ও যেন আমাদের কর্ণধার। মর্যাদার আসনে বসে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে আমাদের দলটিকে।

ডাকা হল ছেলেটিকে। ছেলেটি ফিরল।

লীডার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ভাড়া খাট ?'

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল সম্মতি জানিয়ে।

—সামনের গ্রামটাতে আমায় পৌঁছে দিতে কত নেবে ?

—এক টাকা।

—মোটে ! নিয়ে এস তোমার উট। দেখি চড়ে একবার।

ছেলেটি উটটাকে বসাল। আমি ওঁার গা ঘেঁষে দাঁড়ালুম। দেখতে লাগলুম জানোয়ারটার দেহটা অবিমিশ্র কৌতূহলে। কারণ, মিথ্যে বলব না, এত কাছে থেকে এই ধরনের জীবকে ইহজন্মে আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সকলের অলক্ষ্যে উটটার গলাতে একবার হাত বুলিয়ে নিলুম। একরাশ ধুলো আমার হাতে উঠে এল।

লীডার উটের পিঠে চড়বার আগে যতটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, চড়বার সময় কিন্তু ততটা দেখা গেল না। অপ্রতিভের মতন হাসতে হাসতে উনি এগিয়ে এলেন। সবার দিকে চাইতে চাইতে। সহযাত্রীরা যে যার ক্যামেরা তুলে রেডি। ভয়ে ভয়ে উনি চড়ে বসলেন উটের পিঠে। উটটা এবার যেই পেছনের পা গুটিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেল অমনি ঘটল বিভ্রাট।

টাল সামলাতে না পেরে লীডার পড়ে যাচ্ছিলেন পেছন দিকে,— 'আহা-হা-হা !'—সকলে হৈ-হৈ করে উঠল।

কুমার পাশে ছিল, ধরে ফেললো। আর-একটু হলেই হয়েছিল আর কী! একটা অবশ্যম্ভাবী হাস্যকর ঘটনা থেকে ও লীডারকে বাঁচিয়ে দিল। নড়বড় করতে করতে উনি এবার উটটার পিঠটা খামচে ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। পেছন থেকে এবারও অনেকে ক্যামেরার বোতাম টিপল।

চেঁচিয়ে বলল, 'দেখিস্, বুড়োকে যেন ফেলিসনি।'

—আপনারা রইলেন, পেছন থেকে লুফে নেবেন। উটচালক ছেলেটা উত্তর দিল।

বুঝলুম ছেলেটা বড় ডেঁপো। সত্যি কথা বলতে কী, লীডারের

উটের পিঠে চড়া এমন একটা অভাবনীয় কিছু নয়। কিন্তু শহর থেকে অনেক—অনেক দূরে এই নির্জন নিরালা গ্রাম্য-পরিবেশে এই অতি-সাধারণ ঘটনাটাই যে আমাদের এত আনন্দ দিচ্ছে তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। এ পর্যন্ত আমরা পাহাড়ের উচ্চতার কতটুকুই বা অতিক্রম করেছি! মাঝে মাঝে তাই বড় উৎসুক হয়ে উঠছি। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠছে কঠিন পার্বত্যপথ—খাড়া তুষারধবল শৃঙ্গমালা—ভীষণ গ্লেসিয়ার, দারুণ তুষার-ঝঞ্ঝা। তারা যেন আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। কবে যাব আমরা তাদের সান্নিধ্যে! কবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হব আমরা তাদের সঙ্গে নির্ভীক যোদ্ধার মত!

উটচালক এক সময় লীডারকে গন্তব্যস্থানে নামিয়ে দিল। উনি হাসতে হাসতে আমায় বললেন, 'দেখ তো ডাক্তার, শরীরের হাড়গুলো আমার সব ঠিক ঠিক জায়গায় আছে কি না?'

সশব্দে হেসে উঠলুম আমরা। সব্বাই।

লীডারের মুখে শুনলুম ছেলেটা বলছিল—ওর প্রভু একজন বিহারী। তার আরও পাঁচটা উট আছে। ওগুলো ভাড়া খাটিয়ে সে নাকি বছরে দু শো থেকে বারো হাজার টাকা রোজগার করে। ও তার কুড়ি টাকা মাইনের কর্মচারী।

লক্ষ্য করলুম, এ তল্লাটে বিহারীদের বসবাস খুব বেশী। অনেক পুরুষ ধরে ওরা এখানে বাস করে আসছে। কেউ কেউ বিহারের মুখই দেখেনি এ পর্যন্ত। মাতৃভূমি বলেই হয়তো ওরা জানে নেপালকে। ব্যবসা ওদের এখানে একচেটিয়া। নানাবিধ দোকান সাজানো রয়েছে ওদের এখানে-সেখানে, চারিদিকে।

যা হোক, এক সময় আমরা 'আস্তাই'-এ এসে পৌঁছলুম। মিশ্র এখানে একটা হাস্যকর কাণ্ড করল। চুল কাটাতে নাকি ওর খুব হাতযশ। লীডারের মাথার চুল বড্ড বড় হয়েছে। বিশ্রী দেখতে লাগছে। ও নাকি 'ফ্যাশান ছেঁটে' দেবে।

লীডার ওর আশ্বাসে নির্ভর করে বসে পড়লেন। মিশ্র ছাঁটতে

লেগে গেল। বেশ জুত করে বসল। ভাবলুম, হাত বেশ পাকাই হবে! কিন্তু হায়, আমাদের সে আশায় ছাই পড়ল।

খাবলে খাবলে ও আনাড়ীর মত কাটতে লাগল চুলগুলো, অনভ্যস্তের মত ও একটা জায়গাকে মেলাতে গিয়ে আর-একটা জায়গাকে কদাকার করে ফেলতে লাগল। শেষে বোধ হয় বিরক্ত হয়েই ও লীডারের মাথাটাকে চেঁচে-ছুলে সাফ করে দিল। প্রায় ন্যাড়া করার সামিল। লীডার এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন, এবার মাথায় হাত দিয়ে সীমাহীন বিস্ময়ে বললেন, 'করলে কী, মাথার চুলগুলো কোথায় ?'

দলের যতগুলো ক্যামেরা ছিল সবগুলোকেই একসঙ্গে ব্যবহার করা হল এই কৌতুককর মুহূর্তে।

কেকী হঠাৎ এক সময় বড় বেশী দায়িত্বশীল হয়ে উঠল। মাল-পত্রগুলো পরীক্ষা করতে করতে ও দেখল অক্সিজেনের একটা বাক্স নেই। বেজায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও। ওর বিশ্বাস, কোন পোর্টার নিশ্চয়ই ওটা খুইয়েছে। ট্রাঙ্ক কল্ করতে যাচ্ছিল ও কর্তৃমহলে, যাতে বিলেত থেকে সত্বর একটা অক্সিজেন বাক্স আনিয়ে দেওয়া হয়। আমরা জানি ওটা জয়নগরে ফেলে আসা হয়েছে। নিশ্চয়ই ওটা দ্বিতীয় দলের সঙ্গে রয়েছে। তাই ওকে বোঝানো হল, দ্বিতীয় দল আমাদের থেকে মাত্র একদিনের পথ পেছনে রয়েছে। ওদের কাছ থেকে খোঁজ নেওয়ার পর না হয় উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাবে।

ক্ষান্ত হল কেকী তখনকার মত।

চারটের সময় নিয়মমত ডিস্পেন্সারিতে গিয়ে বসলুম। রাজু করণীয় যা কিছু সবই করে রেখেছে। রুগীদের পরীক্ষা শুরু করে দিলুম। কিছুক্ষণ রুগী দেখা, ওষুধ বিলির পর জায়গাটা একটু নিরিবিলি হলে রাজু আবার প্রলাপ শুরু করল। ও আজ আমায় অতিমাত্রায় খোসামোদ করছে। কখনও বা স্বগতোক্তি করছে। আবার কখনও বা কাউকে সামনে রেখে নবাবী চালে বক্তৃতা দিচ্ছে।

ও একটা বুড়োকে ওষুধ দিতে দিতে বলল, 'ডাক্তারী কাজটা··· বুঝলেন না···বড় ঝামেলার। বড় খাটাখাটুনি করতে হয়। ডাক্তার সাব্ তো সময় সময় নিশ্বেস ফেলবার সময় পান না।'

শ্রোতা তক্ষুনি বলল, 'সে আর দেখতে পাচ্ছি না!'

—যত সব রুক্ষ ঝামেলা। আমি বলি, অত খাটুনির দরকার কী বাবা! একটা হুকুমেই যখন দশটা মাথা কাজ করে তখন আপনার অত দৌড়োদৌড়ির কী দরকার! আপনি শুধু বসে বসে হুকুম চালান। দেখুন হয় কি না-হয়?

এবার সোজা আমার দিকে ফিরে বলল, 'আমি কী ছাই একলা অত সব ম্যানেজ করতে পারি। তবে হ্যাঁ, আর-একজন হলে কারও পরোয়া রাখতুম না।'

রাজুর আসল বক্তব্য এখানেও অস্পষ্ট। তাই সহজভাবে বললুম, 'খাটাখাটুনি আর কোথায় হচ্ছে! ও তো···'

—আলবৎ হচ্ছে। কে বললে হচ্ছে না। আমি আমার চোখ ছুটোকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না।

বুঝলুম না গায়ে পড়ে হঠাৎ এত দরদ কেন! চুপ করে রইলুম। রাজু আবার শুরু করল, 'তবে হ্যাঁ, এ সব কাজে মেয়েদের যথেষ্ট দক্ষতা আছে। ওরা একটু সাহায্য করলে কাজটা অনেকটা হালকা হয়ে যায়। কিন্তু হলে কী হবে? ওরা কি আর তা করবে? তার চেয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ালে কাজ হবে। ধিক্, ধিক্!'

রাজুর বক্তৃতার মূল সূত্রটা এবার খুঁজে পেয়েছি। মুখ ফিরিয়ে তাই বেশ খানিকটা হেসে নিলুম। তারপর গম্ভীর হয়ে বললুম, 'তবে আর ওদের বলে কাজ নেই, কী বল? আর-একটা ছেলেছোকরাকেই তোমায় সাহায্য করতে বলি। কথা যেকালে ওরা শুনবে না, তখন মুখ নষ্ট করে···'

—শুনবে না মানে? ওদের বাপ শুনবে আপনি বললে। আর ওই ঝুরাটা তো সব সময়েই ওদের সঙ্গে ফাজলামি করে

বেড়াচ্ছে, দেখলে গা জ্বালা করে। বলুন না ওকে, বেশ জব্দ হয়ে যাবে।

—তা ঠিক, ওইটুকু মেয়ের অত কিসের ফাজলামি! দিচ্ছি টিট্ করে, দাঁড়াও।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে রাজু একেবারে লাফিয়ে উঠল। একরকম চিৎকার করে বলল, 'ডেকে আনব ওকে?'

—আজ থাক, কাল দেখা যাবে।

রাজু যেন তবুও একটু চুপসে গেল। হঠাৎ-হাওয়া-কমে-যাওয়া বেলুনের মতন।

ডুগডুগি বাজছে বাইরে। নিশ্চয়ই সেই বুড়ো আর তার ছেলে খেলা দেখাতে এসেছে। বেরিয়ে এলুম তাই খেলা দেখতে। আমরা এখানে তাঁবু ফেলব শুনে ওরা আগে থেকেই এসে হাজির হয়েছে। আজও ওরা দড়ির ওপর নতুন-পুরোনো নানারকম খেলা দেখাল। ওদের লোভ দেখলুম যতটা না পয়সার দিকে, তার চেয়ে বেশী ছবি তোলাতে। ওদের আমরা খুশী করলুম ছবি তুলে, পয়সা দিয়ে, সিগারেট-লজেন্স-বিস্কুট খাইয়ে। রাজেন্দ্রবিক্রম ওর কাজ ঠিকই করে চলেছে। আজও ও টেপরেকর্ড করল কতকগুলো গানের।

থণ্ডু ঠিক সময়েই ডিনারের ঘণ্টা বাজাল। ওর হাতে ঘড়ি নেই, কিন্তু সেকেণ্ডের হিসেবটি পর্যন্ত ও রাখতে পারে। পঞ্চাশের ওপর ওর বয়স। কিন্তু যে কোন যুবকের চেয়েও অনেক বেশী পরিশ্রমী। সকালে সকলকে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে সকলের শেষে ও ক্যাম্প ছেড়ে যায় আর সকলের আগে ও পরবর্তী ক্যাম্পে রান্নার রসদ, সাজসরঞ্জাম সাজিয়ে বসে। ওর সহৃদয়তার তুলনা নেই। কৃতজ্ঞতায় তাই সময় সময় মন ভরে ওঠে এই পরদেশী বৃদ্ধ সহগামীটির ওপর।

আজ মনটা খুব খুশী রয়েছে। তৃপ্তির একটা নিশ্বাস ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। ডাকহরকরা আজ এই প্রথম আমাদের সকলের চিঠি

মিউজিয়ামের অভ্যন্তরে

(হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারীং ইন্‌স্টিটিউট)

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের একাংশ

নিয়ে চলে গেছে। আমারও কখানা চিঠি ওতে আছে—পৌঁছে দেবে ও চিঠিগুলো ঠিক জায়গায়। সেগুলো যাবে আমার পরমাত্মীয়দের কাছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় যারা আমার ফিরে যাওয়ার দিন গুনছে।

আমার মা, বাবা, ছোট ভাইবোনেরা, আমার আর-আর সব আত্মীয়রা কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে! আমি আজ অনেক দূরে। কোন বড় ঘটনা—সে আনন্দেরই হোক আর যত দুঃখেরই হোক—ঘটে গেলে আজ আর কেউ আমায় তা জানাবে না শুধু আমারই মঙ্গলের জন্যে। এই অসহায় অবস্থায় তবু বার বার আমি মনে মনে প্রার্থনা করি, 'ভগবান, যেমনটি দেখে এসেছি তেমনটি যেন গিয়ে দেখি সকলকে।'

১০ই মার্চ ॥ বৃহস্পতিবার

ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হল। তা হোক।

আজ আর তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। আজ থেকে যাব এখানে, দ্বিতীয় দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শুধু আমি নয়, জ্ঞান সিং, রাজেন্দ্রবিক্রম আর কিছু শেরপা পোর্টারও। প্রথম দল চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। সকলের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করলুম পরস্পর। লছমী গেল না। কারণ, ওর বাড়ি এখানে। ও আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে দেখা করবে। ঝুরা, লামুও দেখি ওর সঙ্গে রয়ে গেল। রাজুর কথা আলাদা। ও আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট বা ব্যক্তিগত সহকারী। ও আমার ডানহাত, কাজেই ও তো থাকবেই।

প্রথম দল চলে গেল। আশ্চর্য, একটু আগেও যে কথাটা ভাবতে ভাল লাগছিল, এখন আর তা লাগছে না। বিশ্রাম নেবার যে সুযোগটির আমি প্রতীক্ষা করছিলুম মনে মনে, এই তো সেই সুযোগ।

জঙ্গল ওর স্বভাবসুলভ সারল্যে আমার হাতটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কী বরাতই করে এসেছ মানিক! দুদিন যেতে-না-যেতে দিব্যি কেমন একদিনের আরাম নিচ্ছ!'

—হিংসে হচ্ছে?

—তাতে আর লাভ কী! মিছিমিছি মন খারাপ বই তো নয়।

ভগ্নানী তারিফ করে বলল, 'সাধু, সাধু। মোক্ষলাভের তোমার আর দেরি নেই হে।'

হাসির সোরগোল পড়ে গেল। এবার আমরা ব্রিগেডিয়ারের কাছে গেলুম। উনি হাসিমুখে প্রথমেই সকলের কুশল নিলেন। ওদের সুবিধে-অসুবিধের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর নিজের কথাও কিছু কিছু বললেন। সেই উটে চড়ার মজাটা; মিশ্রর চুলকাটার বাহাদুরিটা। ওরা সরবে হেসে উঠল। আহা, এমন সিন্‌গুলো উপভোগ করা গেল না!

কথা-প্রসঙ্গে লীডার হারানো অক্সিজেন বাক্সটারও খোঁজ নিলেন। শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে, ওটা বরাবরই ওদের সঙ্গে আছে।

ব্রিগেডিয়ারকে পেয়ে শেরপা-শেরপানীদের আনন্দ আর ধরে না। ওরা কলরব করে সম্বর্ধনা করল তাঁকে। বুড়োসাহেব আজ ওদের দলে এসেছেন—কী মজা! ওরা উৎসব করবে। আমোদপ্রমোদে ভরিয়ে তুলবে সমস্ত দিনটা। সাহেবকে আজ উপহার দিতে হবে—প্রত্যেককে একটা করে সিগারেটের প্যাকেট।

ব্রিগেডিয়ার হাসতে হাসতে রাজী হয়ে গেলেন। পোর্টাররা আবার কোলাহল করে উঠল। ওদের দলপতি এবার বাঁশি বাজাল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল সকলে। এর পর শুরু হল সিগারেট দেওয়া। ব্রিগেডিয়ার নিজের তাঁবুতে গিয়ে বসলেন একরাশ সিগারেট প্যাকেট নিয়ে। পোর্টাররা একে একে গিয়ে একটা করে প্যাকেট হাতে ফিরে এল। আনন্দে ওদের মুখ উজ্জ্বল। বুড়োসাহেব ওদের সিগারেট দিয়েছেন।

এর মধ্যে একজন শেরপানী একটা মজার ব্যাপার করল। সেও সিগারেট নিতে গেছে তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে। ব্রিগেডিয়ারের কাছ থেকে সে তার বরাদ্দ প্যাকেটটা নিয়ে বাচ্চাটাকে দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ তাকেও একটা প্যাকেট দিতে হবে।

উচ্চহাস্যে মুখরিত হয়ে গেল জায়গাটা। সহাস্যবদনে ব্রিগেডিয়ার বাচ্চাটাকেও একটা প্যাকেট দিলেন।

ভগ্নানীর সঙ্গে এক সময় লেগে গেলুম রুগী দেখতে। কালকের মত আজও রুগীর যথেষ্ট ভিড় হয়েছে। সঙ্গীদের মধ্যেই তো কত রয়েছে। এছাড়া বাইরেরও আছে। গায়ে-গতরে ব্যথা, ফোঁড়া, কাটা, ঘা, মাথার যন্ত্রণা—এগুলো তো নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পোর্টার, শেরপারা কেউ কেউ নিত্য আসতে আরম্ভ করেছে একটা-না একটা অসুখের ছুতো করে—ওষুধ খেতে। ওরা সাদাসিধে। তাই ধরা পড়ে যায় সহজে। বকুনি খেয়ে ছুটে পালায়।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ওরা অসুখকে ভয় করে না। ভীষণ অসুখেও ওরা কাতর হয় না সহজে। হাসিমুখে সবরকম দুঃখকষ্টকে সহ্য করা, তাচ্ছিল্য করা ওদের প্রকৃতিগত। প্রমাণও তো তার পাচ্ছি কত। ভগ্নানী একজন পোর্টারের পিঠে এক ইঞ্চি পরিমাণ গভীর একটা ক্ষত দেখাল। একটা ধার তার পচে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। সে কিন্তু তা ভ্রুক্ষেপ না করে ঠিকই মাল বয়ে চলেছে। মালের ঘর্ষণে ঘা-টা যাতে বৃদ্ধি না পায় শুধু সেইজন্যে তাতে জড়িয়ে রেখেছে একফালি একটা কাপড়ের পেট্টি। জঙ্গল একটা মেয়ে-পোর্টারকে অসুস্থ সন্দেহ করে ভগ্নানীকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। অনুরূপ মাল বয়ে চলেছিল সে প্রতিদিন মুখ বুজে। প্রথম তাকে যখন পরীক্ষার জন্যে আনা হয় ভগ্নানীর সামনে, সে মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলেছিল, 'অসুখ না আরও কিছু। সামান্য সর্দি কাশি, ও এমনিতেই সেরে যাবে।'

পরীক্ষা করে কিন্তু দেখা যায় মেয়েটি নিউমোনিয়াতে ভুগছে।

পাহাড়ে ওঠানামায় এরা আশ্চর্যরকম কুশলী। মালের সঙ্গে ভাল করে একটা ফিতে বেঁধে তার একটা ফাঁস তারা কপালে লাগিয়ে দেয়। অদ্ভুত পদ্ধতি তাদের এই মাল বহনের। নেওয়ারদের পদ্ধতি কিন্তু আলাদা। তারা মাল বয় ঝুড়ি করে আর ঝুড়ির হাতল ঝোলে কাঁধের কাছে।

ভূটান ও তিব্বত থেকেও লোক এসে এখানে বাস করে। কিছু কিছু মুসলমানও দেখতে পাওয়া যায় কাঠমাণ্ডুতে। হাজারখানেক কাশ্মীরী ব্যবসাদারও কয়েক পুরুষ যাবৎ এখানে রয়েছে।

এবার এদের পোশাক-পরিচ্ছদের কথা কিছু বলি।

গুর্খারা গরমকালে পরে পাজামা ও জ্যাকেট অথবা সাদা বা নীলরঙের কোন লম্বা জামা। কোমরে বাঁধে একটা পেট্রি। তাতে ঝোলানো থাকে একটা কুকরি বা বড় বাঁকা ছুরি। শীতকালে ঐ পোশাকের সঙ্গে থাকে মোটা সুতির প্যাড। খরচা করতে পারলে লাগায় 'ফারলাইনিং'। মাথায় পরে কালো বা সাদা রঙের টুপি অথবা পাগড়ি।

নেওয়ারদের মধ্যে যাদের অবস্থা খারাপ তারা কোনরকমে একটু কাপড় কোমরে জড়ায়। গায়ে পরে সস্তায় তৈরী মোটা সুতি কাপড়ের জ্যাকেট। শীতকালে গরমের জ্যাকেটও ব্যবহার করে। অবশ্য জুটলে তবেই। কিন্তু যারা ধনী, বিশেষত ব্যবসায়ী, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বাস্তবিক দেখার মত। তারা সরু পাতলা প্যাণ্টের সঙ্গে পরে লম্বা আলখাল্লা বা 'টিউনিক'। মাথায় লাগায় ফার বা লোমের টুপি। খুব ছোট আকারের। কালো কিংবা সাদা কাপড়ের। কেউ কেউ আবার মেয়েদের মত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা গাউনও পরে।

স্ত্রীলোকেরা প্রায় একই ধরনের পোশাক পরে। তারা কাপড় পরে পেটিকোটের মত জড়িয়ে। সামনে অনেকগুলো ফেরতা লাগায়। লুটিয়ে থাকে তা মাটিতে। কিন্তু পেছনে কাপড়টা এত গোটানো হয় যে হাঁটু পর্যন্ত নামে কি না সন্দেহ। এ ছাড়া আছে

জ্যাকেট। অনেকটা ভারতীয় ধরনের শাড়িও পরে কেউ কেউ। শাড়িটা তারা সারা শরীরে চওড়া কোমরবন্ধের মত করে জড়িয়ে পরে। নেওয়ার মেয়েরা চূড়ার মত করে চুল আঁচড়ায়। সেটিকে রাখে মাথার মধ্যস্থলে। অন্য জাতের স্ত্রীলোকেরা লম্বা বিনুনি করে।

মেয়েরা প্রায় সকলেই নানা রকমের গয়না পরে। সাধারণত সোনার বা ব্রোঞ্জের। গায়ে লাগানো থাকে নানাবর্ণের জুয়েল বা রত্ন। মাথার গয়নাটা হয় সবচেয়ে মূল্যবান। কারুকার্যখচিত ও জুয়েলে ভরা। এ ছাড়া তারা পরে সোনার হার, আংটি, দুল, নাকছাবি। ভুটিয়া মেয়েদের গয়নাগুলো আরও সুন্দর। সূক্ষ্মতর কারুকার্যমণ্ডিত ও মূল্যবান নানা জাতের পাথর-বসানো।

তবে মনে হয় এখানকার মেয়েরা বেশী পছন্দ করে ফুলের গয়না। ফুলই দেখছি এদের সাজসজ্জার উৎসবের প্রধান উপকরণ, এখানে ফুলের তো অভাব নেই। তাই কথায় কথায় ফুলের ছড়াছড়ি। পুরুষদের মধ্যে যাদের লম্বা বিনুনি আছে তারাও নানা ফুলের বিচিত্র গয়না পরতে ভালবাসে। মেয়েদের কথা ছেড়েই দিলুম।

১১ই-১২ই মার্চ ॥ শুক্র ও শনিবার

সকালবেলা রাজেন্দ্রবিক্রম ও ভগ্নানীকে নিয়ে ব্রিগেডিয়ার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য, প্রথম দলের সঙ্গে মিলিত হওয়া। কারণ ও-দলেই তাঁর যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি আছে। এ ছাড়া আছে অধিকাংশ সদস্য, যাদের সঙ্গে তিনি এ যাবৎ যা-কিছু জরুরী পরামর্শ করেছেন।

দ্বিতীয় দলে রয়ে গেলুম আমি। জঙ্গল হঙ্গ আমাদের নয়া লীডার বা নব নায়ক। কিছুক্ষণ পরে আমরাও যাত্রা শুরু করলুম। আমাদের তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। কারণ জ্ঞান সিংয়ের মত 'ডবল মার্চ'

করে আমাদের প্রথম দলে মিলিত হবার প্রয়োজন নেই। ধীরে-সুস্থে নির্দিষ্ট গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছলেই চলবে।

গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে ক্রমেই যে আমরা পার্বত্য উপকণ্ঠে এসে পড়ছি, তা এবার বেশ বুঝতে পাচ্ছি। নরম মাটি ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠছে। গাছপালাগুলোর আকারও যেন ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে আসছে—সৃষ্টিলীলার ভোজবাজিতে। পরিবর্তনটা তাদের ঠিক যে কেমন তা বোঝাতে পারছি না, তবে এ ক'দিনে পরিচিত অরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে এদের যেন বেশ একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ছে।

পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষের সমাজেও ঘটেছে রূপান্তর। দুদিন আগেও যে সব স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, তাদের হাবভাব আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয়দের অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু এখন পরিবর্তনের ঢেউয়ে কোন সাদৃশ্যই নজরে পড়ে না।

থাক্ সে কথা।···আমরা পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পেছন থেকে দেখছি পোর্টারদের একটা নির্দিষ্ট লাইনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে আমাদের এই মিছিল—বিরাট অজগরের মত।

মেয়েদের পায়ে তিব্বতী বুটজুতো। গায়ে বিচিত্রবর্ণের অ্যাপ্রন, হাতে কিট্‌স্-ব্যাগ। কারও কারও বা বুকের সঙ্গে জড়ানো ছোট্ট একটি শিশু। গান গাইতে গাইতে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। শেরপাদের কানে গোল গোল রিং আঁটা। পেশীবহুল একটা হাত মাথার মালের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ। পেছন থেকে আমরা ওদের ছবি তুলতে লাগলুম।

সারা সকালটা আজ চড়াই ঠেলে, উৎরাই বেয়ে ওঠানামা করতে হচ্ছে। দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলো। ঔদ্ধত্যে যেন ওরা মাথা উঁচু করে রয়েছে। ওই পথে আমাদের যেতে হবে। ওখানে রয়েছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বহু

উত্থান-পতনের ইতিহাস। আমাদের কপালে কী আছে কে জানে! ভবিষ্যৎ, তুমি কি এমনি মূক হয়ে থাকবে···?

চলেছি পাহাড়ের গা বেয়ে। আনমনে।

হঠাৎ জঙ্গল বললে, 'কিসের যেন সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি বল তো?'

—তাই তো, এ গন্ধ যে আমার চেনা।

চেয়ে দেখলুম, দুপাশে কারিগাছের বন। এই গাছের পাতা রান্নায় মিশিয়ে দিলে তরকারি খুব সুগন্ধি হয়। মাদ্রাজে এই পাতার খুব প্রচলন আছে। ওরা সব রান্নাতেই দু-একটি পাতা এমনিতেই মিশিয়ে দেয়। দাম দিয়ে তাই কিনতে হয় ওখানে এই পাতা।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলুম দুপাশে ছোট ছোট কৃষিক্ষেত। পুরুষরা লাঙ্গল চালাচ্ছে আর মেয়েরা তাদের সাহায্যে রত। আমাদের দেখে ওরা অভিবাদন করল। মুখ বুজে ওরা কাজ করে না। কাজ করতে করতে ওরা গান গায়। কখনও বা ভক্তিমূলক, কখনও বা ব্যঙ্গাত্মক। আর শুধু ওরাই বা কেন? এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি একটা বিশেষ ধরনের কৌতুকগানের খুব রেওয়াজ রয়েছে। এটাকে ঠিক গান বলা যায় না—তরজা বললেই যেন ভাল হয়। যুবক-যুবতীরা এর মধ্য দিয়ে একজন আর-একজনকে কটাক্ষ করে। উত্তর-প্রত্যুত্তরও চলতে থাকে সমানে। কোন কুৎসিত যুবক হয়তো গাইতে গাইতে কোন সুন্দরী মেয়েকে আহ্বান জানাতে কটাক্ষ করে বলল—

"ভিক্ষে তোমার পায়—
মন যে আমার পিছু তোমার সদাই ছুটে যায়।"

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিল—

"বলতে ব্যথা পাই—
মরণ ছাড়া তোমার যে আর কোনও গতি নাই।"

কথাগুলো খেলো। নিতান্তই গভীরতাহীন। কিন্তু মতামতের বলিষ্ঠতা কোথাও অস্পষ্ট নয়। এই ভাবে চলতে থাকে পালাসঙ্গীত। যতক্ষণ

ঘটে বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ এর কসরত চলতে থাকে। তারপর এক সময় আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। শোনা যায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাকি এতে মেয়েদেরই বেশী। এর মধ্যে দিয়েই নাকি হয় ছেলেমেয়েদের মন দেওয়া-নেওয়া। তারপর হয় বিবাহ। শুনেছি এখানকার বিয়েরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কোন ছেলে কোন পছন্দসই মেয়েকে বিয়ে করবার পূর্বে তার সঙ্গে একবছর সহবাস করতে পারে, তারপর সন্তান না হলে অনায়াসে তাকে ত্যাগ করতে পারে। এটাই নাকি ওদের সামাজিক নিয়ম। এর মধ্যে ওরা ব্যভিচারের গন্ধ পায় না। যস্মিন্ দেশে যদাচার আর কী!

আর-এক বিশেষ ধরনের গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি আমরা। সে হচ্ছে শেরপাদের পথ-চলার গান। পথ-চলার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে শেরপারা এখন যে গান গেয়ে চলেছে, এ গানের তাৎপর্য যে কত গভীর তা ভাষায় বোঝানো যায় না। পথ যতই ভয়াবহ হতে থাকে এই গান ততই এদের শক্তি আহরণের অবলম্বন হয়ে ওঠে। ভীষণ বিপদের মুখোমুখি এরা এ গানকে বিস্মৃত হয় না। এর ভূরিভূরি উল্লেখ আছে বড় বড় অভিযাত্রীদের অভিজ্ঞতার কথায়। মনে পড়ছে কোন একটি বাংলা বইয়ে পড়া এই হিমালয়েরই কোন এক দুর্গম দুর্ভেদ্য অঞ্চলের একটা ভীষণ সন্ধিক্ষণের কথা—১৯২২ সনে ফিন্চ যখন ২৫,৫০০ ফুট উঁচুতে উঠেছেন তখন দেখা দিল ভীষণ ভয়ঙ্কর ব্লিজার্ড। হিমতুহিন কনকনে তার এক একটি ধাক্কায় এই বুঝি তাঁরা ছিটকে পড়েন পরস্পরের অভেদ্যবন্ধন থেকে। দৃষ্টি হারিয়ে যায়! বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যায়! ঠিক এই সময় ফিন্চ শুনে বিস্মিত হলেন, শেরপারা সমস্বরে গান গাইছে।

তাই তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন এদের সম্বন্ধে : ‘সম্মুখ বিপদে পড়লেও এরা কর্তব্যবুদ্ধি হারায় না। নিশ্বাস নেবার জন্যে পাহাড়ের উচ্চভূমিতে অক্সিজেনের সরঞ্জাম নিতে হয়, কিন্তু মনে হয়

অক্সিজেন সঙ্গে না থাকলেও যেন চলে, কিন্তু সঙ্গে শেরপা না থাকলে হিমালয়-অভিযান অসম্ভব।'

ক্রমেই আমরা পাহাড়ের উচ্চতর ভূভাগ অতিক্রম করছি। গরমের উগ্রতা আর নেই। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে একটু একটু করে আমরা পরিচিত হচ্ছি। আকাশে খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মেঘ। দু-এক পশলা বৃষ্টি হলেও হতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সুন্দর একটা স্থান দিয়ে আমরা চলেছি। চারিদিকে নানা বর্ণে স্তবকে স্তবকে বনফুল ফুটে রয়েছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় তার সুমিষ্ট গন্ধ মনটাকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হরেক রকম ছোট-বড় প্রজাপতির ভিড় চারিদিকে। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে শিশুর মতন খেলা করে বেড়াচ্ছে। পথের বাঁকে একটা সুদর্শন স্বাস্থ্যবান লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। দানামগিয়ালকে দেখে সে অভিবাদন জানাল। অনেক কথা-বার্তা হল অতি-পরিচিতের মত—তারপর একসময় দানাম ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এল। বলতে ভুলে গেছি—দানামগিয়াল এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। দুর্বলতাও ওর এখন নেই কোথাও। ও এখন আমারই পাশেপাশে চলেছে। ওর মুখে শুনলুম ওই লোকটি এক দক্ষ শেরপা। ওদের পরিচয় অনেকদিনের। হাণ্টের অধীনে শেরপার কাজ করেছে খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে। বহু যশস্বী অভিযাত্রীর নাড়ীর সংবাদ ও রাখে। গত অভিযানে ও একটা তুষার-ফাটলের মধ্যে পড়ে ভীষণ জখম হয়েছিল। সেই থেকে ও শেরপার কাজ ছেড়ে সৈন্য-বিভাগে যোগ দিয়েছে। এখন ও ছুটিতে বাড়ি এসেছে।

একটু পরে আমরা একটা নদীর তীরে এসে পৌঁছলুম। নদীটা ছোট। অগভীর। পরিষ্কার তার জল। ছোট ছোট মাছ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে মনের খেয়ালে। দূরে ঢালু বালুকাতটে একদল মৎস্য-শিকারী পাখি। সজাগ নজর তাদের চারিদিকে। ও-পাশে কতকগুলো ছোট ছেলে ঝুড়ি-গামছা করে মাছ ধরছে। আমাদের দেখে ওরা দৌড়ে এল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'সাহেব, চক্‌লেট।'

দিলুম, আর ঘটিতে কী আছে দেখতে চাইলুম। ওরা দেখাল। রাশীকৃত চুনো মাছে ঘটিটা প্রায় বোঝাই হয়ে গেছে। খুশী হয়ে ওরা আমাদের কিছু দিতে চাইল। কিন্তু আমরা প্রত্যাখ্যান করলুম।

আরও কিছুক্ষণ একটানা চলার পর আমরা শেষে সানকোশী নদীর তীরে এসে পৌঁছলুম। নদীটা বেশ চওড়া। অদূরে একজন মেষ-পালক তার বিরাট ছাগল ও মেষ বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। জঙ্গলের কাণ্ডই আলাদা। সে ছোট্ট একটা নধরকান্তি মেষকে কোলে তুলে নিল, আদর করল। তারপর চুমু খেয়ে ছেড়ে দিল।

নদীর কাছে এসে দেখলুম একটা নৌকো রয়েছে। ওটাকে ঠিক নৌকো বলা চলে না। অনেকটা ভেলার মত। কুড়ি-বাইশ ফুট লম্বা একটা কাঠের গুঁড়ি। তিন-চার ফুট মাত্র চওড়া। ভেতরটা ফাঁপা। মাঝি আমাদের দেখে দৌড়ে এল। জিজ্ঞেস করল, আমরা নৌকো চড়তে চাই কি না!

বিরাট উত্তেজনার মাথায় আমরা তখন অনেকেই নৌকো চড়ে বসেছি। রাওকেও টেনে তুলেছি। ওর কিন্তু ভীষণ ভয়। সকলের টানাটানিতে ওর আপত্তি ঠাঁই না পাওয়ায় ও চুপটি করে বসে আছে। মাঝি নৌকোয় দাঁড়িয়ে বিরাট লগি দিয়ে যেই মাটিতে ঠেলা দিল— নৌকোটা অমনি হড়াৎ করে এগিয়ে গেল গভীর জলে, ভীষণ স্রোত যেখানটায়। আমরা এ-ওর গায়ে ঢলে পড়লুম। নৌকোটা তীরবেগে ছুটে চলল সুমুখে।

ভয়ে চিৎকার করে রাও বলে উঠল, 'বাপ রে,—আমায় ছেড়ে দে রে—এ—এ।' কে জানত ও জলকে অত ভয় করে!

মাঝি আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, তবে বেশী নড়াচড়া করলে বিপদে পড়বেন।'

মাঝির কথামত আমরা রাওকে শান্ত করলুম। কিছুক্ষণ বেশ আরাম করে নৌকো চড়া গেল। তারপর এক সময় নৌকো থেকে

সকলেই ধীরে সুস্থে অক্ষত দেহে নামল। নামা হল না শুধু আমার। পা পিছলে পড়ে গেলুম। মাঝি লাফিয়ে পড়ে আমার হাত ধরে টেনে তুলল। রাও ও সোহন বিকটভাবে হেসে উঠল। হাসি আর থামে না ওদের। বেশ মজা পেয়েছে আমার এই পদস্খলনে। কেননা ও-ই যে একটু আগে ছিল শিশুর মত অসহায় দুর্বল। বিজয়ীর হাসি ও হাসবে না!

সবাই জিজ্ঞেস করল, লেগেছে কি না। সেবা-শুশ্রূষার কিছু দরকার আছে কি না।

আমি অপদস্থ হওয়ার লজ্জায় রাও আর সোহনকে দেখিয়ে বললুম, 'বরং ওদের বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও। বড্ড জোরে হাসছে, শেষে শিরা ছিঁড়ে না রক্তবমি করে।'

রাজু এসে আমার গা হাত পা মুছিয়ে দিল। ঝুরা, লছমীরা এক ফাঁকে এসে জিজ্ঞেস করল সত্যিই আমার কোথাও লেগেছে কি না! আমাকে হাসতে দেখে ওরা খুশী হয়ে চলে গেল।

নদীর সামনে সুন্দর একটা খোলা জায়গায় আমরা তাঁবু ফেললুম, জায়গাটার নাম তাকসালঘাট। আজকের মত যাত্রা এখানেই শেষ। লোকজন পারাপার হচ্ছে নদীতে। দু-একটা কথাও কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছে। আমাদের সেদিকে নজর দেবার এখন বিশেষ উৎসাহ নেই, কারণ ক্ষিদেয় নাড়ি জ্বলছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কোন রকমে খেতে বসবার আয়োজন করছি।

সাড়ে তিনটের সময় ডিস্পেন্সারিতে গিয়ে বসলুম। রাজু সবই মনের মত করে সাজিয়ে রেখেছে। কোথাও খুঁত রাখেনি কিছু। ঝুরাও এসেছে। গতকাল সমস্ত দিন ওর টিকি দেখতে পাওয়া যায়নি। সেই যে লছমীর সঙ্গে গিয়েছিল ওর বাড়িতে, আর ফেরেনি আজ সকাল পর্যন্ত। আজও জন পঞ্চাশ লোকের ভিড়। ঝুরাকে বলা আছে সে প্রয়োজনীয় ওষুধগুলো আমার কথামত রাজুকে বাক্স থেকে এনে দেবে—আর রাজু সেগুলো রোগীদের দেবে। সেই

মতই কাজ চলছে। মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, দুজনেই কেমন যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর। কারও মুখে রা-টি নেই। দুজনেই যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত। কেউ কারও মুখের দিকে চাইবার অবকাশটুকু পর্যন্ত যেন পাচ্ছে না। ঝুরা আমার কথামত ওষুধগুলো রাজুর কাছে দিচ্ছে আর রাজু মাথা নিচু করে আলগোছে জিনিসগুলো নিয়ে রোগীদের দিচ্ছে। সবই দেখছি। কিন্তু কিছু না বোঝার ভান করে গম্ভীর হবার চেষ্টা করছি। এক সময় কাজ মিটল। ডিস্‌পেন্‌সারিও বন্ধ হল। ঝুরাও অনুমতি নিয়ে বন্ধুদের খোঁজে বেরিয়ে গেল।

রাজু এবার আমায় একলা পেয়ে ঝুরাকে লক্ষ্য করে ওর ব্যর্থতার জ্বালা শোনাতে লাগল—'দেখলেন কী পাজি! বেকায়দায় পড়ে একটি কথা পর্যন্ত কইল না। চাপা আক্রোশে তাই মুখটা কী রকম থমথম করছিল দেখেছেন ?'

—হ্যাঁ, সেই রকমই দেখলুম।

—হুঁ, ও-সব বুজরুকি আমরাও বুঝি। ভেবেছে ওই রকম ঝিম মেরে থাকলেই আপনার কাছে রেহাই পেয়ে যাবে।

আড়চোখে ও একবার আমার দিকে তাকাল। বোধ হয় ওর চালটা ঠিক কাজে লাগছে কিনা দেখবার জন্যে। আমি ধরা না দেওয়াতে ও নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বলতে লাগল, 'সেটি হচ্ছে না। খবরদার আপনি ছাড়বেন না। একজনকে এই রকম সায়েস্তা করলেই দেখবেন আর সব ঘায়েল হয়ে গেছে। সেলাই করে আসা মুখ তখন সুড়সুড় করে খুলতে হবে বাছাধনদের।'

—তা আর জানি না। তুমিও কি আমায় তেমনি বোকা ঠাওরেছ নাকি যে মুখ বুজে থাকলেই ছেড়ে দেব ?

খুশীতে আত্মহারা হয়ে ও ছুটে এল আমার কাছে। তারপর বলল, 'আজ আপনার পায়ে খুব লেগেছে। সে আমি বেশ বুঝেছি। দিন পা-টা একটু টিপে দিই।'

১৩ই মার্চ ॥ রবিবার

সকালবেলা বেশ কড়া করে চা খাওয়া গেল। সেই সঙ্গে টোস্ট-মুরগীর ডিম, বিস্কুট তো আছেই। এবার তল্পিতল্পা বাঁধতে লেগে গেলুম। নিজেদের কেমন হালকা বলে মনে হচ্ছে। এখন ব্রিগেডিয়ার নেই। তাই নিয়মকানুনেরও কড়াকড়ি নেই। জঙ্গলওয়ালা আমাদের লীডার। একে আমাদের সমবয়সী, তায় মাটির মানুষ—অধীনতার দুর্বলতা তাই ঘুচেছে। এখন সবাই আমরা স্বাধীন, ব্যক্তি-ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে বাধা নেই কারও।

যাত্রা শুরুর আয়োজন করছি, এমন সময় কতকগুলো লোক ভেঁপু বাজাতে বাজাতে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। গান শোনাবে ওরা। জঙ্গল পয়লা নম্বরের গানের ভক্ত। দাঁড়িয়ে গেলুম তাই। ওদের সঙ্গে দুজন স্ত্রীলোকও রয়েছে। একজন বার্ধক্যের সীমায় অন্যজন যৌবনের বসন্তক্ষণে। একজন রূপহীনা অন্যজন পরমাসুন্দরী। অনুসন্ধানের পর জানলুম যুবতীটি দেবদাসী। মন্দিরে মন্দিরে ওর ঠাঁই। পরিধানে গৈরিক বাস। আলুথালু তৈলহীন কেশপাশ। ভাবালু চোখের চাহনি। দেবদাসীদের কথা শুনেছি। কিন্তু দেখিনি কখনও কোন দেবদাসীকে। তাই এই যুবতীর ওই ভাবস্তব্ধ আঁখিতারা দুটো দেখে কী যেন একটা বেদনার আমেজে দুলে উঠল মনটা। সিগারেট, চকোলেট, বিস্কুট দিয়ে আমরা ওদের খুশী করলুম। ওরা ভেঁপু বাজাতে শুরু করল। আর মেয়েটি মধুর সুরে গান ধরল। কৃষ্ণবিরহের গান। শোনবার মত। গাইতে গাইতে মেয়েটির চোখ এক সময় অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বৃদ্ধাটি সস্নেহে তার পিঠে হাত বোলাতে লাগল।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি এমন সময় মেয়েটা প্রকৃতিস্থ হয়ে আমাদের কাছে আর-একটা সিগারেট চাইল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম আমরা।

গাম্বু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সকলেই কিছু-না-কিছু করছে। ওর এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু করা হয়নি। তাই ও অভিনব কায়দায় সকলের মাঝখানে এসে ওর নতুন ট্রানজিস্টর সেটটি খুলে ধরল। নবাগতরা মুগ্ধ হল। গাম্বুরও বাহাদুরি কেনার ইচ্ছেটা সার্থক হল।

সানকোশী নদীর বালুকাময় তট ছেড়ে এগিয়ে চলেছি আমরা দূরে কঠিন অসমতল পথে। এ পর্যন্ত পাহাড়ের ছ হাজার ফুট উচ্চতা অতিক্রম করেছি। পথ তাই ক্রমে দুর্গম হয়ে উঠছে। গতিও আমাদের ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে পাইন ও দেবদারু গাছের ভিড় ক্রমেই যেন কমে আসছে।

সামনেই শেরপা-শেরপানীদের একটা জটলা দেখে পা চালিয়ে এগিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা আর-কিছুই নয়! আমাদের দলে একটা বুড়ো শেরপা আছে। নাম তার শেরবাহাদুর। বাহাদুর বলেই ওকে ডাকে সকলে। লোকটা বিয়ে-পাগলা। সুন্দরী দেখলেই ওর বিয়ে করবার ইচ্ছে প্রবল হয়। ওর এই দুর্বলতার খবর সকলেই রাখে। এই নিয়ে সকলেই ওকে বিদ্রূপ করে। ও-ও তা হাসিমুখে সহ্য করে।

আজ ও লামুর একটা হাত বাগিয়ে ধরেছে। যতই লামু চেষ্টা করছে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার, কিছুতেই পারছে না। তাই ও আর-সব শেরপানীকে চেঁচিয়ে ডেকে ওকে উদ্ধার করতে বলছে। কেউই কিন্তু এগিয়ে আসছে না। ওর অন্তরঙ্গ বান্ধবী লছমী, ঝরাও না। বরং ওরা হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আমি গিয়ে দাঁড়াতেই লামু বলল, 'দেখুন না কিছুতেই হতভাগা আমার হাত ছাড়ছে না। মুখে আগুন বুড়ো মিনসের।'

আর-একবার ও হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করলে।

বাহাদুর ততক্ষণে কাণ্ডজ্ঞান ভুলে ওর মুখটা জোর করে তুলে ধরে কষে একটা চুমু খেয়ে নিয়েছে। হাসির বন্যা ছুটছে পোর্টারদের মধ্যে।

লামু থুথু ফেলতে ফেলতে বলল, 'দূর মুখপোড়া, দূর হ। বুড়ো বয়সে ভীমরতি দেখ না। খেংরে তোর মুখ ভেঙে দোব দাঁড়া।'

মুখ মুছতে লাগল ও।

বাহাদুর এবার আমাকে দেখে লামুর হাত ছেড়ে দিল। অপরাধীর মত বলল, 'লামু আমায় কদিন থেকে বলছে—বিয়ে করবি আমায়? আমি যে তোর প্রেমে পড়েছি রে। না করলে আমি আর বাঁচবো না, তোর বিরহে হয়তো মরেই যাব।'

ওর বাচনভঙ্গীতে হাসি সামলানো দায়। লামুরই দোষ। ওকে বকতে গিয়ে দেখলুম ও উধাও হয়েছে। লক্ষ্য করছি এ অঞ্চলের লোকেরা কৃষি ব্যাপারে ততটা উৎসাহী নয়। কারণ চাষবাসের উপযোগী সমতল ভূভাগ এখানে কোথাও নেই। কর্ষণযোগ্য মাটির এখানে দারুণ অভাব। ধান ও গম চাষ ব্যতিরেকে তাই এখানকার লোকেরা অল্পপরিসর জায়গায় আলুর চাষটাই বেশী করে।

অনেক কষ্টে উঠে এলুম আমরা একটা রীজের ওপর। জায়গাটার অপূর্ব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মনকে মুগ্ধ করে। দূরে ওই দেখা যায় সানকোশী নদীর নির্জন বালুকাময় তট। তারই কোল বেয়ে অস্পষ্ট আমাদের পথ সরীসৃপের মত পড়ে রয়েছে, যা আমরা এইমাত্র পার হয়ে এলুম। আরও দূরে দিগন্তের গা অবধি প্রসারিত ঘন তরুদলের সবুজ আস্তরণ। তার মাঝে আছে শত সহস্র স্মৃতি-জড়ানো ছোট-বড় গ্রাম। পরিচিত কত মানুষ। আমার চেনা-জানা পথঘাট। সামনে অসংখ্য বিরাট বিস্তৃত শৈলমালা। যেখানে পলকমাত্র দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। চিন্তা স্তম্ভিত হয়ে যায়।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর আমরা রীজটার সর্বোচ্চ স্থানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখান থেকে আমাদের গন্তব্য স্থান মণিভঞ্জন গ্রাম বেশী দূরে নয়। কয়েক শো ফুট মাত্র নিচুতে। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

দল থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছি। পড়বারই কথা। পড়ে

যাওয়ার ব্যথাটা এখনও কমেনি। কাউকে বলাও যায় না। একবার হেসে যা উড়িয়ে দিয়েছি তা প্রকাশ করি কোন্ লজ্জার মাথা খেয়ে ?

রাজু একসময় হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, 'খেলা দেখতে চান তো টপ্ করে চলে আসুন।' কিসের খেলা, কোথায় দেখব—কিছুই না বলে ও আগের মত তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করল। আমি ওকে অনুসরণ করে এক গলিপথ ঘুরে একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। দেখলুম এক বুড়ো একটা থলি হাতে হাঁকছে—'ভোজ-বাজির খেলা দেখবে, ভোজবাজির খেলা।'

ভিড় জমে গেছে। আমাকে দেখিয়ে রাজু বাজিকরকে বলল, 'খেলা দেখাও, আচ্ছা খেলা। সাব্ দেখবেন।'

বাজিকর কী যেন সব মন্ত্র আওড়ালো, তারপর আমায় বলল, 'আপনি কী ফল খেতে চান বলুন, সেই ফল আমি আপনাকে থলি থেকে বার করে দোব।'

বললুম, 'আম।'

কারণ, জানি এটা আমের সময় নয়।

কিন্তু আশ্চর্য! থলি থেকে টস্‌টসে একটা পাকা বোম্বাই আম ও টেনে বার করে আনল। দর্শকদেরও ও জিজ্ঞেস করল। তারাও ইচ্ছেমত ফলের নাম করল। আর ও-ও স্বাভাবিকভাবে থলি থেকে একটি একটি করে সকলের পছন্দসই ফল বার করে সাজাতে লাগল। সকলে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। আমিও কম বিস্মিত হইনি। সহসা মনে হল জাদুসম্রাট পি. সি. সরকার কি এদেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তাঁর বিভিন্ন প্রদর্শনী-ভাষণে!

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। আর ভাবাবেগের সময়ও নয় এটা। একটা টাকা দিয়ে চলে আসছিলুম। ও কিন্তু ছাড়ল না। বলল, 'বাঃ রে, দাঁড়ান। ফলগুলো নিয়ে যান, এসব নিয়ে আমি কী করব ?'

করিতকর্মা রাজু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। বাজিকর ফলগুলো থলিতে পুরে জোরে একটা ফুঁ দিল।

বাস্, রাজু অপ্রস্তুতের একশেষ!

থলিটাকে উপুড় করে ঝেড়ে সকলকে দেখাল ও নিজেই। একেবারেই ফাঁক মা-কালী!

এসে গেলুম আমরা মণিভঞ্জন গ্রামে। তাঁবু ফেলে আজকের মত আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলুম চতুর্দিকে রডোডেনড্রন ফুলের সমারোহ। কী অবর্ণনীয় তার শোভা! চোখ জুড়িয়ে যায়। মন ভরে যায়। বাক্‌শক্তি হারিয়ে যায়। শুধু নির্বাক্ নিষ্কম্পের মত চেয়ে থাকতে হয় ভাল-লাগার ঘোর না-কাটা পর্যন্ত। লাখে লাখে ফুটে রয়েছে ফুলগুলো। এলোমেলো, বিক্ষিপ্তভাবে। গাঢ় লাল ওদের গায়ের রঙ। হাওয়ায় তারা দুলছে। যেন তারা কথা কইছে চুপিচুপি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে।

দেখছি। কিন্তু ওর মাঝখানে ও কী!

দূরে একটা ঝোপের কাছে ঝুরা আপনমনে ফুল তুলছে, খোঁপায় গুঁজছে সেগুলো—আর মাঝে মাঝে সাবধানে কটাক্ষ করছে রাজুর দিকে। রাজু কাছেই দাঁড়িয়ে। ঝুরার দিকে চেয়ে ফুলের বদলে পাতা ছিঁড়ছে।

ওদের অজ্ঞাতে চলে আসতে হল তাই তাঁবুতে।

বিকেলবেলা আমরা 'মিউজিক্যাল চেয়ার' খেলায় মাতলুম। ২০টা বাক্স (চেয়ারের অভাবে) বৃত্তাকারে সাজানো হল। খেলোয়াড়রা সব গোল হয়ে দাঁড়াল বাক্সগুলোর পেছনে। রাও আর আমি হলুম বিচারক। দুটো ভেঁপু দুজনের হাতে। খেলা আরম্ভ হবে ভেঁপু বাজালে আর চলতে থাকবে ভেঁপু বাজানো বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। খেলা মানে—গোল হয়ে ঘোরা, একটা বাক্স ছেড়ে আর-একটা বাক্সের পেছনে। সে-ই হবে জয়ী, যে খেলোয়াড় ভেঁপু বন্ধ হওয়া মাত্র একটা

বাক্সকে অধিকার করতে পারবে। খেলোয়াড়দের মধ্যে এখন শ্রেণীবিভাগ কিছু নেই। মেম্বারদের সঙ্গে পোর্টার মেয়েপুরুষরাও রয়েছে বন্ধুর মত একাত্ম হয়ে। বৈষম্যের প্রশ্নই ওঠে না। তাই ছোট-বড় কমপ্লেক্সও নেই এখানে কারও। যারা খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, তারা দর্শক হয়ে বসেছে খেলোয়াড়সুলভ উৎসাহে। সকলে তৈরী হয়ে দাঁড়ালে ভেঁপু বাজানো শুরু হল। একটানা। হুটোপুটি করে ঘুরতে লাগল খেলোয়াড়রা বাক্সগুলোর পেছনে। হঠাৎ থামিয়ে দিলুম ভেঁপু। আর সঙ্গে সঙ্গে সুকৌশলে সকলে বাক্সগুলোকে দখল করতে চেষ্টা করল। চব্বিশ জনের মধ্যে কুড়ি জন বাক্স দখল করল। চার জন বসে পড়ল। এবার তুখানা চেয়ার সরিয়ে নেওয়া হল। আবার ভেঁপু বাজতে শুরু হল। আগের মত ঘুরতে লাগল ওরাও। ভেঁপু বন্ধ হল আর বাক্সও দখল হল আগের মত।

এইভাবে চলতে লাগল খেলা। শেষে তুজন নির্বাচিত হল। সর্বশেষ বাক্সটা যে দখল করল সে হল প্রথম। পঞ্চাশ বছরের বুড়ো। ওর ওপর আমরা পক্ষপাতিত্ব করেছি বেশ কিছুটা বুড়ো বলেই। অল্প-বয়সীদের তা চোখ এড়ায়নি। এতে ওদের রাগ দেখে কে! ওরা যে জিনিসটাকে এতখানি গুরুত্ব দেবে তা আমরা ভাবতেই পারিনি।

সন্ধ্যেবেলা একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। পথে ঝুরাদের সঙ্গে দেখা। ও বান্ধবীদের সঙ্গে একটা খোলা জায়গায় বসে খুব খোসগল্প করছিল— একঝোড়া আলুপোড়া সামনে নিয়ে। তাই থেকে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ওরা একটা একটা করে মুখে পুরছিল। আমি না-দেখার ভান করে এগিয়ে যাচ্ছিলুম।

ঝুরা পেছন থেকে মিষ্টি গলায় ডাকল, 'ডাক্তার সাব্!'

হেসে ফিরে চাইলুম।

ঝুরা লাফাতে লাফাতে কাছে এসে বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

—বেড়াতে। এলুম যখন এদিকে তখন ভেতরটাও একবার দেখে যাই।

—চলুন। আপনাকে দেখিয়ে আনি।

—না, না। তুমি আর কষ্ট করতে যাবে কেন? তুমি যেমন বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করছিলে করগে। আমি ঠিক ঘুরে আসব 'খন।

ও কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়ল না। পিছু পিছু এল। পথে অনেক কথা হল। অনেক কিছু দেখাও গেল। কিন্তু ভুলেও ও রাজুর কথা একবারও তুলল না।

অদম্য কৌতূহল বেজায় রকম আমায় পেয়ে বসল। এক সময় তাই কথা-প্রসঙ্গে বলে ফেললুম, 'রাজুটাকে নিয়ে এলে হত। বেশ চটপটে। খাটতেও যেমন পারে খুব তেমন গুছিয়েও ও বেশ সব ব্যাপারে।'

ঝরা একেবারে যেন খেঁকিয়ে উঠল। জিব উল্টে ও বলল, 'চটপটে, না ছাই! ও-সব ভণ্ডামি। আপনাকে ভাল মানুষ পেয়ে কিছু বাগিয়ে নেওয়ার মতলব।'

বুঝলুম এবার চুপ করে যাওয়াই ভাল। আরম্ভ তো করিয়ে দিয়েছি। এবার ওর গতি ও-ই নিয়ন্ত্রণ করুক। আমার মাঝে মাঝে সায় দিয়ে গেলেই চলবে। জিনিসটা তাতে উপভোগ্য হবে আরও।

চুপ করেই ছিলুম। ও কিন্তু পারল না। মুখ খুলল।

—আর কী বোকা দেখেছেন? কাজ করছিল কালকে একেবারে যেন মাটির সঙ্গে নেবড়ে গিয়ে। মুখ তুলে একবার তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না।

মিষ্টি হাসল ঝরা।

—গাধা, গাধা একেবারে। তা না হলে অমন করবে কেন?

খুশী হয়ে ও উচ্ছ্বসিতভাবে বলল, 'পয়লা নম্বরের ভীতু যে। আমি মেয়েমানুষ, সামনে দাঁড়িয়ে আছি—একেবারে গায়ের কাছে। মরবে না কেঁপে।'

চুপ করে রইলুম। ও কিন্তু থামল না।

—আরে বাবা, আমি বাঘ না ভাল্লুক! পুরুষমানুষের আবার অত ভয় কিসের! দুবেলা দেখা হচ্ছে। একটা কথা কইলে আমি কি আর জবাব দিতুম না!

—সেই তো।

—অ-ব-তা-র যেন। দূর করে দিন না গোমড়ামুখোটাকে। ওর চেয়ে বরং একটা মেজাজী লোক রাখুন, যে সকলের সঙ্গে দুদণ্ড খোলা মনে কথা কইতে পারবে। মুখ বুজে ন্যাকা হয়ে থাকা আমার দু-চক্ষের বিষ।

—ঠিক বলেছ। আমারও যেন কী রকম লাগছিল। দাঁড়াও না, একটা খুঁত ধরে ওকে সরাচ্ছি দু-একদিনের মধ্যে। ডিসপেন্সারিটা কি শোকসভা যে অমন করে গুমোট মেরে থাকতে হবে সারাক্ষণ!

ঝুরার মুখ শুকিয়ে গেল। আমি কিছুই দেখিনি এমন ভাবে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলুম।

ঝুরা যেন অনেক ভেবে-চিন্তে একটা মতলব বাতলেছে, এইভাবে খুব গম্ভীর হয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'সে করলে ও বুঝতে পারবে কিন্তু। আর তাতে ও মনে কষ্টও পেতে পারে, আপনাকে ও বড্ড ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, কী দরকার বলুন না ওকে কষ্ট দিয়ে মিছিমিছি!'

—তাও বটে।

—আমি বলছিলুম কী, জোর করে কিছু না করাই ভাল। ও যেমন আছে তেমন থাক্‌। আমি নিয়মিত এই ভাবে এলে-গেলেই দেখবেন ও ঠিক সটকে পড়বে। আর তাতে কারও কিছু বলবারও থাকবে না।

—হ্যাঁ, সেই-ই ভাল। মিছিমিছি একটা মনোমালিন্যের আমি পক্ষপাতী নই।

ঝুরার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আবার।

১৪ই মার্চ ॥ সোমবার

ভোর না হতে-হতে দেখি পোর্টাররা সব মাল নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা এখুনি রওনা হবে। দেরি হলে বেলা হয়ে যাবে। তাতে হয়তো মুশকিলে পড়তে হবে। কেনাকাটা ঠিকমত হবে না। তখন আপসোসেরও সীমা পরিসীমা থাকবে না।

ওখালডুঙ্গা এখানকার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শহর। মস্ত বড় বাজার আছে ওখানে। দূর দূর গ্রাম থেকে তাই লোক যাবতীয় মাল সওদা করতে যায় ওখানে। পোর্টাররাও আগের মত ওখান থেকে ক'দিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেবে। রসদ কিছু সঞ্চয় করে রাখা ভাল। লোকালয়হীন, অনুন্নতস্থানে সব সময় সব জিনিস পাওয়া নাও যেতে পারে। তাই সময়মত কাজ গুছিয়ে রাখা ভাল। আগের কেনা জিনিসগুলো এ ক'দিনের ব্যবহারে তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু কেনাকাটা করতেই হবে। ওদের কাউকে কাউকে এজন্যে আমাদের কিছু অ্যাডভ্যান্সও করতে হচ্ছে। উপায় কী!

নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে ওদের ছাঙ, মানে—দেশী মদ। ওটা ওদের না হলেই নয়। এক বেলার খাওয়া ওরা ছেড়ে দিতে রাজী, কিন্তু ছাঙকে ছাড়তে ওরা নারাজ। এমনি প্রিয়বস্তু ছাঙ ওদের। মেয়েপুরুষ একসঙ্গেই ওরা ছাঙ খায়। তাতে ওদের বাধে না কিছু। চার টাকা করে ওরা রোজ পারিশ্রমিক পাচ্ছে। আর সেই পারিশ্রমিকের কিছু-না-কিছু অংশ ওরা খরচও করছে প্রতিদিন ওই ছাঙের পেছনে।

আজ ওখালডুঙ্গা হচ্ছে গন্তব্য স্থল। ওখানকার বাজারে এ জিনিসটা নাকি পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে। জিনিসটাও ভাল। সুতরাং ওদের পায় কে?

একবার পৌঁছতে পারলে হয়। জোরে জোরে ওরা পা চালিয়েছে। অমৃত যদি ফুরিয়ে যায়!

ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে পড়লুম। আজও আমরা চলেছি একটা রীজের ওপর দিয়ে। কঠিন পর্বতসংকুল পথ। আঁকা-বাঁকা, এবড়ো-খেবড়ো, শ্রমসাপেক্ষ। তবু চলতে তত কষ্ট হচ্ছে না। বরং ভাল লাগছে।

সকালের আতপ্ত সূর্যকিরণ যেন জননীর স্নেহস্পর্শ বোলাচ্ছে আমাদের গায়। চারিদিকে শুরু হয়ে গেছে জীবনের অভিব্যক্তি, পাখিদের কলকাকলী, মানুষের আনাগোনা, মুখরিত দশ দিক।

পোর্টাররা গান ধরেছে। সেই গান—সেই স্ফূর্তির গান, প্রেরণা-লাভের গান। এ গানটার মধ্যে কোথায় যেন একটা মৌলিকত্ব আছে। যার ছোঁয়া লাগছে আমাদের মনে। অজ্ঞাতে আমরাও বুঝি তাই কেমন যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছি। গান-পাগল জঙ্গলও এক-একবার ওদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দু-এক কলি গেয়ে উঠছে।

পোর্টারদের সঙ্গে ক্রমেই আমাদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠছে। মেম্বারের মর্যাদার প্রশ্ন এখানে ওঠে না। কারণ এই নির্জন আত্মীয়-বর্জিত পরবাসে তার আত্মমাহাত্ম্য উপলব্ধি করার মত চিত্তবৃত্তি এখানে থাকে না। তাই সে বিষয়ে সকলেই আমরা এখন প্রায় উদাসীন।

এভারেস্ট-যাত্রী আমরা সবাই। সহযাত্রীরা সকলেই আমাদের বন্ধু। আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী। ওরাও এ কথা বিশ্বাস করতে শিখছে। তাই ওরাও সময় সময় ওদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা আমাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শোনাচ্ছে—কে কতদিন শেরপার কাজ করছে, কোন্ কোন্ ঘটনা তাদের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। মরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কে কোথায় কেমন করে বেঁচেছে, কারা প্রাণ হারিয়েছে, কোন্ কোন্ অভিযাত্রী দল কী কী তাদের উপহার দিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলো ভাল, কতগুলো ফোটো আজ তাদের সঙ্গে আছে—এমন কত কী। ওরা বলে, অন্যান্য বারের

চেয়ে এবারের যাওয়াতে ওরা আনন্দ পাচ্ছে অনেক বেশী। কারণ এটা ভারতীয় অভিযান। পাশ্চাত্ত্যের দাসত্ব এখানে নেই। স্বজাতির মমত্ব তারা উপলব্ধি করছে পরস্পরের আন্তরিকতায়।

যখন যে গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি তখন সেই গ্রামের লোকেরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। ওরা আসে দল বেঁধে। ছোট বড় নির্বিশেষে। আমাদের আগমনবার্তাটা যেন আগে থেকেই কেউ তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। তাই বোধহয় ওদের এই সমবেত প্রতীক্ষা। কেননা, একটা গ্রামকে পেছনে ফেলে আর-একটা নতুন গ্রামে যখনই আমরা গিয়ে উঠছি তখনই দেখছি আমাদের ঘিরে শত শত নরনারীর ভিড়। ওদের সরল অনাড়ম্বর আপ্যায়ন আমাদের মুগ্ধ করে। তাদের অকৃত্রিম সহজ মিষ্টি কথাবার্তা আমাদের প্রিয়জনদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

কোন কোন গ্রামে আবার স্থানীয় লোকেরা আমাদের প্রচুর জিনিস-পত্তর দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে। যে যা দিচ্ছে সানন্দে আমরা তা গ্রহণ করছি। আর গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করি কেমন করে? কেউ দিচ্ছে মিষ্টান্ন, কেউ দিচ্ছে ছাঙ, আবার কেউ দিচ্ছে ডিম মুরগী দুধ। উপহার যারা দিচ্ছে তারা প্রতিদানের প্রত্যাশা করে না। কিন্তু আমরাই বা কিছু না-দিয়ে ছাড়ি কী করে? তাই যারা কিছুই নিতে চায় না তাদের কাকুতি মিনতি করেও কিছু-না-কিছু গছাচ্ছি—কোন সময় সিগারেট টফি বিস্কুট, আবার কোন সময় এক কাপ চা অথবা কফি, দু-এক টুকরো আখরোট, বাদাম—কী বড় জোর দু-একটা টাকা। এছাড়া আর সঙ্গে আমাদের কী-ই বা আছে? হাসিমুখে এমনি করেই আমরা আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে আসছি পরস্পারের সঙ্গে।

বেলা বাড়ছে। রোদ্দুরটাও তাই ক্রমে কড়া লাগছে। দ্রুত-পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি সম্মুখ পানে। আমাদের গন্তব্যে। উঁচু এই রীজটা থেকে নীচের ছোট ছোট গ্রামগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দর ছবির মত।

এতটা বোধ হয় সেও বুঝতে পারেনি। তাই বোধ হয় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে।

ব্যাপারটা যা ঘটেছে সবই তার বাবাকে নিয়ে। সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে তার বাপের সঙ্গে বচসা হয় নাণ্টু নামক এই আহত লোকটির। আর এই নাণ্টুই প্রথমে মাথা গরম করে অশ্লীল ভাষায় তার বাপকে গালাগাল দেয়।

ছেলেটি শান্ত হয়েই ছিল সারাক্ষণ। হঠাৎ কী যেন এক উত্তেজনায় ক্ষেপে গিয়ে ও একটা পাথর ছুঁড়ে ওকে মারে। ছেলেটার প্রকৃতি কিন্তু অমন নয়। পোর্টাররা অনেকেই ওকে চেনে, শান্ত ধীর পরোপকারী সে বরাবর। সকলেরই স্নেহের পাত্র। কিন্তু তবু আকস্মিকভাবে ও অমন করে ফেলল!

মানুষ অবস্থার দাস—অনেক পরিমাণে একথা সত্য। তাই মতি-গতির সংযমসাধনা সাধারণ্যে দুর্লভ। এ আমাদের রোজকার অভিজ্ঞতা।

পুলিসেই ওকে দেওয়া হত। কিন্তু ওখালডুঙ্গা এসে এই নাণ্টুই বাদ সাধল। জ্ঞান হওয়া মাত্র সেই যে ও বুলি ধরল,—'সাব্, ওকে পুলিসে দেবেন না, ওর কোন দোষ নেই। ও আমার ছেলের মত। ও এখান থেকে চলে গেলে আমি আর বাঁচব না।'

অন্য কথা না-পাওয়া পর্যন্ত ও আর-কিছুতেই থামল না। রুগীকে বাঁচাতে গিয়ে আজকের জন্যে বাধ্য হয়েই আমাদের রোগকে জিইয়ে রাখতে হল।

এখানে এসে এই প্রথম আমরা দেখলুম বৌদ্ধমঠ। ইতিমধ্যে আর-কোন মঠ আমাদের চোখে পড়েনি। এখান থেকেই বোধ হয় শুরু হল বৌদ্ধ প্রভাব। এর আগে চোখে পড়েছে ছোটখাটো বিস্তর দেবালয়।

কোথাও শিবমূর্তি, কোথাও বিষ্ণুমূর্তি, আবার কোথাও বা রাম-সীতার মূর্তি। হিন্দুধর্মের প্রতিপত্তির স্বাক্ষর এগুলোই বহন করে এসেছে এযাবৎ।

ফেলে-আসা পথে পথে কতবার শুনেছি উদাসী কত-প্রহরের-নির্জনে-ভেসে-আসা মঙ্গলানুষ্ঠানের গম্ভীর ধ্বনি—ভক্তপ্রাণের সন্ধ্যারতির সুর।

মন ছুটে পালিয়েছে, আমাদের সেই ছোট্ট ঘুঘু-ডাকা ছায়া-ঘেরা গ্রামখানিতে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে। যেখানে আছে আমার প্রিয় ঠাকুর শ্যামসুন্দরের মন্দির। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যে যেখান থেকে শুনতে পেতুম ভক্তবৃন্দের মধুর স্তোত্রপাঠ, আরাধ্যের নামকীর্তন।

ভেবেছিলুম সারা নেপালেই বুঝি রয়েছে হিন্দুধর্মের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি। এ পর্যন্ত যা দেখেছি তাতে এ ধারণা হওয়া নিতান্ত অমূলকও নয়। কিন্তু সে ধারণায় এই প্রথম আমাদের সন্দেহের উদ্রেক হল। গৃহসজ্জায়, নানা প্রতিষ্ঠানে—সর্বত্র হিন্দু দেবদেবীর নাম শ্লোক ছবি বদ্ধমূল করেছিল আমাদের পূর্বধারণাকে।

এখন ভুল ভাঙল।

কিছুদিন আগে বোধ হয় এখানে দোল-পূর্ণিমার উৎসব হয়ে গেছে। তারই লুপ্তপ্রায় চিহ্ন এখনও কিছু কিছু ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। রাস্তাঘাটে, বড় বড় বাড়ির গায়ে, স্থানীয় লোকদের জামা-কাপড়ে, গায়ে-মাথায়। রঙের দাগ, না হয় আবীরের গুঁড়ো। এখনও গত অনুষ্ঠানের টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে চর্বিতচর্বণ হচ্ছে। হাসিখুশিতে ভরা যুবক-যুবতীরা হৈ-চৈ করছে।

একলাটি একপাশে দাঁড়িয়ে যতই দেখছি এদের, ততই ভাল লাগছে। রঙ মেখে কেমন সঙ সেজেছে সকলে!

এমনিতে রঙ মাখতে আমি চিরকালই নারাজ। অথচ প্রতি বছরই শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রঙ আমাকে মাখতে হয় কোন-না-কোন কারণে। এই তো গত বছরের কথা। কিছুতেই রঙ চঙ মেখে ভূত সাজব না স্থির করেছিলুম।

সকলকে বলেও দিয়েছিলুম। বন্ধুবান্ধবদের, বউদিদের, ভাইপো-

দোকানে। নানা রঙের কাপড়-জামা ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সাজানো রয়েছে কাপড়ের দোকানগুলোর সামনে। পোর্টাররা সব টানাটানি লাগিয়েছে ওগুলো নিয়ে।

এইটাই দোকানদারদের মোকা। এক দিনে দোকানগুলো খালি হয়ে যাবে। তাই সকলকেই সন্তুষ্ট করতে ওরা খুব ব্যস্ত। মুদিখানার দোকান, স্টেশনারি দোকান, ছাঙের দোকানগুলোতেও অনুরূপ ভিড়—দরদস্তুর চলছে সমানে।

এখানকার লোকবসতি বেশ ঘন। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। অধিকাংশ ঘর-বাড়ি সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরী। দোতলা, এমন কী তেতলা বাড়ির সংখ্যাও এখানে নগণ্য নয়। বাড়ির সুসজ্জিত আসবাবপত্রও কিছু কিছু নজরে পড়ে। খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে।

সব জড়িয়ে শহরটির মধ্যে একটা পরিমার্জিত রূপ ফুটে রয়েছে সর্বত্র যা একনজরে সবারই চোখে পড়ে। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে তাই এই ছবির মত শান্ত, সমাহিত শহরটির দিকে। জাঁকজমকের উপযুক্ত উপকরণের অভাব নেই কোনখানে, কিন্তু আতিশয্যও নেই কোথাও।

শৃঙ্খলা আর সুরুচি যেন ছড়িয়ে রয়েছে এখানকার ধুলোমাটিতে।

এটা জেলা-শহর। তাই সরকারী কাজে এর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। এখানে থাকেন 'বড়-হাকিম'। তাঁর অধীনে রয়েছে এখানকার পুলিস হেড-কোয়ার্টার। সরকারী শাসনকার্যের যা কিছু কর্তৃত্ব তাঁর। প্রত্যেক জেলাতেই একজন করে হাকিম আছেন। কিন্তু 'বড়-হাকিম' সবার বড়। দুটো জেলার শাসন পরিচালনা তাঁকেই করতে হয়। বর্তমানে বড়-হাকিম থেকে আরম্ভ করে এখানকার সমস্ত সরকারী কর্মচারী খুবই ব্যস্ত। কারণ স্বরাষ্ট্র-বিভাগের ডেপুটি মন্ত্রী সারা জেলাটা পরিদর্শন করতে আসছেন দু-একদিনের মধ্যেই।

শুনে খুশী হলুম, ভারতীয় জরিপ-বিভাগের কিছু সংখ্যক কর্মচারী কিছুকাল যাবৎ এখানে কাজ করছেন। তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে

আমার দেখা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ডিস্‌পেন্‌সারিতে অত্যধিক রুগীর ভিড়ে শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি।

- তখন নিষুতি রাত। হঠাৎ কার যেন এক কাতর গোঙানির শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল।

ভাল করে আর-একবার শোনবার চেষ্টা করলুম।

কিন্তু কই! আর-কিছুই তো শুনতে পেলুম না! মনের ভুল বোধ হয়। ঘুমোবার চেষ্টা করলুম তাই আবার। ঘুমও তো ছাই আর আসে না। অনেকক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করে শেষে বিরক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

নিস্তব্ধ নিঝুম চারিদিক। কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। অনন্ত এক প্রশান্তির মাঝে কোথায় যেন সব হারিয়ে গেছে! সামনে বিরাট বিস্তৃত গিরিপ্রান্তর। কী তার মহিমময় রূপ!

বহুদূরে হিমালয়ের ছোট বড় অগণ্য শৃঙ্গ। দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে প্রহরায় রত। নীরব নির্বাক্‌।

কোন্‌ মহাশক্তির কঠোর নির্দেশনায় ওরা যেন অকপট বাধ্যতায় নিযুক্ত হয়ে আছে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে—যুগ যুগ ধরে।

শ্যামল বনরাজি রাতের অন্ধকারে কালো আচ্ছাদনের মত ছড়িয়ে রয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায়। মধ্যাকাশে একফালি চাঁদ। তাকে বন্দনা জানাচ্ছে অগুন্‌তি তারার জোনাকি। তার স্নিগ্ধ নরম অস্পষ্ট আলোয় প্রকৃতি যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

মন্দমধুর ঠাণ্ডা বাতাস। জননীর স্নেহস্পর্শের মত তার এক একটি তরঙ্গে যেন আবেশ লাগছে সারা দেহ ও মনে। অনেকটা নেশা লাগার মত। কেমন যেন আচ্ছন্নতা আসছে। মনটা যেন লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কোথায় কোন কল্পলোকে ছুটে পালাচ্ছে, তার কোন হদিশই পাচ্ছি না এই মুহূর্তে।

সামনের বনকুঞ্জ থেকে ভেসে আসছে নাম-না-জানা বনফুলের সুমিষ্ট গন্ধ। দূরে দিক্‌চক্রবালে ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত মেঘমালা।

গুঁড়ো। সবশেষে পায়ে দড়ি বেঁধে ওকে ফেলে দিয়ে আসে শত্রুপক্ষের ঘাঁটির কাছে। মেয়েটি এই সুযোগে পালিয়ে যায়। তারপর অনেক চেষ্টা করে বাঁচিয়ে তোলে ওকে। সেই থেকেই ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

মেয়েটি আর কেউ নয়। এই হতভাগী—লছমীকে দেখিয়ে লামু বলল। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ও নানাভাবে টাকা রোজগার করে সেবা করে এসেছে ওর ওই মুমূর্ষু স্বামীর।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলুম।

সাধারণী, তবু কত মহিয়সী এই লছমী!

কিছুক্ষণ পরে লছমীকে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললুম, 'তুমি বাড়ি চলে যাও। কত টাকা তোমার দরকার বল। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

ও ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। ধরা-ধরা গলায় ও তাই উদাসভাবে বলল, 'কী হবে বাবু পয়সায়? যার জন্যে দরকার ছিল সে আর নেই। সেদিন বাড়ি গিয়ে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু আসা-যাওয়াতেই আমার আনন্দ। বাড়ির একঘেয়েমিটা অন্তত থাকে না। সেখানে তার স্মৃতি—শুধুই স্মৃতি। মুহূর্তের জন্যে কি তাকে ভুলতে পারা যায়! আবার কবে কত দিন বাদে আপনারা আসবেন সেই আশাতেই আমায় পথ চেয়ে থাকতে হবে।'

চলে এলুম তাঁবুতে। লছমীর স্বামী ওকে প্রাণে বাঁচিয়েছে নিজের জীবন বিপন্ন করে। ও ছিল তখন সম্পূর্ণ অপরিচিতা। আর লছমী ওর সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে ওকে ভালবেসেছে। বিজাতি হয়েও ভগবান সাক্ষী করে ওই পঙ্গুকে বিয়ে করেছে—শুধু উপকারের কথা স্মরণ করে নিজের অকৃত্রিম সেবা দিয়ে ওকে সারিয়ে তুলতে চেয়েছে।

১৫ই মার্চ ॥ মঙ্গলবার

অনেক সকালে আমরা উঠে পড়েছি। তখন বোধ হয় পাঁচটা হবে। বেশ শীত লাগছে। ডাউন জ্যাকেট সকলে পরে নিয়েছি। এই প্রথম আমরা জ্যাকেট ব্যবহার করছি। কারণ এর আগে এমন শীত অনুভব করিনি।

দানামগিয়াল এখন একেবারে সুস্থ। বেশ কয়েক পাউণ্ড ওজনও বেড়েছে ওর। সদাহাস্যময় শান্তপ্রকৃতির এই মানুষটা সকলেরই প্রিয়—এ কথা নতুন করে জানাবার দরকার নেই। রাজু কিংবা ঝুরা ঠিকমত ডিস্‌পেন্‌সারিতে উপস্থিত হতে না পারলে ওই আমায় সাহায্য করে সর্বতোভাবে।

সকালে উঠেই দেখি ও ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে রুগীদের ড্রেসিং করতে শুরু করে দিয়েছে। আর অন্য রুগীরা দল বেঁধে ওখানে বসে আছে। যত তুচ্ছ ওষুধই হোক না কেন, ডাক্তার ছাড়া অপর কেউ খাবার ওষুধ দেবে এটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তাই খাবার ওষুধ কেউ আমায় না-দেখিয়ে দিতে কিংবা নিতে সাহস পায় না। এতে আমার পরিশ্রম বাড়ে বটে, কিন্তু উপায় কী। রুগীর ভিড়ের চাপে এখন দুবেলাই ডিস্‌পেন্‌সারি খুলতে হয়।

কী আর করা যায়!

বেচারারা খবর পেয়ে কতদূর থেকে কত আশা নিয়ে আসছে। ওদের কি না-দেখে পারা যায়! ওরা একটু ওষুধ পেলে কত খুশী যে হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তার ওপর যদি আবার ইন্‌জেকশন পায় তা হলে তো কথাই নেই। ওষুধও ওদের শরীরে কাজ করে ঠিক ম্যাজিকের মত।

আজকের রুগীদের মধ্যে তেমন মারাত্মক রোগ নিয়ে কেউই আসেনি। একটু জ্বর সর্দি কাশি। না হয় পেটের অসুখ, বাতের বেদনা, মাথার যন্ত্রণা।

নাণ্টু ভাল আছে। সারারাত ও অকাতরে ঘুমিয়েছে। শরীরে ওর কোথাও কোন গলদ নেই শুধু একটু-আধটু দুর্বলতা ছাড়া। হার্টটা তবু ওর ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলুম। নিশ্চিন্ত হলুম সেটার স্বাভাবিক অবস্থা দেখে। সেই ছেলেটা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ওর বাবার পাশে। কাল সমস্তদিন ও নাণ্টুর পাশে থেকে শুশ্রূষা করেছে।

আজ ও ক্লান্ত। অপরাধীর মত ও চেয়ে আছে আমাদের দিকে। শেরপারা বোধ হয় আমাদের খুশী করবার জন্যেই ওদের দুজনের একটা শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে। তাই আমাদের শুনিয়েই ওদের কর্তারা গম্ভীর হয়ে বাপ ও ছেলেকে বলল, 'ও সেরে না ওঠা পর্যন্ত তোমরা দুজনে নিজেদের বোঝার সঙ্গে ওর বোঝাটাও বইবে। যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না।'

নাণ্টু চিৎকার করে বলল, 'সেই ভাল। ওদের এ যাত্রায় মাপ করে দিন সাব্, নইলে—'

উঠে বসতে যাচ্ছিল ও। তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে শুইয়ে দিলুম, উত্তেজনায় অন্য বিপদ দেখা দিতে পারে এক্ষুণি। মেনে নিতে হল তাই এক্ষেত্রে ওদের সিদ্ধান্ত।

আজকাল এই ভোরের চিকিৎসা শুরু করায় তেমন সকাল সকাল আর আমার মার্চ করা ভাগ্যে হয়ে উঠছে না। গাম্বু, রাও—এরা আগেই বেরিয়ে পড়ে। দানাম আর জঙ্গল কিন্তু কোনদিন আমায় ছেড়ে যায় না। জানি একটু দেরিতে বেরুলে রোদে কষ্ট পেতে হবে —কিন্তু হাসিমুখে সে কষ্ট ওরা আমার সঙ্গে ভাগ করে নেয়।

বেরুতে আজ একটু দেরিই হল। উপায় কী? তবে সেজন্যে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। আজকের পথ খুব অল্পই। মাত্র সাত-আট মাইলের। জঙ্গল আগে আর আমি পেছনে চলেছি।

চড়াই পথ। একটানা সোজা।

আকাশে কালো মেঘেরা ষড়যন্ত্র করছে একজোট হয়ে। শিগ্‌গির

বোধ হয় বৃষ্টি হবে। ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। হাওয়াটাও বেশ জোরে বইছে।

আবহাওয়াটা সুবিধের নয়। বৃষ্টির আগে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারলে সৌভাগ্যই বলতে হবে। উঠছি দ্রুতপদে চড়াই ঠেলে।

পেছনের দলে এসে আমি বেশ মজায় আছি। অগাধ স্বাধীনতা। কেউ বলবার নেই। না লীডার, না ডেপুটি লীডার। জঙ্গলই এখন লীডার, আর আমি ওর পরামর্শদাতা। সুতরাং রোজই আমাদের ফিস্ট, নতুন নতুন খাওয়ার মহড়া। আর জঙ্গলের কথাই তো হচ্ছে 'খাও, শুধু খেয়ে যাও ; ভরপুর যত ইচ্ছে চালিয়ে যাও।'

আমাদের এদলের খাওয়ার তালিকা শুনলে অনেকের হয়তো আজই এভারেস্ট যাওয়ার বাসনা জাগবে।

কারণ, জঙ্গলকে তাতিয়ে দিয়েছি—'দেখ জঙ্গল, এই হচ্ছে সময়। খেয়ে দেয়ে মজবুত হয়ে নাও। ওপরে যখন গিয়ে পৌঁছবে তখন খাওয়ার আর আগ্রহ থাকবে না, রুচিও থাকবে না। তাই শক্তি-সঞ্চয়ের জন্যে এ সুযোগটা হেলায় হারিও না। পরে অনুশোচনা করতে হবে তা হলে।'

বাস্, আর যায় কোথায়।

খাও, খাও সব সময় মুরগী, ডিম ; খাও লিভার ব্রেন ; খাও দুনিয়ার যা কিছু সব ভাল ভাল খাবার। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনারে মুরগী প্রত্যেকদিন থাকবেই। বানাও কোর্মা, কোপ্তা, কালিয়া—একেবারে ঢালাও অর্ডার।

রাও খাঁটি নিরামিষভোজী। তাকে পর্যন্ত মুরগীভোজী করে ছেড়েছে এই জঙ্গল শুধু লেকচারের জোরে। অতিভোজনের জন্যে আজকাল অনেকের পেটের গণ্ডগোল দেখা দেয়—কিন্তু উপায় কী? নিস্তার নেই জঙ্গলের হাতে। পেট ঠেসে সকলকেই খেতে হবে। তাতে মরতে হয়, মর, ক্ষতি নেই। মহাপ্রস্থানের পথে চলেছ। স্বর্গলাভ তো নির্ঘাত হবেই। অতএব মাভৈঃ।

জঙ্গল সব সময়ই হাসিখুশী। সব সময় কিছু-না-কিছুতে মশগুল। তামাশা-ইয়ারকি মেম্বারদের সঙ্গে, শেরপা-শেরপানীদের সঙ্গে। এমনকি, স্থানীয় লোকদের সঙ্গে পর্যন্ত। ও গুর্খা অফিসার। তাই স্বজাতির আদবকায়দা ওর ভালভাবেই জানা আছে। তাই ওর মেলামেশায় সহজ স্বাভাবিক ভাবটা সব সময়ই সুপ্রকাশ।

ওর আরও একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ও অত্যন্ত হাল্কাপ্রকৃতির। কোন কিছুই ও সিরিয়সলি নিতে পারে না! অতিভোজনে হয়তো ওর পেট ছেড়ে দিল, ও ঠিক তাক করে নিরিবিলিতে এসে আমায় ধরবে—দাজু, দোহাই তোমার, যত পার ইঞ্জেকশন দাও; কিন্তু ওই মুরগী খাওয়াটা আমার বন্ধ করো না। মরে যাব ভাই তা হলে আক্ষেপে।

ওর এই হাল্কাপ্রকৃতির আরও একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ও যখন যে গ্রাম দিয়ে যাবে সেই গ্রামের লোকদের ও সুযোগ বুঝে জানিয়ে দেবে আগের দলে যে লীডার গেছেন তাঁর চাইতে ও মর্যাদায় অনেক বড়। কেননা, তাঁর দলে আছে তিন শো জন পোর্টার, আর ওর দলে আছে তিনশো পঞ্চাশ জন।

উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সে দলের নেতাকে তারা যতটা খাতির করেছে তার চেয়েও ওকে যেন খাতিরটা আরও বেশী করা হয়। আর হতও তাই। গ্রামের লোকেরাও দেখতুম সরল মনে ওর কথা বিশ্বাস করত আর সম্মানও দেখাত ওকে ঢের বেশী।

আমরা আমাদের এই দলটার নাম দিয়েছি 'জঙ্গল এক্স্‌পিডিশন', এতে জঙ্গলের আমোদ দেখে কে! চিন্তার গভীরতা ওর নেই, তবে প্রাণপ্রাচুর্যের স্বল্পতাও ওর মধ্যে দেখিনি কোনদিন। সর্বদাই ও বড় 'হেলপিং টাইপ', অপরের বিপদে ও জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে পারে।

খাড়াই পথ বেয়ে উঠছি। আর-কিছুটা উঠলেই একেবারে উঁচু জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছব।

সেখান থেকে আবার নামব নীচের দিকে। সবটাই ঢালু পথ, কষ্ট পেতে হবে না আর।

রাজু অদূরে দাঁড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে কী যেন কথা কইছে। কাছে যেতেই ও লোকটাকে দেখিয়ে আমায় বলল, 'এর চিঠিটা পড়ে দিন তো।'

খামখানার ওপর ইংরেজী হরফ ক'টা পড়ে বললুম, 'ভেতরের লেখা তো আমি পড়তে পারব না। তুমি বরং পড়ে দাও।'

ও এই উত্তরটারই প্রতীক্ষা করছিল। খুশী হয়ে ও পড়ে দিল চিঠিখানা। পড়ার শেষে লোকটি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাজুকে বলল, 'এই ক'টি কথা পড়াতে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে গেছি সকাল থেকে। চেনা-শোনা পড়িয়ে লোকও আমাদের গ্রামে তেমন কেউ নেই। বাধ্য হয়েই তাই ছুটতে হচ্ছিল ওখালডুঙ্গায়। যাক্, অনেক পরিশ্রম থেকে বাঁচিয়েছ বাবা। দীর্ঘজীবী হও।' চলে গেল ও।

ভাবলুম,...সামান্য একটা চিঠি পড়াবার জন্যে কী অহেতুক প্রাণ-শক্তির অপচয় না আমরা দেখছি! আমাদের চার পাশের পল্লীগ্রামের মানুষদের সবই তো এই এক দশা। সভ্যতাগর্বী আমরা। কিন্তু এই সব নিকট-আত্মীয়দের শিক্ষার মানদণ্ড দেখলে কি সে গর্বের উঁচু চূড়াটা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে না!

ভাবতে ভাবতে কখন ঢালু পথ বেয়ে অনেকখানি নেমে এসেছি তার ঠিক নেই। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলল, 'বাবু সাব্, ঠহর যাইয়ে।'

প্রথমটা গ্রাহ্যই করিনি। কিন্তু পর পর ক'বার দূর থেকে একই ধরনের ওই অস্পষ্ট আওয়াজটা ভেসে আসাতে বাধ্য হয়েই দাঁড়াতে হল।

কে ও? ঠিক চেনা যাচ্ছে না তো! এত দূর থেকে ছুটে আসছে।

সেই লোকটাই না? একটু আগে যে লোকটা চিঠি পড়ালে?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছি। সেইই।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হল আবার?'

হাঁফাতে হাঁফাতে ও বলল, 'আপকো ব্যাগ সাব্।'

পকেট থেকে ও একটা মনি-ব্যাগ বার করল।

আরে, ওটা যে আমার! কী আশ্চর্য! কখন পড়ে গেছে!

দানামগিয়াল তিরস্কার করে বলল, 'আচ্ছা বে-আক্কেলে তো তুমি!'

জবাব দেবার মুখ নেই।

লোকটা সলজ্জ হেসে ফিরে যাচ্ছিল। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওকে কিছু টাকা বক্‌শিস্ দিতে গেলুম। কিন্তু এখানেও আমার হার হল। ও কিছুতেই টাকা নিল না।

সভ্যজগৎ থেকে অনেক—অনেক দূরে এই পার্বত্যপ্রকৃতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্যরাশির মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে এই কথাটারই হিসেব বার বার করছি—দিল্লি-বোম্বাই-কলকাতাতে তো সব জিনিসই পাওয়া যায়—কিন্তু এই সততাটা? এটাও কি সেখানে সব জিনিসের মতই সুলভ?

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি।

জঙ্গলের ঠেলায় সে ভাব কাটল। জঙ্গল বলল, 'মনিব্যাগ ভুল হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপার কী হে? প্রেমে পড়লে নাকি? খুলেই বল না যাদু, মন কেন এত উচাটন?'

চুপ করে থাকি। ও পীড়াপীড়ি করতেই থাকে।

—'কী আর বলব! কাটা ছাগলের মত ছটফট করছি হে তার বিরহযন্ত্রণায় দিনরাত।'

—'আরে তাই নাকি? তা হলে তো সব শুনতে হয়।'—জঙ্গল ফিস্‌ফিস্ করতে করতে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে।

একটু থমকে যাই ইচ্ছে করে।

—'কী হল! থামলে যে! বস্তুটি কে জানতে পারি?'

—অক্লেশে। তবে বলতে পারবে না কাউকে। তোমার যা মুখ-আল্‌গা স্বভাব। ভয় হয় বলতে।

—না, না। মাইরি বলছি, কামাখ্যার দিব্যি···কাউকে বলব না।'

চক্‌চক্‌ করছে ওর চোখ দুটো। ঘনিষ্ঠ হয়ে এল ও আরও আমার কাছে। আর তর সইছে না ওর।

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তাই বললুম, 'হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া, মাউন্ট এভারেস্ট।'

মুখ ভেঙচে ও চলে গেল আমার কাছ থেকে অনেকখানি তফাতে।

বেলা বারোটায় আমাদের ক্যাম্প পড়ল, থারেতে পৌঁছে। গাম্বু ইতিমধ্যেই আসর জমিয়ে বসেছে। পাঁচজন শেরপা-শেরপানীর জটলার মধ্যে ও ওর ট্রানজিস্টর সেটটি পুরোদমে চালিয়ে দিয়েছে। রাও বেরসিক। ওদের থেকে তাই অনেকখানি দূরে বসে কী যেন গোছগাছে অতিমাত্রায় ব্যস্ত।

নির্ধারিত সময়ে ডিস্‌পেন্‌সারিতে এসে বসলুম।

রাজু, ঝুরা দুজনেই রয়েছে।

কাজ করতে করতে এক সময় রাজু ঝুরাকে আড়াল করে আমায় বলল, 'দেখেছেন, ক'দিন ধরে কী রকম প্যাঁচামুখো হয়ে আছে?'

—হুঁ, ভারি দেমাক।

—শয়তানী একটা, বুঝলেন না।

কাজে চলে গেল ও। ঝুরার দিকে চেয়ে দেখলুম। নিরীহের মত মুখটি বুজে ও কাজ করছে। রাজুকে ও আগের মত জিনিসগুলো এনে দিচ্ছে আর রাজু আনাড়ীর মত জিনিসগুলো হাত পেতে নিচ্ছে।

কী যেন এক দুর্ভেদ্য বাধা ওদের কথা কওয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, যা ওরা দুজনে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অপসারণ করতে পারছে না! তাই অস্বস্তিতে দুজনের ওপরেই দুজনের রাগ পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

তরুণ-তরুণীরা বোধ হয় আবহমান কাল থেকে এই ব্যাধাটির কাছে বেশীর ভাগ সময় হার মেনে ভগ্নোত্তম হয়ে যায়।

সে কথা থাক্। রাজুর কিন্তু সুযোগ মিলল।

হঠাৎ ঝুরার হাত থেকে একটা ইন্‌জেক্‌শনের শিশি পড়ে চুরমার হয়ে গেল। আর তাতে ওর পায়ের একটা আঙুল একটুখানি কেটে গেল। আর যায় কোথা!

রাজু একেবারে লাফিয়ে পড়ল ঝুরার পায়। দু হাত দিয়ে তুলে নিল ওর পাখানা নিজের কোলে, তারপর সযত্নে ও বার করে আনল ভাঙা কাঁচের টুকরোটা। পকেট থেকে সেন্ট-মাখানো রুমালটা বার করে ও মুছিয়ে দিল ঝুরার পায়ের রক্তটুকু। তারপর একরকম ধমক দিয়ে আমায় বলল, 'বসে আছেন কেন চুপ করে? দিন না ওষুধ লাগিয়ে একটু ব্যাণ্ডেজ করে। রক্ত বেরুচ্ছে যে এখনও।'

কিছু বললুম না ওর স্পর্ধিত আচরণে।

ওর এই আশাতীত মুহূর্তটিতে ও যে একটু উত্তেজিত হবে—একটু অস্বাভাবিক হবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

ওকে আমি ক্ষমা করলুম! আর তাই বা কেন?

বরং আরও স্নেহ, আরও দরদ দিয়ে ওর কথামতই আমি কাজ করলুম। পরম তৃপ্তিতে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এক পলকে ঝুরাকেও দেখে নিলুম।

দেখলুম, হেঁটমুখে কেমন একটা ওর পক্ষে অস্বাভাবিক সলজ্জ ভঙ্গিতে রাজুর সেবাটাকে অভূতপূর্ব তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করছে ও!

ব্যাণ্ডেজ বাঁধার শেষে ঝুরা চলে গেল। আমারও কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই ডিস্‌পেন্‌সারি বন্ধ করে দেওয়া হল। রাজু আমার পায়ের কাছটিতে বসে কী যেন বলবার জন্যে উস্‌খুস্ করতে লাগল। ভ্রূক্ষেপ করলুম না আমি সেদিকে।

কিছুক্ষণ একভাবে কাটার পর ও যখন বুঝল আমার তরফ থেকে সাড়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই তখন নিজেই মুখ খুলল—'একটা

কথা কী জানেন ডাক্তার সাব্, এই ইয়েটা খুব কাহিল হয়ে পড়বে। অনেকখানি রক্ত বেরিয়েছে বেচারীর আঙুলটা দিয়ে। মুখটাও তাই কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।' একটুখানি থেমে ও আবার বলল—'তাই বলছিলুম এ—একটুখানি—' ঢোঁক গিলল ও।

—কী একটুখানি ?

—এই মানে—কেটে গেছে তো—একটু যদি হরলিক্‌স—এটুকু বলতেই আরক্ত হয়ে উঠল ওর মুখখানা।

আর-কিছু ওকে বলতে দিলুম না। চট করে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে ওর সংকোচটা দূর করতে একটু রাগতভাবেই বললুম, 'ইস্, রাজু, তুমি এখনও ওকে হরলিক্‌স খাওয়াওনি ? করেছ কী ? নাঃ, তোমাকে দিয়ে দেখছি এখানকার কাজ চলবে না। এতদিন হয়ে গেল তবু তুমি—'

আর বলতে হল না। বাস্, লেগে গেল ও হরলিক্‌স করতে। আসলে কিন্তু ঝুরার কাটাটা এমন কিছু নয় যার জন্যে ওকে হরলিক্‌স খাইয়ে সবল করতে হবে। দুবেলা অমন আঙুল কতজনের কতবার কাটছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ জনের সামান্য কিছু দুর্ঘটনাই যে বিরাট কিছু একটাতে দাঁড়ায় তার দৃষ্টান্তই এখানে প্রত্যক্ষ করছি মাত্র।

রাজুর মুখচোখ আনন্দে ঝলমল করছে। হরলিক্‌স তৈরি করে এক ফাঁকে ও ঝুরাকে ডেকে আনল। তারপর আরক্তমুখে ও গেলাসটা ওর হাতে তুলে দিতে গেল।

ঝুরা কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল।

রাজু অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকাল।

নিজের ব্যক্তিত্বটাকে ঝালিয়ে নেবার এই সুযোগ। এই ভেবে কড়া সুরে ডাকলুম, 'ঝুরা!'

ওতেই কাজ হল। ঝুরা ওটা খেয়ে নিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজুর সঙ্গে ঝুরার এখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে কথাবার্তা হয়নি।

রাজু বোধ হয় কিছুতেই এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করতে চাইছিল না। তাই সম্ভবত ভেতরে ভেতরে ও উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। যা হোক করে কিছু একটা বলতে গিয়ে গমনোন্মুখ ঝরাকে বলে ফেলল, 'ডাক্তার সাব্ আ—আপনাকে ডাকছেন।'

—আ—মাকে? ঝরা সহাস্যমুখে এই প্রথম পূর্ণ দুটি চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল। সেখানে যেন লজ্জারও ইশারা।

আমি ডাকিনি। ডাকবার দরকারও ছিল না। রাজুর দিকে চেয়ে দেখলুম ওর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। অসহায়ের মত ও যেন আমারই কাছে নির্ভর খুঁজছে। ওকে রক্ষা করলুম।

বললুম, 'কালকে আর তোমায় থাকতে হবে না ঝরা। রাজু একলাই সব করবে।' ঝরা ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

রাজু আনন্দে পাছে কিছু-একটা করে বসে সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'যাওতো রাজু একবার, টপ করে ঘর থেকে আমার কোটটা নিয়ে এস। একটু বেরুব ওদের সঙ্গে।'

সন্ধ্যেবেলা চুপি চুপি টেন্টে ঢুকছি। ইচ্ছে আছে গল্পের বইটার বাকী অংশটুকু শেষ করে ফেলব। কিন্তু তা আর হল না।

রাও বোধহয় কোথায় ওৎ পেতেই ছিল।

খপ্ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে বলল, 'উঁহু, পালাচ্ছ কোথায় মানিক? সকাল থেকে তোমায় জপাচ্ছি কি শুধু এই জন্যে? চল। একহাত খেলে আমাদের সকলকে কৃতার্থ করবে চল।'

কী আর করি! অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের সঙ্গে তাস পিটতে যেতে হল। পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে—উপায় কী?

রডোডেন্‌ড্রন গ্রাণ্ডিফ্লোরা (৬০০০-১০০০০ ফুট)

সোনিসিও (৬০০০-১০০০০ ফুট)

১৬ই মার্চ ॥ বুধবার

নান্টু এখন ভাল আছে। কাল স্ট্রেচারে করে ওকে এখানে আনা হয়েছে। শরীরের দুর্বলতা কেটে গেছে। ষাট পাউণ্ডের বোঝা নিতেও এখন ও প্রস্তুত। আমি ওকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছি।

যা হোক, একসময় ওকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আজ আর তেমন রুগীর ভিড় হয়নি। তাই সকাল সকালই বেরিয়ে পড়াটা সম্ভব হল। নান্টুও পায়দল চলেছে আমাদের সকলের সঙ্গে। আর স্ট্রেচারে চাপতে ও একেবারেই নারাজ; আবশ্যকও নেই। তাই ওকে খুশী করতেই যেন ওর কথায় রাজী হয়ে গেছি আমরা। রাত্রে বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। অল্প হলেও মাটিটা এখনও ভিজে-ভিজে। প্রকৃতি তাই আরও রমণীয় হয়ে উঠেছে আমার চোখে। ঘাসের শীষে ছোট ছোট জলবিন্দু। ওগুলো সূর্যালোকে ঝলমল করছে বিচিত্র রঙে।

আকাশ নির্মেঘ। স্বচ্ছ, নীল।

এগিয়ে চলেছি বন্ধুর পথে পথে। অপূর্ব এক অনুভূতিতে ভরে উঠছে আমাদের মন। যেদিকেই চোখ পড়ে সেদিকেই দেখছি রডোডেনড্রনের জঙ্গল। ও গাছগুলোর আকার ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে তা। সেই সঙ্গে ফুলগুলোর রঙও বদলে যাচ্ছে। ক্রমেই যেন গাঢ় লালের ছোপ লাগছে ওদের গায়ে।

ওক, পাইন, দেবদারু নেই এখানে। তাদের বদলে শুধু রডোডেন-ড্রনেরই সমারোহ।

নেওয়ার, ছত্রী, গুর্খাদের সঙ্গে পরিচয় আগেই হয়েছে। এখন চিনছি—তামাং, রাই, লিম্বুদের। শেষোক্তদের মধ্যে তামাংরাই শুধু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

আগেই বলেছি ওখালডুঙ্গার পর থেকে বৌদ্ধপ্রভাব ক্রমেই স্পষ্টতর

হয়ে উঠছে। স্থানে স্থানে চোর্টেন প্রেয়ার-ফ্লাগের আবির্ভাব সে ধারণাকে বদ্ধমূল করছে। এখানে-ওখানে, একটার পর একটা মণিওয়ালও দেখছি। ওগুলো পাথরের ওপরে খোদিত বৌদ্ধপ্রার্থনা, বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ক্যাংগীয়ার ও ট্যানংগীয়ার থেকে সেগুলো উদ্ধৃত।

বৌদ্ধরা মণিওয়ালগুলোর ডান পাশ দিয়ে আবৃত্তি করতে করতে চলেছে: ওঁ মণিপদ্মে ওঁ, ওঁ মণিপদ্মে ওঁ।

জঙ্গলের দরদটা শুধু আমাদের ওপরেই নয়। লছমী, ঝুরা, লামুদের ওপরেও বটে। ওদের ভালমন্দ নিয়েও ও-বেচারীকে মাঝে মাঝে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। লীডার-গিরি করতে হচ্ছে। অবশ্য পরিহাসপরায়ণতা তো আর যাবার নয় ওর। 'স্বভাব যায় না মলে'—কী আর করে? উৎসাহটা কিন্তু ওর একতরফা নয়। ওরাও সুযোগ পেলে টিপ্পনি কাটতে ছাড়ে না। ওর হেঁড়ে গলায় গান শুনলে ওরা তো একেবারে হেসেই খুন। তাই বলে কি গান বন্ধ করে সে কোন সময়?

আবেগ এলে ও উপহাসের পরোয়া করে না।

চলেছি বেশ ঝোঁকের মাথায়।

জঙ্গল এক সময় সরে এসে জিজ্ঞেস করে, 'লছমী লামুরা সব গেল কোথায় বল তো? উবে গেল নাকি? দেখতে পাচ্ছি না তো কোথাও।'

—পাবে কোত্থেকে? উবে যাবার মন্তর জানে যে ওরা। অবিশ্যি সময়মত আবার ঠিক জায়গায় ঠিক মূর্তিতে আবির্ভাবও হবে।

—যাও, তোমার সবতাইতে ইয়ারকি! ভাল লাগে না।

চড়াই পথে চলতে চলতে এক সময় এসে পৌছলুম এক আশ্চর্য সুন্দর উপত্যকায়। এর প্রকৃত রূপবর্ণনা আমার ভাষাজ্ঞানের অতীত।

সামনে বহুদূরবিস্তৃত সবুজের কী অনির্বচনীয় সমারোহ। যেদিকেই দেখি সেদিকেই রয়েছে ছোট ছোট আলুর ক্ষেত। পৃথকভাবে আল

দিয়ে ঘেরা। যেন এক-একটি পৃথক আসন। সন্ত গজিয়ে-ওঠা নধর চারাগুলো হাওয়ায় টলমল করছে।

দূরে—আরও দূরে তুষারধবল অসংখ্য শৃঙ্গমালা। দিনমণির উজ্জ্বল আলোকে ঝিকমিকিয়ে উঠছে ওগুলো। যেন সংখ্যাহীন চুনি-পান্না-হীরের দীপ্তিতে ওরা সুসজ্জিত হয়ে ধরণীর সমস্ত ঐশ্বর্যসম্ভারকে সদর্পে চ্যালেঞ্জ করছে।

আর স্থির থাকা যায় না। হাতের ক্যামেরাটা তুলে ধরলুম। 'ক্লিক্' একটা ক্ষীণ শব্দ। তারপর আবার। ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা। যতক্ষণ না আশ মিটল। শুধু আমিই নয়, আরও অনেকে।

ফোটো তোলার পর্ব শেষ হতে-না-হতে শুরু হয়ে গেল তর্কাতর্কির হুল্লোড়। কোন্‌টি কোন্ শৃঙ্গ? ঠিক কি তাই···? না, কোথাও ভুল হচ্ছে? বোধ হয় এইটেই ঠিক। এই সন্দেহে একজন আর-একজনকে টেক্কা দিচ্ছে। ফলে মিথ্যে হৈ-চৈ-এর একশেষ।

ওরই মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য আমি যা সংগ্রহ করলুম তা হচ্ছে বাম থেকে আরম্ভ করে যথাক্রমে—গৌরীশঙ্কর (২৩৪৪০ ফুট), মুম্বুর (২২৮২৭ ফুট), কারিওলুঙ্গ (২১৯২০ ফুট), কোয়াংডে (২০৩২০ ফুট), এভারেস্ট (২৯০০২ ফুট), টাওয়াচে (২১৩৮৮ ফুট) ও চ্যামল্যাং (২৪০১২ ফুট)।

আশ্চর্য হয়ে শুধু দেখছি।

এত স্পষ্ট এখান থেকে!

ওই এভারেস্ট! পৃথিবীর তুঙ্গতম শৃঙ্গ! আকাশ-ছুঁই-ছুঁই কী বিশালবক্ষ গম্ভীর ধ্যানমূর্তি!

> 'I had a vision of my own
> The treasured dreams of times long past.'

কিন্তু এ তো দেখছি তাকেও ছাপিয়ে গেল। কল্পনাকে হতমান করে গেল বাস্তবের ওই চিরবিস্ময়! আশ্চর্য!

হে নগাধিরাজ! তোমায় নমস্কার। অজান্তে মাথা নত হয়ে আসে শ্রদ্ধায়।

খানিকক্ষণ পরে। মিথ্যে বাগাড়ম্বর শুনতে শুনতে যখন ক্লান্ত হয়ে উঠছি, ঠিক সেই সময় উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা। পেছন ফিরে দেখি, লছমী, লামু, ঝুরারা সব খানিকটা তফাতে বসে আড্ডা জমিয়েছে।

ফুলের অপূর্ব সাজে সেজেছে ওরা। মাথায় ফুলের মুকুট, গলায় ফুলের গয়না। কানের দুপাশে ফুলের ঝুমকো। হাসির এক-একটি তরঙ্গে ওরা চকিত করে তুলছে এখানকার স্বাভাবিক শান্ত পরিবেশটাকে।

খাওয়া সেরে নেবার জন্যে আমরা এখানেই বসে পড়লুম। তরলমতি জঙ্গলের নজর পড়েছে ওদের দিকে। চুপ করে বসে থাকা ওর নিয়মবিরুদ্ধ। ফস্ করে ও তাই ওদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা যে আজ খুব সেজেছ দেখছি। ব্যাপার কী বল তো?'

দুষ্টু লামুর জিবের আক্‌ঢাক্ নেই। কথাটাকে ও যেন লুফে নিয়ে বলল, 'আমাদের যে আজ বিয়ে।'

—সে কী, পাত্র কারা?

—কেন, তোমরা তো রয়েছ।

হাসির তুফান উঠল ওর কথায়। মুগ্ধ হয়ে যাই সময়ে সময়ে ওদের এই সারল্যে। সভ্যজগৎ থেকে অনেক দূরে ওদের বাস। তাই সভ্যদের আদব-কায়দার মাপকাঠি দিয়ে ওদের বিচার হয় না।

পরকে আপন করে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ওদের। হাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে, কথা কয় প্রাণ খুলে। মেশে আপনজনের মত। অথচ স্ত্রীসুলভ লজ্জাও এদের কম নয়। কথায় মারপ্যাঁচ নেই, মেপে কথা বলার বালাই নেই। যখন যা মুখে আসে তা অকপটে বলে ফেলতে ওরা দ্বিধা করে না মোটে। জানি না অন্যে একে প্রগল্‌ভতা বলবেন কি না!

খাবার আগে আমরা ওদের কিছু ভাগ দিতে গেলুম। কিন্তু সে

বড় কঠিন ঠাঁই—কিছুতে নেবে না ওরা। হেসে লুটোপুটি খায়। মুশকিলে পড়তে হল। কিন্তু জঙ্গলও হাল ছাড়বার পাত্র নয়। কায়দা করে ঠিক সে গছাল ওদের লাঞ্চের ভারী একটা অংশ।

যা হোক, এমন করে মিলেমিশে খাওয়া তো সাঙ্গ হল। কিন্তু জল? জল কোথায় পাওয়া যায়? স্টকে যা জল ছিল তা তো ফুরিয়ে গেছে কোন্ সকালে। এইবার কিন্তু ওরা এগিয়ে এল। খুঁজেপেতে একটা নদী থেকে ছুটোপুটি করে ওরা জল নিয়ে এল। পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে বাঁচলুম আমরা।

বুঝলুম ওরা এমনিতে কিছু নিতে চায় না। পরিবর্তে কিছু দিতেও চায়।

আবার চলা শুরু হল।

উপত্যকার পর উপত্যকা পেরিয়ে।

এখানে আর গরু দেখতে পাওয়া যায় না। দেখা যায় শুধু ইয়ক। ইয়ক মানে পার্বত্য গরু—আকারে ছোট। বেশ হৃষ্টপুষ্ট। গায়ে প্রচুর লোম। গৃহপালিত পশু এরা। এদের দুধ থেকে তৈরী হয় পনীর, মাখন, ঘি ও দই। রাস্তায় যেতে যেতে আমরা হামেসাই এদের দুধ ও দই কিনে কিনে খাচ্ছি। খেতেও খুব সুস্বাদু।

ইয়ক শুধু দুধের প্রয়োজনীয়তা মেটায় না, এখানকার অধিবাসীদের অনেক কাজেও আসে। ভূমিকর্ষণ, মালবহন সবই। এদের চামড়া থেকে তৈরী হয় জুতো, মূল্যবান আচ্ছাদন, আরও কত কী! মাংস খাওয়াও হয় স্থানে স্থানে।

এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—আলু। তাই আলুর ব্যবহার সর্ব ব্যাপারে। প্রাত্যহিক জীবন থেকে আরম্ভ করে অতিথি আপ্যায়নে পর্যন্ত আলুই এখানকার লোকেদের একমাত্র সম্বল। চলার পথে কত যে পোর্টার পরিচিত মহল থেকে আলুপোড়া আর নুন দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করছে তার আর হিসেব নেই।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে চাল, ডাল, আটা, ভুট্টা ইত্যাদি। মিলেট থেকে এরা তৈরি করে ছাঙ আর চাল থেকে রক্সী। এ দুটো এদের চাই-ই। সে কথা আগেও বলেছি। যতই আমরা এগিয়ে চলেছি ততই দেখতে পাচ্ছি এ দুটো পদার্থের প্রাধান্য।

এবার আমরা এসে পৌঁছলুম যোলু-খুম্বু জেলায়। এই সেই জায়গা যার কথা আমরা অনেক—অনেকবার শুনেছি ইতিপূর্বে দার্জিলিঙে, শেরপাদের গাল-গল্পে।

সত্যি অপূর্ব! চোখ জুড়িয়ে যায়। মন ভরে যায়।

কাশ্মীরে যাইনি এখনও, সুইজারল্যাণ্ড সে তো আরও দূরের পথ। কিন্তু যোলু-খুম্বুর বিশেষত্ব বর্ণনাতীত।

স্বর্গ বলে কিছু আছে কিনা জানি না, কিন্তু যদি স্বর্গের সৌন্দর্য কেউ হৃদয়ের সবটুকু মাধুর্যকে নিঙড়ে কল্পনায় গেঁথে থাকেন, চলে আসুন তিনি যোলু-খুম্বুতে। দেখবেন সে সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে গেছে এর কাছে। দূরে ওই দেখা যায় উপত্যকাগুলো—সবুজ আচ্ছাদনে ঢাকা যেন স্তরে স্তরে সাজানো। ছবির মত।

যেদিকেই দৃষ্টি যায় সেদিকেই চেরী গাছের মেলা। ফুলে ফুলে ওগুলো অপরূপ সাজে সেজেছে। পাতায় পাতায় ওদের আশ্চর্য রঙ। উপত্যকার গা দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে দূরে, দৃষ্টির অন্তরালে। কে তার খোঁজ রাখে!

আশেপাশে অগণিত কুটীর, কোনটা বা দোতলা, তেতলা পর্যন্ত। সবই কাঠের তৈরী। সুন্দর রঙ-করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমগ্র অঞ্চলটাই সুসজ্জিত, পরিচ্ছন্ন। ওই কুটীরগুলোতে থাকে শেরপারা। আর শতকরা নব্বইজন বাসিন্দাই তো শেরপা। এরা এককালে নাকি এসেছিল তিব্বত থেকে। তখন থেকেই এদের এখানে বাস।

শক্তি সাহস সংযম—কিছুরই এদের অভাব নেই। অভাব শুধু

শারীরিক পরিচ্ছন্নতাবোধের। জলের কোন অকুলান নেই। তবু এদের গায়ে দুপুরু ময়লা।

এখানেই একদিন জন্ম হয়েছিল আজকের বিশ্ববন্দিত এভারেস্ট-জয়ী বীর তেনজিংয়ের। এর অনু-পরমাণুতে তাই যেন শুনতে পাচ্ছি গৌরবের এক অব্যক্ত আনন্দ। যা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভবগ্রাহ্য।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর আমরা এসে পৌঁছলুম গর্মাগ্রামে, গ্রাম ছাড়িয়ে একটু দূরে আমরা ক্যাম্প খাটালুম। থণ্ডু নেই এদলে। দানু আমাদের 'কুক'। নিয়মমত ও আগেই পৌঁছেছিল। অপেক্ষা করতে আর হল না। তাড়াতাড়ি ও আমাদের সামনে চা আর পাকোড়া এনে হাজির করল।

খাচ্ছি, এমন সময় দানামগিয়াল হন্তদন্ত হয়ে এসে আমায় বলল যে, শিগ্‌গির একবার গাঁয়ে যেতে হবে। বিশেষ দরকার।

বুঝলুম রুগী দেখতে হবে।

ডাক্তার হওয়ার ঝামেলাটা বুঝুন।

বেরিয়ে পড়লুম। রাজুও সঙ্গ নিল। সকালে ও কোথায় ছিল কে জানে! জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে গেল না। চলতে লাগলুম মুখ বুজে।

ষোলু-খুম্বুর ভৌগোলিক অবস্থান নানা দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ব্রিগেডিয়ার বলেন—

"If road or air communication to Solu district could be improved, the area could be developed into an excellent hill resort. We also felt that Solu would make a very good place for skiing if there was enough snow in the winter."

ষোলুকে দেখতে দেখতে চলেছি। মুখ বুজে। দুচোখ খুলে।

গন্তব্যে পৌঁছলুম।

সদর-দরজার কাছে গৃহকর্তা দাঁড়িয়েছিলেন। দেখামাত্র এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। অতি বিনয়ের সঙ্গে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সবচেয়ে ভাল দুষ্প্রাপ্য ছাঙ দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা

করলেন। সেই সঙ্গে এল গরম গরম আলুর দম আর ডিমসেদ্ধ। গৃহকর্ত্রী স্বহস্তে সেগুলো আমাদের পরিবেষণ করলেন।

খাবার ঠিক ইচ্ছে ছিল না। অথচ প্রত্যাখ্যানও করা যায় না। তাই কিছু কিছু খেতে হল।

এখানকার প্রত্যেক বাড়িতেই ফায়ার প্লেস রয়েছে। গণ্যমান্য অতিথিদের এরা বসায় ঠিক তার পাশেই। আমি গণ্যমান্য কি না জানি না, তবে আমাকেও এরা সেই মত বসাল। একটা টুলের ওপর টিবেটান কার্পেট পেতে।

রুগীকে আনা হল এর পর। বৃদ্ধ, বয়স যাটের ওপর। চোখটা একেবারে হলদে হয়ে গেছে। পরীক্ষা করে মনে হল লিভার ক্যানসারে ভুগছে। অনেক দিনের রোগ। সংকট অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

অপ্রিয় সত্যটা বলতে তাই মন চাইছিল না। কারণ ওদের ধারণা ডাক্তার যখন এসেছে রোগের একটা কিনারা হবেই। তাই ঘুরিয়ে বলতে হল—বিশেষ কিছু করা যাবে না এ যাত্রায়। সারবে —তবে অনেক সময় লাগবে। যন্ত্রণা উপশমের জন্যে আর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে সাধারণ পর্যায়ের চিকিৎসা করে ওষুধ দিয়ে পা বাড়ালুম তাঁবুর দিকে।

ফিরে এসে দেখি রুগীর খুব ভিড় হয়েছে। রাজু লেগে গেল সঙ্গে সঙ্গে ডিস্‌পেন্‌সারি গোছাতে। আমিও তাড়াতাড়ি লেগে গেলুম ওদের বিদায় করতে। কঠিন রোগ কারও ছিল না—এই বাঁচোয়া। তাই অল্পেতেই মিটল।

জঙ্গলের সঙ্গে হৃদ্যতাটা ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে। ও আজ আমায় ধরেছে ওর সঙ্গে যেতে। মুরগী কিনতে। যেতেই হল। নইলে রক্ষে নেই। লেগে থাকবে ও সারাক্ষণ।

এখানকার নিয়মকানুন সব ওর জানা। একটা বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। গৃহকর্তাকে সামনে পেয়েও গৃহকর্ত্রীকে ডেকে দিতে

বলল। কর্ত্রী এলে তার সঙ্গে দরদস্তুর করে ও একটা মুরগী কিনল। একাধিক মুরগী থাকা সত্ত্বেও দুটির কথা পর্যন্ত উল্লেখ করল না।

আশ্চর্য লাগল! গৃহকর্তার উপস্থিতিতেও ও কর্ত্রীকে ডেকে দিতে বলল কেন? আর একাধিক মুরগীর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও একটাই বা কিনল কেন? কিছুতেই দমন করতে পারলুম না কৌতূহল। এক ফাঁকে কারণটা জিজ্ঞেস করে বসলুম।

হাসতে হাসতে ও বলল, 'এখানকার এই-ই নিয়ম। গৃহকর্তার কোন হাতই নেই মুরগী কিংবা ওই জাতীয় কোন জিনিস বিক্রি করাতে। গিন্নীরা ওইগুলোকে পালন করেন। ন্যায্যত তাই ওগুলো ওঁদের সম্পত্তি। ছাগল-গরু-মেষের বেলা কিন্তু নিয়ম আলাদা। তাদের খবরদারি করেন কর্তারা। আর একটা কি খুব জোর দুটোর বেশী মুরগী একটা বাড়ি থেকে কেনবার উপায়ই নেই, কেননা বাকীগুলো দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত। বিশেষ কোন কারণ না ঘটলে মোড়লের অনুমতি ছাড়া ওগুলোতে হাত দেওয়াও অপরাধ। খাবার একান্ত ইচ্ছা থাকলে তাঁর অনুমতি নিয়ে দু-একটি ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিবর্তে তাঁকে ভোগ দিতে হয় সর্বপ্রথমে।'

বিধি-নিষেধ, আচার-বিচারের বাধ্যবাধকতা এখানেও দেখছি কম নয়। মোড়লের একনায়কত্ব এখানেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়। এখানেও বর্ণবৈষম্যের বেড়াজাল আছে। আছে অস্পৃশ্যতার কাঁটা তার। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে এখানেও তাঁতি-জেলে-কর্মকারের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এক শ্রেণী আর-এক শ্রেণীর সঙ্গে পাশা-পাশি আসতে বসতে পর্যন্ত দ্বিধা করে। ঠিক যেমনটি দেখেছি আমার গ্রামে, আমার সমগ্র দেশে, আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে।

১৭ই মার্চ ॥ বৃহস্পতিবার

খুব ভোর থেকেই দেখি পোর্টারদের মধ্যে একেবারে সোরগোল পড়ে গেছে। ওরা আর একটুও দাঁড়াবে না। এখুনি যাত্রা করবে। ওদের রসদ গেছে ফুরিয়ে। সামনেই দপুঁ গ্রাম।

ওখানে আছে মস্ত বড় বাজার। ওখান থেকে ওরা কেনাকাটা করে নেবে। চাল, ডাল, আটা, ছাতু—সবই। ওদের উদ্বিগ্ন হবার প্রধান কারণ গতকাল প্রথম দল চলে গেছে দপুঁ হয়ে। রেখে গেছে কি আর অবশিষ্ট কিছু !

কিছু না পেলেই বিপদ। উপোসে মরতে হবে সব্বাইকে। অনুমতি নিয়ে হৈ-চৈ করে ওরা যাত্রা করল। ঠিক একখানা ট্রেনের মত—লাইন ক্লিয়ার পেয়ে গুম্ গুম্ শব্দ তুলে প্লাটফর্ম কাঁপিয়ে মুহূর্তে অন্তর্ধান হওয়ার মত।

আমাদেরও আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন দেখি না। এক সময় তাই আমরাও বেরিয়ে পড়লুম।

সূর্য সবেমাত্র উঠছে। গাঢ় লাল তার রঙ। উত্তাপহীন এখন তার আলো। সেই আলোতে যেন আবীর মেখেছে ওপাশের ওই মেঘগুলো।

চড়াই পথে উঠছি—উৎরাই বেয়ে নামছি। এই আমাদের পথ। দীর্ঘদিনের পথ। চলাটা একঘেয়ে হতে পারে, কিন্তু রাস্তাটা বৈচিত্র্য-হীন নয়।

আজকাল আমরা গ্যাসমাস্ক পরাটা অভ্যেস করছি। গোড়ার দিকে অভ্যেস করে না নিলে পরে বিপদে পড়তে হবে। এ অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর আমাদের সবারই আছে। তাই আর দেরি নয়।

প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধে বোধ হচ্ছে। তা হোক। দু-একদিনের মধ্যে সহ্য হয়ে যাবে ঠিক। কিন্তু সহ্য করা দায় হয়ে

উঠেছে ওই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে। ওরা যেন আমাদের পেছনে ফেউ লাগার মত লেগেছে। জ্বালাতন করছে বড়।

আর করবার কথাও বটে। মুখোশ পরে যে বীভৎস রূপ ধারণ করেছি আমরা তাতে ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না। অস্বাভাবিক কোন কিছুকেই ছোটরা বরদাস্ত করতে পারে না—ওদের স্বভাবই তো তাই। দর্পু গ্রামে পৌঁছে দেখি সব দোকানগুলোতেই পোর্টারদের ভিড়। তুমুল হট্টগোল। সামনে কতকগুলো কাপড়ের দোকান। নানা রকমের কাপড়, শাল, অ্যাপ্রন রয়েছে ওগুলোতে সাজানো। লোভ লাগিয়ে দেয়।

ওই লোভে লোভে শেরপানীরা ভিড় জমিয়েছে ওই দোকান-গুলোতে। জঙ্গল, গাম্বু, রাও দোকানগুলোকে ঘুরেফিরে দেখছে। সব রকমের দোকানই এখানে আছে। তাই খুঁজলে এখানে সব-কিছুই পাওয়া যায়।

ষোলু-খুম্বু জেলায় এত বড় বাজার যে আর নেই পোর্টাররা সে-কথা আমাদের বহুবার বলেছে। কেনাকাটার ব্যাপারে দেখছি ওরা খুবই ওস্তাদ। ওদের ঠকানো বড় শক্ত।

এখানে চব্বিশ টাকা চালের মণ। ওজন করে চাল বিক্রয় হয় না—মেপে বিক্রি হয়। মাপ হয় 'মানাসে'। এক মানাস মালে প্রায় এক পাউণ্ড। আট মানাসে হয় এক পাটি।

ঝুরা একটা কাপড় কিনেছে। নীল রঙের। হাসি-হাসি মুখে ও তাকাচ্ছে এর-ওর দিকে। কাউকে কাউকে ডেকে ও জিজ্ঞেসও করছে, কেমন হয়েছে জিনিসটা? আমি একটা তিব্বতী বুট কিনে ফিরে আসছিলুম, ঝুরা আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

সপ্রতিভ ভাবে ও বলল, 'ডাক্তার সাব্, চলে যাচ্ছেন যে বড়। কেমন হয়েছে বললেন না তো?'

—দেখি, দেখি। হাতে করে নিলুম কাপড়টা। নাড়াচাড়া

করতে করতে ভীষণ বুঝদারের মত বললুম, 'বাঃ, বেশ হয়েছে। রঙটাও দেখছি জমকালো।'

—আমার কিন্তু লাল রঙটা খুব পছন্দ। ফুরিয়ে গেছে যে ওটা। নইলে—

—কী যে বলো? লালের কাছে কেউ লাগে নাকি? কথায় বলে—

থেমে গেলুম। ঝুরা অন্যদিকে চেয়ে আছে। বলা হল না।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম, রাজু একটা ফারের টুপি পরে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

ঝুরা ওকে দেখিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে আমায় বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে দেখছেন? ঠিক যেন একটা সঙ্‌। অপরূপ! আচ্ছা, ওর কি কোন রুচিরও বালাই নেই!'

—তাইতো দেখছি। একেবারে আ-দেখ্‌লে।

—আপনার কাছে এলে টান মেরে টুপিটা ফেলে দেবেন।

—তাই করা উচিত।

—হুঁঃ, আপনার মুরোদে তা আর হবে না। পড়ত আমার পাল্লায়, দেখিয়ে দিতুম।

রাজু ইতিমধ্যে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঝুরা নিরীহের মত চোখ নিচুতে করে মাটিতে পা ঘষতে লাগল।

রাজু যেন আগ্রহে আর ধৈর্য রাখতে পারছে না এমনভাবে আমায় বলল, 'টুপিটা কিনলুম। ভাল দেখাচ্ছে না পরলে?'

কি বলবো? উভয় সঙ্কট।

সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তিমতী চণ্ডী। টুকটুকে ঝুরা। কথায় ওকে সম্মতি না দিয়ে তাই খুব জোরে খানিকটা কাষ্ঠ হাসি হাসলুম। তারপর কায়দা করে ক্যাবলার মত জিজ্ঞেস করলুম, 'ঝুরা কী বল?'

ঝুরা এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না মোটেই।

ও থতমত খেয়ে বলল, 'না, না, বেশ তো হয়েছে। বে-শ-তো—'

ঝুরার কাপড়টা তখনও আমার হাতে। খপ করে রাজু সেটাকে নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'কিনলেন বুঝি?'

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই ও তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'এ-এ-এঃ। এ যে একেবারে ম্যাড়মেড়ে। ধ্যুৎ ধ্যুৎ। পয়সা খরচা করে কেউ আবার এ জিনিস কেনে!'

রাগে ঝুরার মুখ লাল হয়ে গেল। কাপড়টাকে ছিনিয়ে নিয়ে ও একরকম ছুটে পালাল আমাদের সামনে থেকে।

বুদ্ধিমান রাজু ততক্ষণে বুঝে নিয়েছে কাপড়টা কার। কিন্তু ও জানবে কী করে? ···ইস্, কী মারাত্মক ভুলটাই না করে ফেলল ও। সংশোধনের জন্যে ও চিৎকার করে ঝুরাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কী যেন সব বলতে গেল।

কিন্তু বৃথা।

ওর অন্তরের সংযত রোদন তখন চারপাশের অরণ্যে গিয়ে মিশছে।

ঝুরা কি আর সেখানে আছে?

রাজুর হাতে আমার কেনা জিনিসগুলো দিচ্ছি, এমন সময় কতকগুলো লোক এসে আমার হাতে একখানা চিঠি দিল। ওটা লিখেছে ভগ্নানী। আমার সহকর্মী ডাক্তার। এখানে বিশেষ একটা রুগী দেখার জন্যে। 'থাই-বোনে' নাকি তার টি. বি. হয়েছে। ব্রিগেডিয়ারের ইচ্ছে আমি যেন রুগীটার সব সুব্যবস্থা করি।

তখনই যেতে হল ওদের সঙ্গে।

রুগী একটি সুন্দরী যুবতী। স্বাস্থ্যবতীও বটে। পরীক্ষা করে মনে হল কেসটা টি. বি. নয়। অস্টিওমেটাইটিস অব দি ফেমুর। যা হোক, স্থানীয় কম্পাউণ্ডার মারফত তার চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা করে তবে ফিরলুম।

এখানকার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান। সোনার মত গায়ের রঙ। তবে কারও আকৃতি মঙ্গোলিয়ান নয়,

বরং ভারতীয় ধরনের। মেয়েদের দেখতে আরও সুন্দর। অনেক মেয়ের আবার টানা-টানা চোখ। বাঁশির মত নাক। শোনা যায় ইণ্টার-ম্যারেজের ফলে ঐ ধরনের সুন্দরীর উদ্ভব হয়েছে। ওদের মধ্যে আবার তামাং মেয়েদের সৌন্দর্যের তুলনা নেই।

যা হোক, এখানে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার পাততাড়ি গুটোলুম আমরা। পরের তাঁবু পড়বে রিংমোয়। দর্পু গ্রাম ছাড়িয়ে আরও কয়েক মাইল দূরে। পোর্টারদের মুখ এখন আনন্দে উজ্জ্বল। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর মধ্যে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ছাঙ পদার্থটি ওরা অল্পবিস্তর সকলেই কিনেছে। খেয়েওছে কেউ কেউ কিছু কিছু। তারই প্রতিক্রিয়া বোধ হয় ফুটে উঠেছে ওদের চোখে মুখে।

ওদের অধিকাংশই এখানকার অধিবাসী। আর এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তারা সবাই কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। তাঁবুতে পৌঁছে ওরা কাঠ আনতে যায় জঙ্গলে। কাঠ এনে মিলেমিশে রান্না করে খায়। আমাদের পরিশ্রম লাঘবের জন্যে অনেক সময় অনেক দূরের নদী অথবা প্রস্রবণ থেকেও জল বয়ে আনে।

প্রতিদিন ওরা আমাদের তাঁবু খাটাতে সাহায্য করে। সকালে আমাদের প্রস্তুত হবার আগেই ওরা তাঁবু খুলে বয়ে নিয়ে যায় পরবর্তী ক্যাম্পে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, ওদের তাঁবুর মাথায় কোন ছাউনি নেই, বৃষ্টি পড়ছে, কি দারুণ তুষারপাত হচ্ছে, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে হু-হু করে—পড়ে আছে তবু ওরা মুখ বুজে। সেই সময় আমাদের এগিয়ে আসতে হয়। ওদের জন্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। এমনি সহিষ্ণু, শক্ত সমর্থ ওরা।

আরও একটা চড়াই পার হয়ে আমরা এসে পৌঁছলুম সলেরী গ্রামে। এখানে এসে এই প্রথম আমার নজরে পড়ল একটা ডিস্-পেন্সারি। এর আগে, এই দীর্ঘ অতিক্রান্ত পথে আর-একটিও ডিস্-পেন্সারি নজরে পড়েনি। এখান থেকে সাহায্য দেওয়া হয় দর্পু ও

নিকটবর্তী আর-আর সব গ্রামে। বহুদূর থেকেও রুগী আসে এখানে চিকিৎসা করাতে।

এখানে কোন পাস-করা ডাক্তার নেই। আছেন একজন কম্পাউণ্ডার। অথচ ডাক্তার বলেই তিনি খ্যাত। ডিস্‌পেন্‌সারি ও রুগীর যা কিছু তদারক তিনিই করেন।

ডিস্‌পেন্‌সারি থেকে সাধারণত 'স্টক্-মিক্সচার' দেওয়া হয়। আর তা ছাড়া উপায়ই বা কী? ওষুধ কেনবার মত পয়সাই বা ক'জন লোকের এখানে আছে!

এখানে উল্লেখযোগ্য আরও একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল। তা হচ্ছে হাই-স্কুল। ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশের বেশী নয়। তিন জন শিক্ষক। ইংরেজী, হিন্দী, নেপালী ভাষা এখানে শেখানো হয়। মাইনে চার টাকা। গ্রাম্য-পঞ্চায়েত স্কুলটির পরিচালনা করেন।

সলেরীকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলুম। হঠাৎ রাও থমকে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখাল দূরে একটা পাহাড়ের ওপরে সুন্দর একটা মঠ। অদ্ভুত দেখতে লাগছে ওটাকে এখান থেকে।

বেলা একটার সময় পৌঁছলুম রিংমো ক্যাম্পে। দশ হাজার ফুট উঁচুতে এই স্থানটা—চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বৈশিষ্ট্যময়। আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা থাকায় পথশ্রম আজ আর তেমন হয়নি।

তাঁবুতে পৌঁছেই দেখি ভগ্নানী আমার জন্যে আর-একটা চিঠি রেখে গেছে। ও আরও জানিয়েছে ওদলের সব মেম্বারেরই ওজন বেশ বেড়েছে। তালিকায় দেখলুম, সোনাম ও কুমারের ওজনই সবচেয়ে বেশী বেড়েছে। কৌতূহলবশত আমরাও হুটোপুটি করে নিজেদের ওজন নিতে লাগলুম। আশ্চর্য, দেখলুম আমরাও প্রত্যেকে কিছু-না-কিছু বেড়েছি।

নাণ্টু, যার কপালে পাথরের চোট লেগেছিল, একেবারে ভাল হয়ে গেছে। ওর ড্রেসিংয়ের ভার দিয়েছিলুম দানামগিয়ালের ওপর।

দানাম নিপুণ হাতে ওর পরিচর্যা করেছে। নান্টু সুস্থ হয়েছে। তাই ব্যাণ্ডেজটা এখন আর রাখতেও নারাজ। ওটা খুলে ফেলে ওকে নিষ্কৃতি দিলুম।

রুগীদের নিয়মমাফিক দেখে একসময় আমি টেন্টে গিয়ে ঢুকলুম। জঙ্গল, গাম্বু, রাও ইতিমধ্যেই আসর জাঁকিয়ে বসেছে।

রাও আবহাওয়াতত্ত্ববিদ। মুরুব্বীর মত আস্ফালন করে ও আবহাওয়া সম্বন্ধে ওদের কী যেন সব বোঝাচ্ছে! কিছুক্ষণ চুপ করে শোনার পর আমি আর থাকতে পারলুম না।

মাঝপথে বাধা দিয়ে বলতে গেলুম, 'একবার জানলে—'

—থাম, থাম। ধমকে থামিয়ে দিল রাও।

আরও কিছুক্ষণ পরে জঙ্গল বোধ হয় ওর বক্তৃতায় অধৈর্য হয়ে আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে বলল, 'তুমি কী যেন বলছিলে?'

হাঁ-হাঁ করে উঠল আর-সব শ্রোতা। সকলেরই নজর পড়েছে আমার দিকে।—'কী? কী?'

উৎসাহ পেয়ে বললুম, 'একটা গল্প। এক বর্ণও তার মিথ্যে নয়। আর মিথ্যে যদি—'

—হয়েছে, হয়েছে। ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। এবার আরম্ভ করে দাও। নীরস কণ্ঠে বলল রাও।

—এক গাঁয়ে, বুঝলে, একটা লোক খুব ভাল আবহাওয়া ফোরকাস্ট করত। আবহাওয়া-বিভাগের রুই-কাতলারাও তার ফোর-কাস্টে একেবারে হকচকিয়ে যেত। শেষে তারা স্থির করল গেঁয়ো লোকটাকে তারা ধরবে রহস্যটা কী জানতে! করলও একদিন তাই। …কী হে, সব শুনছ তো? 'হুঁ' দিচ্ছ না কেন?

—হুঁ, তারপর? জঙ্গলরা সায় দেয়।

—লোকটা সব শুনে তো একেবারে হেসেই খুন। বলল তার বিশেষ কিছুই কৃতিত্ব নেই। ওঁরা যা ফোরকাস্ট করেন সে বলে তার উল্টোটা। আর লেগেও যায় ঠিক।

রাও ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠছিল। অন্যেরা হাসছিল দেখে বোমার মত ফেটে কী যেন সব আমায় বলতে গেল।

কিন্তু সেকথা শোনবার আর আমি অবকাশ পেলুম না। তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতে হল একজন মহিলার ডাকে। উনি এসেছেন একজন লোকের সঙ্গে আমাকে নিয়ে যেতে। একটা রুগী দেখানোর জন্যে। সঙ্গে এনেছেন বড় একজার ছাঙ্ ও প্রচুর আলু। ডাক্তারের উপঢৌকন। কিছুতেই ফেরত নেবেন না। শেষ পর্যন্ত নিতেই হল আমাকে। ছাঙটা পেয়ে পোর্টারদের আনন্দ আর ধরে না।

রুগীর কথা শুনলুম। মাঝারী বয়সের মেয়ে। প্রসব করেছে মরা ছেলে। এইটেই ছিল তার প্রথম সন্তান। ভীষণ রক্তস্রাব হচ্ছে। বাঁচবে না বোধ হয়।

তাড়াতাড়ি গেলুম। অবস্থা তেমন খারাপ নয় পরীক্ষা করে বুঝলুম। গর্ভপাত হবার জন্যে রক্তপাতটা বেশী হয়েছে। ওকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পরামর্শ দিয়ে আর সেই সঙ্গে রক্তহীনতার যাবতীয় ওষুধপত্র দিয়ে ফিরে এলুম ক্যাম্পে।

বেশ পা চালিয়েই এলুম। কারণ, কাল ভোরে ডাক-হরকরা যাত্রা করবে কাঠমাণ্ডুর দিকে। তার হাতে তুলে দিতে হবে কতকগুলো চিঠি, আমার প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে লেখা।

তার মধ্যে বিশেষ করে একখানা চিঠি লিখতে হবে মাকে। তাতে এমন কিছুই লেখা চলবে না যা নির্ভাবনায় বন্ধুমহলে লেখা চলে।

যাযাবরের মত পথে-প্রান্তরে, অরণ্যে-গহ্বরে এখন আমাদের বাস। উন্মুক্ত মাটির ধুলো-কাদায়, সহস্র কেঁচো জোঁক মশা ঝিঁঝির নিয়ত বিচরণের মধ্যে আমাদের রাতের শয্যা। এসব কথা লেখা চলবে না। লেখা চলবে না—কর্মক্লান্ত দিনের অবসান হলে সন্ধ্যার কোন কোন নিরালা নির্জন অবসরে তোমাদের সান্নিধ্য পাবার জন্যে মনটা আমার হু-হু করে ওঠে। অসুখে-বিসুখে, অরুচি-অনিদ্রায় সে আমারও

অজ্ঞাতে চুপি-চুপি পালিয়ে যায় তোমাদেরই কাছে নতুন কিছুর আশায়। কিছুতেই লিখতে পারব না—আগামী দিনগুলো আরও ভয়ঙ্কর, আরও বিপদসংকুল। সম্পূর্ণ তুষাররাজ্যে, নিয়তপরিবর্তনশীল আবহাওয়ার মধ্যে জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে নিত্য আমাদের পথ চলা। তুষারের চোরা ফাটলে কে কোথায় তলিয়ে যাবে—কার কখন পদস্খলন হবে হিমবাহের পিচ্ছিল বুকে—অ্যাভালাঞ্চের আকস্মিক আবির্ভাবে চিরসমাধিস্থ হবে কে কখন—কিছুরই হিসেব থাকবে না আর! শুধু ভাগ্যের হাতে পুতুল-নাচা ছাড়া এখন আর উপায়ও নেই কিছু!

লিখে ফেলতেই হবে চিঠিগুলো আজ।

তাই জোর কদমেই ফিরে এলুম তাঁবুতে।

১৮ই মার্চ ॥ শুক্রবার

আজকাল রোজই দেখছি বেশ ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। সকাল সকাল উঠে পড়াটা অনেকটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। যদিও শোয়াটাও হচ্ছে বেশ সকাল সকাল, বিশেষ কোন কারণ না থাকলে।

উঠেই খোঁজ নিতে লাগলুম 'মেল-রানার'-এর। অনেক রাত জেগে কাল চিঠিগুলো লিখেছি। পাঠাতেই হবে ওগুলো। কিছুক্ষণ বাদে মেল-রানারের দেখা মিলল। আর সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠার বোঝাটাও নেমে গেল। চিঠিগুলো ওর হাতে তুলে দিতে পেরে নিশ্চিন্ত হতে পারলুম।

আজও সূর্য ওঠার আগেই চলা শুরু হল। সামনের দীর্ঘ চড়াই পথ অতিক্রম করতে হবে।

চলেছি দ্রুত পায়ে পাইন বনের মধ্য দিয়ে। পড়ে রইল রিংমো গ্রামটা, পেছনে একটুখানি স্মৃতির টুকরো হয়ে। সামনে-পেছনে

নজরে পড়ছে একটার পর একটা মণিওয়াল, প্রেয়ার-ফ্লাগ, প্রস্তরস্তূপ। ক্রমেই যেন ওগুলোর সংখ্যা বাড়ছে। ক্রমেই যেন বৌদ্ধপ্রভাবের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আজও আমরা গ্যাসের মুখোশ পরেছি। এর অসুবিধেগুলোকে ধাতস্থ করে নিচ্ছি অভ্যেসের সঙ্গে সঙ্গে। পরে যাতে কষ্ট পেতে না হয়।

একভাবে চার-পাঁচ মাইল চলার পর আমরা একটা পাসে বা গিরিপথে এসে পৌঁছলুম। এখান থেকে হিমালয়ের সংখ্যাতীত চূড়া স্পষ্টতর দেখায়। দুগ্ধ-শুভ্র তুষারে আবৃত ওগুলো।

জঙ্গল ও আমি প্রাণভরে আরও কতকগুলি ছবি তুললুম। গিরিপথের ধারে ধারে স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ডের রাশ। প্রেয়ার-ফ্লাগও রয়েছে অনেকগুলো। সুদূর অতীত থেকে পথিক এই পথে যাওয়ার সময় বোধ হয় সংস্কারবশেই একটা-দুটো মোচাকৃতি পাথর এখানে ফেলে রেখে গেছে। কালক্রমে ওগুলো বিরাট স্তূপে পরিণত হয়েছে। শুধু এখানেই নয়, শোনা যায় এমনি করেই অনেক 'পাসে' অনেক বিরাট স্তূপের রচনা সম্ভব হয়েছে।

এবার ধীরে-সুস্থে নেমে চলেছি। একটা খাড়া ঢালু পথ বেয়ে।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। চড়া রোদ্দর্। সাবধানে পা ফেলছি।

তিন-চারশো ফুট নামবার পর এসে পৌঁছলুম তাকসিন্ধু গ্রামে। শুনলুম, এখানকার দর্শনীয় মঠ থেলিস এখান থেকে বেশী দূর নয়। তাই ওটাকে দেখার লোভ আমরা সম্বরণ করতে পারলুম না। মঠের কাছাকাছি হতেই কয়েকজন লামার সঙ্গে আমাদের দেখা হল।

ওঁদের মধ্যে বড় লামা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে আমাদের স্বাগত জানালেন। কথাবার্তার ফাঁকে তিনি বিশেষ করে বললেন, গতকাল বড়-সাহেব (ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং) মঠটা দেখে গেছেন। তাঁর সুখ্যাতিতে তিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

জঙ্গল আর স্থির থাকতে পারল না। উঠে পড়ে লেগে গেল

প্রমাণ করতে যে আগের দিনের বড়-সাহেবের চেয়ে এই ছোট-সাহেবও কোন অংশে কম নয়। কায়দা করে ও সরিয়ে নিয়ে গেল বড় লামাকে আমাদের থেকে একটু তফাতে।

কী সব ভুজুংভাজুং দিল। তার পর অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ও গুঁজে দিল ওঁর হাতে কী যেন সব প্রণামী! আশ্চর্য! কিছুক্ষণ বাদেই দেখলুম আমাদের খাতিরের বহর যেন অতিমাত্রায় বেড়ে গেল।

বড় বড় গ্লাসে করে সবচেয়ে ভাল ছাঙ এল। সেই সঙ্গে এল জলখাবারের আমন্ত্রণ। আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করা অভব্যতা। তাই একটুখানি ছাঙ আঙুলে করে মুখে ঠেকিয়ে আমরা বিদায় নিলুম।

পথে জঙ্গল ভ্রূ নাচাতে নাচাতে আমাদের বলল, 'বল, বড় লামা আমাদের কী রকম খাতির করল ?'

—করবে না আবার! কে আমার লীডার দেখতে হবে তো। সমস্বরে আমরা জবাব দিলুম।

জঙ্গলের তৃপ্তি কে দেখে তখন! সূক্ষ্ম আত্মাভিমানে তখন ও ডগমগ।

দেড়টার সময় আমরা পৌঁছলুম খারিখোলায়। তাঁবু ফেলা হয়েছে নদীর গা ঘেঁষে। খোলা জায়গায়। মনোরম পরিবেশ।

মাথার ওপর রোদ্দুর জ্বল্ জ্বল্ করছে। গরম লাগছে।

তাই চান করতে নাবলুম নদীতে। জঙ্গলও আমার সঙ্গে এল। নদীর দু ধারে অর্কিডের ঝোপঝাড়। যে ফুল এর আগে ভাল করে দেখবারই সুযোগ পাইনি, সেই ফুল রাশি রাশি পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি আমাদের আশেপাশে।

শুধু কি তাই ? অনতিদূরে পাহাড়ের গায়ে রাশ রাশ রডোডেন্ড্রনের বন। হাওয়ায় দুলছে। তারই মাঝে মাঝে একটি-দুটি ম্যাগনোলিয়ার গাছ। বেশ চিনতে পারছি। সবুজ পাতার ফাঁকে শাঁখমাজা ধপধপে ফুলগুলো কী অপরূপ শোভাই না ধারণ করেছে!

প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে ওদের জন্ম। অন্যের স্নেহমমতার পরোয়া করে না ওরা। প্রকৃতির অবাধ স্বাধীনতায় ওদের পরিপূর্ণতা।

মনে হল বিখ্যাত ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই অনন্ত মুহূর্তের দেখা। কবি আমি নই, তবুও দেখতে লাগলুম দু'নয়ন ভরে।

"Ten thousands saw I at a glance
Tossing their heads in sprightly dance."

সম্বিৎ হারিয়েছিলুম। জঙ্গলের কথায় সচকিত হলুম।

চান সেরে উঠে আসছি, এমন সময় পোর্টারদের একটা জটলা থেকে হাসি-তামাশার হট্টগোলটা মাত্রাধিকভাবে শোনা গেল। ছাঙ্ খাওয়ার নতুন বিপত্তি কি না একবার উঁকি মেরে দেখতে গেলুম।

দেখলুম, বাহাদুর নামধারী সেই বিয়ে-পাগলা বুড়োটা একেবারে মারমুখী হয়েছে। কাঁদো-কাঁদো স্বরে ও বলছে, 'আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।'

দু-একটা শেরপা ওকে চেপে ধরেছে। ও রাগে থরথর করে কাঁপছে। শেরপানীদের মধ্য থেকে মুখরা লামু বলছে, 'আক্কেল-খেগোর বায়না দেখ না। ঘাটে ওঠবার বয়েস হয়েছে, আর আমায় কিনা উনি বিয়ে করবেন! মরণ আর কী!'

বাহাদুর আমাকে দেখে বলল, 'আস্পর্ধাটা দেখছেন। বাপের বয়সী আমি ওর। আর ও কিনা আমায় যা নয় তাই বলে গালাগাল দিচ্ছে!'

জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন, হয়েছে কী?'

লজ্জিত স্বরে ও বলল, 'কিছুদিন থেকে ও আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, বুড়ো আমার ওপর রাগ করেছে। পোড়া কপাল আমার। সকলের সামনে ও আমায় অমন করে ধরল কেন? একটু লুকিয়ে করলে কি আমি কিছু বলতুম। তা আমি ভাবলুম ও সত্যিই বুঝি আমায় ভালবাসে। নইলে—'

হাসির হট্টগোল পড়ে গেল। লামু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল,

'ড্যাগাড়ের মড়াটা কি ঠোঁট-কাটা গো! যা মুখে আসে তাই বলছে দেখ্ ডাক্তার সাবের সামনে। খেংরে তোমার বিষ—'

—যা, যা। নেমকহারাম কোথাকার। আমার পয়সায় তুই ছাঙ খাচ্ছিস্ না ক'দিন!

মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বাহাদুর ঠাণ্ডা গলায় আমায় বলল, 'আবার কী বলে জানেন? ভালবাসতে গেলে একটু-আধটু ছাড়তে হয়। অমনি-অমনি কি আর ভালবাসা হয়!'

জিজ্ঞেস করলুম, 'আর তুমি ছাড়তে?'

—হুঁ, কী করব বলুন? ও যে সেদিন আমার হাতটা ধরে বলল, আঃ কী নরম! ওর কথা শুনে আর একদফা হাসির স্রোত বয়ে গেল।

—তা আজ কী হয়েছে সেইটে বল!

লামু রাগে একেবারে কাঁপতে কাঁপতে আমায় বলল, 'আমি ওই পাথরটায় হেলান দিয়ে বসে একটু ঝিমোচ্ছি—আর ওই মুখপোড়া হতচ্ছাড়া কোথা থেকে চোরের মত এসে আমার একটা হাত চেপে ধরে প্রলাপ বকতে লাগল।'

—তাই বলে তুই আমার গালে চড় মারবি? উত্তেজিতভাবে বাহাদুর বলল।

আমি আর থাকতে পারলুম না। কঠিন সুরে ওদের ভর্ৎসনা করলুম। আর সেই সঙ্গে নিষেধও করে দিলুম, কোনক্রমেই যেন ওরা দুজনে আর মুখোমুখী না হয়।

বিকেলবেলা ডিস্পেন্সারিতে এসে বসেছি। দানামগিয়ালও সঙ্গে এল। রাজু, ঝুরা দুজনেই রয়েছে। নির্বাক, নিস্তব্ধ। দানামকে দেখে ওরা আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। অতি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে লাগল। ব্যাপারটা আর-কিছুই নয়, ওরা দানামকে ভয় করে। তাই মনোযোগটা আর-এক পর্দা চড়ে গেছে কাজে।

আজকে স্থানীয় রুগীর সংখ্যা কম। ওদের যথাযথ চিকিৎসা করে

বিদায় দিলুম। তারপর দেখতে লাগলুম পোর্টারদের। খাড়া পর্বতে ওঠানামায় ওদের আজ কেউ কেউ একটু-আধটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এমন কিছুই অবশ্য নয়।

ওদের তদারক করছি। কারও কারও শুশ্রূষার ভার রাজু ও ঝুরার ওপর দিচ্ছি। কাজ প্রায় মিটে এসেছে এমন সময় একজনের শরীরের টেম্পারেচার দেখে বিস্মিত হলুম।

ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝলুম—লোকটা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। থার্মোমিটারে জ্বর উঠল ১০৪° ডিগ্রী। ভয়ের ব্যাপার বটে। অথচ এই নিয়ে ও মাল বয়েছে! অন্তত এটা নিশ্চিত যে শরীর খারাপ নিয়েই ও কাজ করেছে। ওর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করলুম। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওর বিশ্রামেরও ব্যবস্থাদি করলুম।

কাজ শেষ করে উঠতে যাব, এমন সময় গাঁয়ের কতকগুলো লোক এসে একটা রুগী দেখার জন্যে বিশেষ করে ধরল আমায়। যেতেই হল।

গিয়ে যা দেখলুম তা না দেখলেই ছিল ভাল। একটা ছোট ছেলে আগুনে পুড়ে গেছে। চোদ্দ-পনরো দিন আগে সন্ধ্যেবেলা যথারীতি ও দলবলের সঙ্গে মস্ত বড় একটা গর্তে বিরাট কাঠ-কুটোর আগুন জ্বালিয়ে তাপ নিচ্ছিল। তারপর ছাঙ্ খাওয়ার দরুনই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তারই পরিণাম এই অগ্নিদগ্ধ অবস্থা।

ছেলেটা এমনভাবে পুড়ে গেছে যে তার পিঠের, হাতের চামড়া, মাংস একেবারে কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে। পায়ের হাড় পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় বেরিয়ে গেছে। চেনাই যায় না তাকে মানুষ বলে। আশ্চর্য, এমন পুড়েও কেউ বেঁচে থাকতে পারে! তাও আবার একদিন-আধদিন নয়, একেবারে চোদ্দ-পনরো দিন!

দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে ওর গা দিয়ে। দগ্‌দগে ঘায়ে ভরে গেছে ওর সারা দেহ। দেখলে মায়া লাগে। একটু দূরে একজন স্ত্রীলোক বিস্ফারিত

নেত্রে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই নাকি তার একমাত্র সন্তান। শেষ নির্ভর। কিন্তু উপায় কী ?

দুঃখ হচ্ছে। রাগও হচ্ছে বটে এইসব মূঢ় ম্লান মূক লোক গুলোকে দেখে। এদের কি এ বুদ্ধিটাও নেই যে পোড়া দেহটাকে হাওয়া থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে হয় ···ভালভাবে যা হোক কিছু দিয়ে ঢেকে রাখলে পোড়া ছেলেটা অন্তত যন্ত্রণার কিছুটা উপশম পায়। আলগা গায়ে নগ্নভাবে ওকে ওরা ফেলে রেখেছে মাটিতে। আর মাথায় হাত দিয়ে হা-হুতাশ করছে সবাই একযোগে অসহায়ভাবে। বাস্, ওইতেই ওদের আরম্ভ আর ওইতেই ওদের শেষ। আর-কিছু যেন করবার নেই ওদের দুনিয়ায় !

ছেলেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলুম। জীবনের স্পন্দন তখনও আছে। তবে তাও শেষ হয়ে আসতে বিলম্ব নেই। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবু ওদের তৃপ্ত করতে যা করা উচিত সবই করলুম। ওষুধ লাগানো, ব্যাণ্ডেজ করা—কোন-কিছুই বাদ দিলুম না। ফেরবার পথে স্ত্রীলোকটি এসে একটা নিরিবিলি জায়গায় আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কিছু বলবার আছে নাকি ?'

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল, 'ও বাঁচবে তো—আমার খোকা ?'

চেয়ে দেখলুম প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে। চিন্তাক্লিষ্ট ফ্যাকাশে মুখ। যেন কতদিন অনাহারে আর অর্ধাশনে দিন কেটেছে ওর। দু গালে চোখের জলের শুষ্কপ্রায় কালিমা।

বিচলিত হয়ে উঠলুম কেমন যেন ! কিন্তু কত অসহায় আমি তা কি ওরা বুঝবে ! তাই কৃত্রিম জোরের সঙ্গে বলতে হয়,—নিশ্চয়ই।

বাঁচবে না ছেলেটা জানি। তবু এ অভিনয়টা আমায় করতে হল। স্ত্রীলোকটি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল এবার। খুব খুশী হয়ে বলল,

ফেরবার পথে যেন আমরা ওদের এই গাঁ হয়ে যাই। ও নিজে হাতে রেঁধে আমায় খাওয়াবে।

এতখানি সারল্যের মধ্যে এতবড় মিথ্যের প্রহসন করতে আমি মরমে মরে যাচ্ছিলুম। একবার ইচ্ছে হল সব খুলে বলি। পরিষ্কার হয়ে যাক যা-কিছু সব। কিন্তু এমনি করে একজনের বুকভরা আশাকে ভেঙে দিই কী করে! মানুষের যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই তো আশ। এজন্যেই অপ্রিয় সত্যটাকে আর বলতে পারলুম না।

শুধু শুকনো হাসি মুখে টেনে বললুম, 'নিশ্চয়ই আসব।'

রাত্তিরবেলা শোবার আয়োজন করছি। এমন সময় পোর্টার-সর্দার উত্তেজিতভাবে দুজন পোর্টারকে আমার কাছে ধরে আনলো। একজনের নাক দিয়ে তখনও গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরুচ্ছিল।

সব শুনলুম। ঘটনাটা অতি তুচ্ছ।

পোর্টাররা সকলেই মাল নামিয়ে রেখে যায় নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। সকালবেলা আবার তারা যে যার মাল উঠিয়ে নেয়। কেউ কেউ আগে থেকেই তা গুছিয়ে রাখে। আজ সেই গোছানোটাই চলছিল। ৬০ পাউণ্ডের কম কারও মাল নয়। কিন্তু তাতে কী! একবার যে যে-বোঝা নেয়, সে আর সেটিকে হাতছাড়া করে না। ওদের চিনে নেবার ক্ষমতাটাও আছে আশ্চর্য! বাক্সের গায়ে যে নম্বর দেওয়া আছে তা পড়তে পারে না কেউ। কিন্তু কোন্‌ বাক্সটি কে বইছে তা বুঝতে দেরি হয় না এদের একটুও।

এমনি বোঝাবুঝির পালা চলছিল ওদের একটু আগে। নীরবে, নিশ্চিন্তে। হঠাৎ বোধ হয় একজনের একটু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে। আর তারই পরিণাম এই। তর্কাতর্কির পর অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে সাধারণত যা হয় তাই হয়েছে—হাতাহাতি।

ফল রক্তারক্তি।

মিটমাটের পর ওরা সর্দারকে এ কথাও জানিয়েছে, রক্তারক্তি

নেত্রে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই নাকি তার একমাত্র সন্তান। শেষ নির্ভর। কিন্তু উপায় কী?

দুঃখ হচ্ছে। রাগও হচ্ছে বটে এইসব মূঢ় ম্লান মূক লোক গুলোকে দেখে। এদের কি এ বুদ্ধিটাও নেই যে পোড়া দেহটাকে হাওয়া থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে হয় …ভালভাবে যা হোক কিছু দিয়ে ঢেকে রাখলে পোড়া ছেলেটা অন্তত যন্ত্রণার কিছুটা উপশম পায়। আলগা গায়ে নগ্নভাবে ওকে ওরা ফেলে রেখেছে মাটিতে। আর মাথায় হাত দিয়ে হা-হুতাশ করছে সবাই একযোগে অসহায়ভাবে। বাস্, ওইতেই ওদের আরম্ভ আর ওইতেই ওদের শেষ। আর-কিছু যেন করবার নেই ওদের দুনিয়ায়!

ছেলেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলুম। জীবনের স্পন্দন তখনও আছে। তবে তাও শেষ হয়ে আসতে বিলম্ব নেই। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবু ওদের তৃপ্ত করতে যা করা উচিত সবই করলুম। ওষুধ লাগানো, ব্যাণ্ডেজ করা—কোন-কিছুই বাদ দিলুম না। ফেরবার পথে স্ত্রীলোকটি এসে একটা নিরিবিলি জায়গায় আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কিছু বলবার আছে নাকি?'

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল, 'ও বাঁচবে তো—আমার খোকা?'

চেয়ে দেখলুম প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে। চিন্তাক্লিষ্ট ফ্যাকাশে মুখ। যেন কতদিন অনাহারে আর অর্ধাশনে দিন কেটেছে ওর। দু গালে চোখের জলের শুষ্কপ্রায় কালিমা।

বিচলিত হয়ে উঠলুম কেমন যেন! কিন্তু কত অসহায় আমি তা কি ওরা বুঝবে! তাই কৃত্রিম জোরের সঙ্গে বলতে হয়,—নিশ্চয়ই।

বাঁচবে না ছেলেটা জানি। তবু এ অভিনয়টা আমায় করতে হল। স্ত্রীলোকটি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল এবার। খুব খুশী হয়ে বলল,

ফেরবার পথে যেন আমরা ওদের এই গাঁ হয়ে যাই। ও নিজে হাতে রেঁধে আমায় খাওয়াবে।

এতখানি সারল্যের মধ্যে এতবড় মিথ্যের প্রহসন করতে আমি মরমে মরে যাচ্ছিলুম। একবার ইচ্ছে হল সব খুলে বলি। পরিষ্কার হয়ে যাক যা-কিছু সব। কিন্তু এমনি করে একজনের বুকভরা আশাকে ভেঙে দিই কী করে! মানুষের যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই তো আশ। এজন্যেই অপ্রিয় সত্যটাকে আর বলতে পারলুম না।

শুধু শুকনো হাসি মুখে টেনে বললুম, 'নিশ্চয়ই আসব।'

রাত্তিরবেলা শোবার আয়োজন করছি। এমন সময় পোর্টার-সর্দার উত্তেজিতভাবে দুজন পোর্টারকে আমার কাছে ধরে আনলো। একজনের নাক দিয়ে তখনও গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরুচ্ছিল।

সব শুনলুম। ঘটনাটা অতি তুচ্ছ।

পোর্টাররা সকলেই মাল নামিয়ে রেখে যায় নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। সকালবেলা আবার তারা যে যার মাল উঠিয়ে নেয়। কেউ কেউ আগে থেকেই তা গুছিয়ে রাখে। আজ সেই গোছানোটাই চলছিল। ৬০ পাউণ্ডের কম কারও মাল নয়। কিন্তু তাতে কী! একবার যে যে-বোঝা নেয়, সে আর সেটিকে হাতছাড়া করে না। ওদের চিনে নেবার ক্ষমতাটাও আছে আশ্চর্য! বাক্সের গায়ে যে নম্বর দেওয়া আছে তা পড়তে পারে না কেউ। কিন্তু কোন্‌ বাক্সটি কে বইছে তা বুঝতে দেরি হয় না এদের একটুও।

এমনি বোঝাবুঝির পালা চলছিল ওদের একটু আগে। নীরবে, নিশ্চিন্তে। হঠাৎ বোধ হয় একজনের একটু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে। আর তারই পরিণাম এই। তর্কাতর্কির পর অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে সাধারণত যা হয় তাই হয়েছে—হাতাহাতি।

ফল রক্তারক্তি।

মিটমাটের পর ওরা সর্দারকে এ কথাও জানিয়েছে, রক্তারক্তি

করলেই বা কী—আছেন ডাক্তার সাব্। বিলকুল সব ঠিক হয়ে যাবে। নান্টুর রক্ত বেরিয়েছিল হাঁড়ি হাঁড়ি—তাই ঠিক হয়ে গেল, আর ওদের তো ওইটুকু। ওদের কথা শুনে আমি তো একেবারে হতবাক্।

কাণ্ডটা এতদূর গড়াত না, যদি-না ওরা সন্ধ্যেবেলা অতিমাত্রায় ছাঙ বা রক্সী খেত। মনে পড়ছে গাঁয়ের কতকগুলো লোককে ওই সময়ে ওই সব জিনিস নিয়ে আমাদের তাঁবুর সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি।

যাক্, ওদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলুম। আর সেই সঙ্গে বকুনিও লাগালুম খুব। জঙ্গলকে দিয়ে সর্দার মারফত একটা আদেশ জারীও করালুম —

ভবিষ্যতে পোর্টাররা যেন খেয়ালখুশি মত ছাঙ্ অথবা রক্সী না খায়, আর গ্রামের লোকেরা তাঁবুর কাছে এসে ওসব জিনিস বিক্রি করবার সুযোগ না পায়।

১৯শে মার্চ ॥ শনিবার

বেরিয়ে পড়লুম সবার সঙ্গে, সকাল সকাল রুগী দেখা শেষ করে। পোর্টাররা সব আগে আগে চলেছে—মিছিল করে।

গত রাত্রের কথা ওদের এখন আর মনে নেই। কাল যে দুজন মারপিট করেছিল আজ দেখছি তারা পরম বন্ধু। গল্প করতে করতে ওরা দুজনে চলেছে, পাশাপাশি। পুরনো ক্ষততে খোঁচা দেবার মত নিকৃষ্ট মন ওদের কারও নয়। সামান্য কারণে যেমন ওদের কলহ হয় তেমনি সামান্যতে তা মিটেও যায়। পরস্পরের মধুর সম্পর্কে তাই ওদের আঁচড় পড়ে না কখনও।

চলতে চলতে জঙ্গল খেয়ালের মাথায় আমায় জিজ্ঞেস করল,

'আচ্ছা বলতো কোন্ দলে মজাটা বেশী। ও-দলে, না আমাদের দলে ?'

—দেখ, প্রথম দলে ব্যাপার হচ্ছে যেন মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রদের পরিভ্রমণ। সেখানে নিয়মশৃঙ্খলার কড়াকড়ি পায়ে পায়ে বেজে ওঠে। তাই ভয়ও আছে অসাবধানে পা ফেলার। কিন্তু এ-দলে সে সবের বালাই নেই। এটা বাঁধন-ছেঁড়া ছাত্রদেরই দল—স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানে নিজেরাই নিজেদের নেতা। তাই দায়িত্ব প্রত্যেকের। যে যতটা বহন করতে পারে আর-কী।

জঙ্গল কথাটার খুবই তারিফ করল।

প্রতিদিনের মত আজও গাম্বু সকলের আগে একলাই বেরিয়ে গেছে। ট্রানজিস্টর সেটটা ওর সঙ্গের সাথী। সর্বদাই গান শোনা আর শোনানো ওর বাতিক। রেডিওর গান শুনতে শুনতে ও বেশ ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে। আর হবারই কথা।

ও সবেমাত্র বিয়ে করে এসেছে। সুন্দর একখানা বিরহ-কাতর মুখকে ও নিশ্চয়ই ওর অবসরক্ষণে মানসপটে লালন করবার চেষ্টা করে।

গাম্বু মূল আরোহীদের মধ্যে একজন। আগেও দেখেছি ওকে। ও তখন ছিল ঠিক রেসের ঘোড়া। সবসময়ই প্রাণপ্রাচুর্যে যেন টগ্‌বগ্ করছে। কিন্তু এখন ও অনেক শান্ত, অনেক সংযত। চিন্তাশীলও বটে। সংসার পেতেছে কিনা।

বিয়ের পর সব মানুষেরই বোধ হয় এমনই পরিবর্তন হয়!

সেদিন ওর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। কথায় কথায় ওর বউ সীতার কথাও হল। ওকে উৎসাহিত করতে বলেছিলুম,—সীতা আমাদের দেশেরই মেয়ে আর এই মেয়েরাই একদিন প্রাণপ্রিয় স্বামীকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দিত। গাম্বু, তুমি এভারেস্ট-শীর্ষ অভিযানে সফল হলে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী যে খুশী হবে সে তোমার সীতা। এ কথাটা মনে রেখো।

গাম্বুর মুখে এক ঝলক রক্ত ঢেউ তুলেছিল। নব-পরিণীতা স্ত্রীর মধুস্মৃতিতে হয়তো !

থাক্ সে কথা।

এ ক'দিন দেখছি গাম্বুকে একটা নতুন নেশায় পেয়েছে। রোজ ও একলা বেরিয়ে যায় দল ছেড়ে। বেশ কিছু দূরে। ঘুরতে ঘুরতে একটা জমকালো জায়গা বেছে নেয়। তারপর মৌজ করে বসে পড়ে সেখানে। ফুল ভল্যুমে চালিয়ে দেয় ওর ট্রানজিস্টর সেটটা। গান অথবা বাজনাবাদ্যি শুনে আশপাশের প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে। কখনও-না-দেখা এই অত্যাশ্চর্য বস্তুটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওরা। আর গাম্বুর আত্মপ্রসাদের সীমা থাকে না। কত বুদ্ধি খেলিয়েই না এই দৃশ্যের উদ্ভাবন করেছে ও! এমনি ভাব দেখায় অন্যকে।

এই সময়টিতে ও আবার ইংরেজী ছাড়া আর কোন ভাষায় কথা বলে না। কারণ ওর ধারণা তাতে নিজেকে আরও বেশী আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। আমরা হয়তো এমনি কোন মুহূর্তে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি ওকে কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে, ও তখন সকলকে শোনাবার জন্যে একবার আমাদের গম্ভীর গলায় ডাকবে, 'হ্যালো ডক্টর, হ্যালো জাঙ্গল, হোয়াই ডোন্‌চ্ ইউ লিস্‌ন্ দিস্ বিউটিফুল সঙ্গ্ অব দিস রেডিও ফর এ হোয়াইল ?'

আমরা ওকে উপেক্ষা করে যেই 'থ্যাঙ্কস্' দিয়ে চলে যাবার উপক্রম করবো ও তখন মাথার টুপিটা ঠিক করতে করতে ঠাণ্ডা গলায় বলবে, 'ফুল্‌স্, ইউ ডোণ্ট নো হোয়াট ইউ আর মিসিং।'

গ্রামবাসীরা তখন ওর দিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকাবে আর ও-ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই নীরব শ্রদ্ধাকে উপভোগ করতে থাকবে।

তা করুক, আমাদের আপত্তি নেই। আহা, বেচারী বিরহী প্রিয় !

একভাবে বেশ কিছুক্ষণ ওঠা-নামার পর এবার আমরা পৌঁছলুম দুধকোশী নদীর ধারে।

খরস্রোতা নদী। কৃষ্ণকালো তার জল।

কে জানে কোন্ অভিমানে গিরিমাতার কোল ছেড়ে পাগলিনীর মত ছুটে চলেছে ও দূর কোন্ পরবাসে—কে আর তার খোঁজ রাখে!

নদীটা পার হতে হবে।

সামনে একটা দড়ির মত লম্বা সরু ব্রীজ। শরীরটা ওর এত শীর্ণ যে ওর গা বেয়ে পাশাপাশি দুজন চলতে পারে না। অনেকদিন জরাগ্রস্ত বলে খুবই অপলকা বোধ হচ্ছে।

পা ফেলছি আর ভাবছি—এই বুঝি গেল···গেল।

কিন্তু শেরপা, পোর্টার এমনকি শেরপানীরাও দেখছি এসব ব্যাপারে খুব পটু। নির্ভাবনায় বোঝা নিয়ে একে একে ওরা ঠিক পার হয়ে যাচ্ছে ওটা। যেন কিছুই নয়!

যা হোক, আমাদের নিয়েও কোন অঘটন ঘটল না। সকলেই ধীরে সুস্থে কোনপ্রকারে পুলটা পার হলুম। মাঝপথে জঙ্গলের পা-টা যা একটু পিছলে গিয়েছিল, সেটা এমন কিছু নয়। রাওয়ের কিন্তু তা চোখ এড়ায়নি। ও এতক্ষণ মুখ বুজে ছিল। এবার মাটিতে পা দিয়ে নিজেকে নিরাপদ জেনে বলল, 'খুব বেঁচে গেছ যাহোক। আর-একটু হলে দুধকোশী দুধভাত খাইয়ে ছেড়েছিল।'

—সে আর বলতে? জঙ্গল ওর মন্তব্যে সায় দিল।

ক্যাম্পে এসে পৌঁছতে একটা বেজে গেল। এ গ্রামটার নাম 'জুবিং' (Jubing)। বিকেলে আমরা বেশ একটা মনোরম জায়গা বেছে নিয়ে বসেছি। জঙ্গল, দানাম, রাও সকলেই আছে।

মনের আনন্দে জঙ্গল গাইছে। একটার পর একটা গান ও গেয়ে চলেছে, আর আমরা তাল দিচ্ছি বেতালার মত সমানে। অবশ্য দোষ আমাদের নয়, যেমন গান তেমন তো তার তাল হবে! তা

বলে আমি এ কথাও প্রমাণ করতে বসিনি যে আমরাও খুব বড়দরের তালিমদার।

দূরে একটা গাছের গোড়ায় ঝুরা, লছমী, লামু ও আরও কিছু শেরপানী জটলা করে বসেছে। হাসছে ওরা সময় সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে জঙ্গলের গান শুনে।

কিন্তু জঙ্গল সকলের উপনায়ক। তাই বুঝি ওর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

নির্বিকারভাবে ও গান চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে আসরটা বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। এমন সময় রাজু একটু কুণ্ঠিতভাবে এসে বসল আমার কাছ থেকে একটু তফাতে।

জঙ্গলের গান শেষ হলে রাজুকে একখানা গাইতে বললুম। প্রথমটা একটু গররাজী হয়ে ও লাজুকচোখে ঝুরার দিকে একবার চেয়ে গান শুরু করল। ভরাট গলা ওর। সুন্দর গাইল ও গানখানা। গান শেষ হতে-না-হতে জঙ্গল একেবারে লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'আর-একখানা হোক।'

রাজুর এই বিশেষ গুণটির সঙ্গে বোধ হয় ঝুরার পরিচয় ছিল না। তাই ওর দিকে আর একবার চেয়ে দেখলুম। আনন্দে রোমান্সে ওর মুখ দৃপ্ত হয়ে উঠেছে। ও যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না। বান্ধবীদের এক-একজনকে ও নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে কী যেন বলছে—আর তার জবাবের প্রতীক্ষা না করে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠছে।

সব জড়িয়ে বেশ লাগছে এই সহজ খুশিমধুর পরিবেশটা। একবার রাজুর দিকে চাইলুম। এ মুহূর্তটিতে ও যেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। তন্ময় হয়ে আছে ও গানের মধ্যে। চোখ দুটি বুজে ও যেন সংগীত-কলাদেবীর পায়ে উজাড় করে দিতে চাইছে সুরের এক-একটি মূর্ছনায় আপন অন্তরের সমস্ত রূপ-রস-মাধুর্য।

গান শেষ করে রাজু চলে গেল। ফিরেও চাইল না ও একটিবারের জন্যে ঝুরার দিকে।

এর পর আসর ভেঙে গেল। জঙ্গল, রাওরা এগিয়ে গেল, লছমী, লামুও উঠে পড়ল। ঝুরা সহসা একটা কথা মনে পড়ে গেছে এই ভাবে বান্ধবীদের বলল, তোরা এগো, ডাক্তার সাব্‌কে একটা কথা বলে এখুনি আসছি। ফিরল ও আমার দিকে। বুঝলুম, রাজুর পিণ্ডি চট্‌কাতে ও আসছে। আক্রমণটা এখন কী রকমভাবে হতে পারে তারই একটা কিনারা খুঁজছিলুম মনে মনে।

—খুব ভাল লেগেছে ওর গান আপনার, নয়? ঝুরা উদ্ধতভাবে জিজ্ঞেস করল।

এবার আমার অগ্নিপরীক্ষা।

প্রশংসা করব না নিন্দে করব, বুঝতে পারছি না ওর মুখ দেখে। তাই বেকুবের মত হাসতে লাগলুম। ও-ই কিন্তু পথ দেখালো।

মুখটা বেঁকিয়ে নাকটা কুঁচকে ও বলল, 'আমার কিন্তু মোটে ভাল লাগেনি। বিশ্রী লাগছিল বসে থাকতে। কিন্তু উঠে তো যাওয়া যায় না। তাতে অপমান করা হয়। আপনারাও হয়তো এর জন্যে পরে আমায় দুষতেন। তাই বাধ্য হয়ে—'

—ঠিক করেছ। সুরুচির পরিচয় দিয়েছ। আমারও কী রকম যেন ওর গানগুলো—

সায় দিতে যাচ্ছিলুম ওর কথায়।

—থাক্, থাক্, খুব হয়েছে। হা-হা করে হাসতে হাসতে খুব তো ওর পিঠ চাপড়াচ্ছিলেন। রাগে দুঃখে এক রকম মুখ ভেঙচে ও আমায় কথাগুলো বলল। কাঁদো-কাঁদো ওর গলা।

সন্দেহ করল নাকি ও আমায়?

পাকা অভিনেতার ভূমিকায় নামলুম এবার আমি।

চোখটাকে বেশ ভাবালু করে বিরসবদনে প্রচণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললুম, 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! কথায় কথায় যখন এত সন্দেহ, তখন—'

আর-কিছু বলতে হল না।

ঝুরা একেবারে গলে জল হয়ে গেল। ভয়ও বোধ হয় একটু পেয়েছে আমার গম্ভীর মুখ দেখে। আমতা-আমতা করে তাই বলতে লাগল, 'আমি কি আপনাকে সন্দেহের কোন কথা বলেছি নাকি··· বাঃ রে!'

চুপ করে রইলুম। ও ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলে আমার মন ভেজাতে লাগল। বড় ভাল লাগছিল ওর এই অসহায় ভাবটা। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাই উপভোগ করছিলুম।

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আর নয়।

এবার হয়তো ও কেঁদে ফেলবে। অভিমানের রূপটা ঝেড়ে ফেলে তাই রাগের মুখোশ পরে বললুম, 'রাজুটাকে আমি বিনয়ী বলেই জানতুম। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙেছে।' একটু থেমে ঝুরার গাত্রদাহের মূল কারণটাকে এবার নাড়া দিয়ে বললুম, 'কী রকম চলে গেল, দেখেছ?'

—যাবে না! ঝুরার আবার সেই আগের মূর্তি।—দাম্ভিক কি না! হাড়বজ্জাত ওই ধরনের মানুষগুলো, জানবেন।

—আমি তখন তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি, গানে তোমার একটুও মন নেই।

কাজ হল না। ঝুরা চুপ করে রইল।

কথার মোড় ঘোরাতে তাই এবার একটা মিথ্যের অবতারণা করলুম।

—রাজু আজ অনেকবার তোমার সম্বন্ধে আমায় একটা কথা বলছিল।

—কী! কী!—হঠাৎ যেন ঝড় উঠল ঝুরার বুকে। ঔৎসুক্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল ও।

—বলছিল···থাক্‌গে তোমার আর জেনে কাজ নেই। তুমি যে-রকম চটা ওর ওপর। হয়তো এখ্‌খুনি গিয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি বাধাবে!
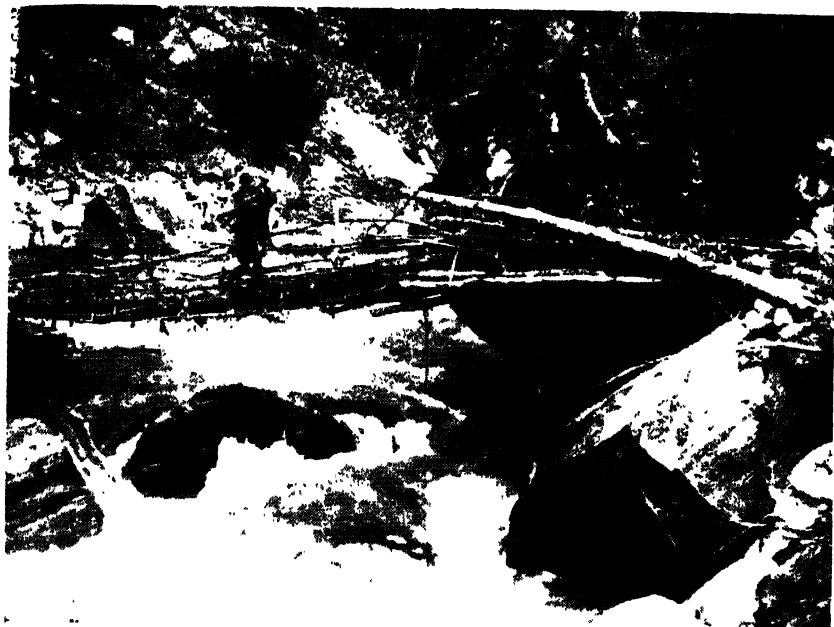
খরস্রোতা পেরুর বুকে নড়বড়ে বাঁশের সেতু

কমলা নদী পার

'যৌবনমদে মত্তা'

'লয়ে রশারশি করি কশাকশি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধি'

—না না, বলুন না। সে ভয় নেই আপনার।

—ঠিক ?

—ঠিক।

—রাজু বলছিল তোমাকে নাকি আজ ফুলের সাজে অপূর্ব মানিয়েছে।

—ধ্যেৎ।—লাল হয়ে উঠল ঝুরা।

—আরও বলছিল, তোমার মত সুন্দরী নাকি ও জীবনে খুব কমই দেখেছে।

—যান্, আমি চললুম।

বলল বটে, কিন্তু গেল না। আমি চুপ করে গেলুম। ঘেঁষে এল ও আরও কাছে। তারপর বিগলিত চিত্তে বলতে লাগল, 'রাজুটা একটা পাগল। শিল্পী কি-না। ওদের ওই একটা মস্ত দোষ, সব ব্যাপারেই বড় উদাসীন। কিন্তু মনটা জানবেন কাচের মত সাদা।…' দূর থেকে ট্রান্‌জিস্টর সেট হাতে গাম্বুকে আসতে দেখে ঝুরা আবার ফিসফিস করে বলল, 'যাই এখন। অনেক কথা আছে, পরে হবে। সকলের সামনে সব কথা তো আর বলা যায় না।'

প্রথম দলে থাকাকালীন সন্ধ্যের দিকে তাসটা চলত পুরোমাত্রায়। কুমার, কোলী, মিশ্র এ ব্যাপারে ছিল ভীষণ উৎসাহী। আনন্দে উত্তেজনায় কখন ডিনারের সময় পার হয়ে যেত বুঝতেই পারতুম না। মধ্যে মধ্যে লীডারকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে হত। লজ্জা লাগত তখন বড়।

এছাড়া 'লেগ-পুল' করা হত সোনাম, সোহন, কেকীর সঙ্গে। সেও এক মজার ব্যাপার। কিছু না পেলে রাজেন্দ্রবিক্রমের টেপ-রেকর্ড তো ছিলই। সব জড়িয়ে সময়টা কাটত বেশ। এ দলে এসে অবধি সে সবগুলো মিস করতে হচ্ছে। তবে তার জন্যে খুব কিছু যে একটা আফসোস হচ্ছে তা নয়। জঙ্গল একাই একশো। ও সব

সময় স্বতঃস্ফূর্ত। একঘেয়েমির মধ্যেও ও হচ্ছে মূর্তিমান প্রেরণা। কিছু-না-কিছু একটাতে ও আমাদের মাতিয়ে রাখবে ঠিকই সব সময়ে।

রাত গড়িয়ে যাচ্ছে। তন্দ্রাটা সবে মাত্র এসেছে। এমন সময় কার যেন কোমল মৃদু ডাকে জেগে উঠলুম। দুটি কথা শুধু—ডাক্তার সাব্, ডাক্তার সাব্!

বাইরে এসে দেখি, লামু অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে।

—কী হয়েছে লামু? উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করি।

—শিগ্গির একবার চলুন। লছমীদি কেমন যেন করছে। তাড়াতাড়ি গেলুম ওর সঙ্গে।

সদ্য-ঝরে-পড়া একরাশ ফুলের মত লছমী লুটিয়ে রয়েছে মাটির ওপরে। পরীক্ষা করে দেখলুম তেমন কিছু নয়। কোন কিছু উত্তেজনার এ একটা আকস্মিক পরিণাম মাত্র। এখুনি সেরে যাবে।

লামু আমার কথামত ওর শুশ্রূষা করতে লাগল।

একটু পরেই লছমী চোখ চাইল।

আমায় দেখে ও ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'লামু বোধ হয় আপনাকে ডেকে এনেছে? পাগলী ওটা। ছি-ছি, আপনার কত কষ্ট হল বলুন তো?'

—তা না হয় হল। কিন্তু তুমিই বা হঠাৎ এমন হলে কেন? আবার টিপ্পনি কেটে বললুম—স্মৃতি মন্থন নিশ্চয়ই করছিলে আগের মত!

লজ্জিত লছমী হেসে চুপ করে রইল। আমিও আর দ্বিতীয়বার ওকে কিছু বলবার জন্যে জোর করলুম না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পর ও নিজেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভাববার আর কী-ই বা আছে বলুন? যেমন কপাল নিয়ে এসেছি তার ফলভোগও তো আমায় তেমনই করতে হবে।'

একটু থেমে মলিন মুখটাকে ও আরও মলিন করে বলতে লাগল, 'মাকে ভাল করে চেনবার আগেই মা ইহলোক ছেড়ে চলে গেল। বাবার ইচ্ছেয় আবার নতুন-মা এল। আর সেই থেকেই জীবনটা

আমার প্রহসনে ভরে গেল। তখন ছোট ছিলুম, বুঝতুম না কিছু। কিন্তু যখন বুঝতে শিখলুম তখন দেখলুম, একটা পোষা জানোয়ারও আমার চেয়ে নতুন মায়ের আদর পায় বেশী। গণ্ডা গণ্ডা তার ছেলেমেয়ে। প্রতিপদে তাদের মন যুগিয়ে চলা আমার পক্ষে এক-এক সময় অসাধ্য হয়ে উঠত। আর তখুনি বিপত্তি বাড়ত বেশী। যে যেমন খুশি আমায় মার-ধর করত। আর আমায় তা মুখ বুজে সহ্য করতে হত।'

—তা তোমার বাবা এসব কিছু জানত না?

—জানত। কিন্তু প্রতিকার কিছু করতে পারবে না জেনে চুপ করে থাকত।

—তারপর?

—তারপর শুরু হল দুর্ভাগ্যের আর-এক নতুন পর্ব। নতুন-মা আমার বিয়ে দিলেন এক মাতাল চরিত্রহীনের সঙ্গে। সমস্ত দিন হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে আমি যা রোজগার করে আনতুম সে তা ছিনিয়ে নিয়ে জুয়া খেলে আর মদভাঙ্ খেয়ে উড়িয়ে দিত। কোন রকম ওজর-আপত্তির ধার ধারত না সে।

—তুমি তো ওকে ত্যাগ করতে পারতে? আর সে নিয়ম তো তোমাদের সমাজে চালু আছে। বালিশের তলায় আস্ত একটা সুপুরি রেখে দিলেই তো শুনেছি মুক্তি পাওয়া যায় স্ত্রীত্বের অভিশাপ থেকে।

—তা যায়। কিন্তু তারও তো একটা অনুকূল অবস্থার দরকার। তাই সে সুযোগ না পেয়ে আত্মহত্যা করব স্থির করেছিলুম। কিন্তু ঠিক এই সময়ে অন্য একটা সুযোগ মিলল পরিত্রাণ পাবার। কী করে জানি না। একটা পরিচিত দলের সঙ্গে বর্মায় চলে গেলুম। আর সেখানে যেতে দুর্গতির যেটুকু বাকী ছিল তাও সুদে আসলে আদায় করে নিল আমার নিষ্ঠুর নিয়তি।

কাঁদতে লাগল লছমী।

একটু সামলে আবার বলতে লাগল, 'যাদের সঙ্গে গেলুম তারা

কোথায় ছিটকে পড়ল জানি না। আমার এই অসহায় অবস্থায় তখন আশ্রয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দুজন প্রতারক আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে তুলল একটা খারাপ জায়গায়। মেয়েছেলের যা সম্বল—সেই দেহ আর রূপ ভাঙিয়ে জীবনধারণ করবার মত আমার কিছু ছিল কি না জানি না, তবে স্থানমাহাত্ম্য বুঝতে পেরে ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করতে লাগলুম। কিন্তু মুক্তির পথ পেলুম না।···

'তারপর এল যুদ্ধ। নরকবাস থেকে রেহাই মিলবে ভেবেছিলুম। কিন্তু কে জানত শত্রুদের হাতে আর-এক নরক-যন্ত্রণায় আমায় মৃত্যুর প্রহর গুণতে হবে! সারা দুনিয়াটার ওপর তখন অপরিসীম ঘৃণায় আমার মন বিষিয়ে উঠেছিল।···

'ভাবতুম, কেন একটা মহামারী আসে না—একটা ভূমিকম্প, কি একটা প্লাবন! জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না কেন এই পৃথিবীর মানুষগুলোকে? ধারণা হয়েছিল ভালবাসা মায়ামমতা এগুলো শুধু কথার কথা। এগুলোর কোন অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাসই হত না। সময় সময় নিজের লাঞ্ছিত জীবনটার কথা যখন ভাবতুম তখন ঘৃণায় থুৎকার দিতুম সমস্ত মনুষ্য-সমাজের ওপর। কিন্তু সেই অসহ্য মর্মদাহের অবসান হল সেদিন, যেদিন ও (লছমীর স্বামী) আমায় অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করল। দেখলুম, কত দরদ থাকতে পারে একটা মানুষের বুকের গভীরে, কত প্রীতি ভালবাসা থাকতে পারে একটা মানুষের চোখের আলোয়। নতুন প্রভাত হল সেদিন আমার জীবনে। কিন্তু তা-র-প-র···'

দীর্ঘশ্বাসে ওর ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেল।

চুপ করে ছিলুম। বজ্রাহতের মত। চুপ করেই রইলুম।

ওর আরও যদি কিছু বলবার থাকে ও বলুক। অন্তরের বোঝা হালকা হয়ে যাক এই রকম প্রকাশের অবকাশে। ও সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে উঠুক পরস্পরের আন্তরিকতায়। ওর বিষণ্ণতা এতে

কমবে বই বাড়বে না। কিন্তু ও সেই যে মাথা হেঁট করল আর তুলল না কিছুতেই।

ভাবলুম, যে ফুল না ফুটতেই ধরণীতে ঝরে গেছে, যে নদী দীর্ঘ মরুপথে তার প্রবাহ হারিয়েছে, তারাও তো হারিয়ে যায়নি, জানি। বিশ্ববন্দিত কবি কি মিথ্যে বলেছেন,—

"দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।"

তবে…তবে তো লছমীর জীবনস্রোতও হারিয়ে যায়নি। যায়নি তার কারণ, হারিয়ে যেতে পারে না বলেই। হোক ব্যর্থ, তবু দুর্লভ জীবন তার! উল্লাসে চিৎকার করে কী যেন বলতে গেলুম ওকে! বলতে পারলুম না। ওর ওপর অপরিসীম মমতায় আমার বুক ভরে উঠল।

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে শুধু ওকে শুয়ে পড়তে বললুম। লামু ওকে উঠিয়ে নিয়ে গেল তাঁবুর ভেতরে।

চলে এলুম নিজের ছাউনির নীচে। রাতের আশ্রয়ে।

শুলুম। কিন্তু ঘুম এল না সহজে।

লছমীর নারীজীবনের প্রথম প্রেম মুক্ত বিহঙ্গের মত পাখা মেলার আগেই বাণবিদ্ধ হয়েছে ওর রুগ্ন দরদী উদার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে। তাই তো ওর অনুশোচনা এত গভীর, এত মর্মস্পর্শী। তাই তো ও হয়ে উঠেছে রহস্যময়ী। ও সান্ত্বনার জন্যে আশ্রয় খুঁজছে। কিন্তু কেউ-ই ওকে পরিতৃপ্ত করতে পারছে না। কারণ ওর ছন্নছাড়া জীবনটাকে ঘিরে রয়েছে অনেক নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা, অনেক মর্মন্তুদ আঘাত, অনেক অস্পষ্ট জিজ্ঞাসা! শুধু কথার অলঙ্কারে যার সমাধান হয় না।

ও এখন নিজেই নিজের যথার্থ নিয়ন্ত্রী। ওর অন্তর্দাহী বেদনার উপশমের পথ ওকেই খুঁজে নিতে হবে। সংসারে ওর মত ক'জন ভাগ্যের সঙ্গে এমন নিয়তসংগ্রামে লিপ্ত আছে! ক'জন ওর মত সহনশীলা! ও যদি এ অবস্থাটাকে কোনরকমে কাটিয়ে উঠতে পারে

তা হলে ও একদিন জীবনের অন্ত অর্থ খুঁজে পেয়ে মহিয়সী হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই।

সতী সাবিত্রী সীতার দেশ এই ভারতবর্ষ। কে বলতে পারে, লছমীর মধ্যে তাদেরই কেউ লুকিয়ে নেই?

২০শে মার্চ ॥ রবিবার

আজকাল পোর্টারদের আর ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করতে হয় না। আপন গরজেই ওরা ভোরে ভোরে আসে। তারপর মাল তুলে নিয়ে চলতে শুরু করে। ওদের চেঁচামেচিতে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। আমরাও তাই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিতে পারি।

আজও রুগীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। সময় বেশী ব্যয় করতে হল না। তাই সদলবলে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারলুম সকাল-সকাল।

দীর্ঘ ঢালু পথ সামনে।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমরা নেমে চলেছি। পোর্টাররা এ পথটা অতিক্রম করে এখন চড়াই বেয়ে উঠছে তাও দেখতে পাচ্ছি। দূর থেকে দৃশ্যটা ভারি মজার লাগছে। আমাদেরও যেতে হবে ওই চড়াই পথে। নামতে যত না কষ্ট হয়, উঠতে কষ্ট হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। দম বন্ধ হয়ে আসে, কোমর টনটন করে ওঠে। বিরক্তি লাগে সময় সময়। কিন্তু উপায় কী?

লক্ষ্যকে স্থির রেখে চলতেই হবে ঠিকভাবে। নইলে বিপদ।

সুখের কথা, এ কদিনের পথ চলায় মেম্বার কিংবা পোর্টারদের শরীরের দৌর্বল্য প্রকাশ তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় দেখা যায়নি। সকলেরই বেশ তাজা মন আর সুস্থ শরীর রয়েছে। পরিধানের বস্ত্র থেকে পায়ের জুতোটি পর্যন্ত সকলেরই সজাগ সতর্কতা।

এটা সম্ভব হয়েছে দলের নিয়ম-শাসনে। তা ফোস্কা বা ওই ধরনের মারাত্মক কিছু কাউকে এ পর্যন্ত পীড়া দেয়নি।

এখানেও চারদিকে ম্যাগনোলিয়া আর রডোডেনড্রনের বন। মনুষ্যসমাজ থেকে বাইরে প্রকৃতির মধ্যে এদের কী বাড়-বাড়ন্ত! কী পরিপুষ্টতা! উপেক্ষিত অনাদৃত হয়ে এরা পড়ে রয়েছে এই দুর্গম গিরিপথে। তবু এদের কী বিস্ময়কর সৌন্দর্য! কী অহেতুক অজস্রতা!

যত পার তোলো—কেউ বলবার নেই, কেউ কইবার নেই। যত পার ছেঁড়ো—কেউ রাগবার নেই, কেউ তাড়াবার নেই। আগেই বলেছি, রডোডেনড্রন গাছগুলো ক্রমশ যেন আকারে ছোট হয়ে আসছে ভূভাগের উচ্চতাবৃদ্ধির জন্যে আর সেই সঙ্গে ফুলগুলোর রঙও পালটে ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে।

তবু, কত সুন্দর যে দেখতে লাগছে ওগুলোকে!

তাড়াতাড়ি চলে চড়াই পথে পোর্টারদের আমরা ধরে ফেললুম। এখন ওদের ঠিক পেছন পেছন চলেছি আমরা। একটু দূরে চলেছে লছমী, লামু, ঝুরা। ওদের একটু তফাতে রাজু একজন পোর্টার বন্ধুর সঙ্গে কী যেন সব জরুরী কথা কইছে। তাই বোধ হয় ওদের দুজনকে গম্ভীর দেখাচ্ছে।

মাঝে মাঝে ঝুরার চোখটা সেই দিকে যে আটকে যাচ্ছে, তা আমার বুঝে উঠতে বেগ পেতে হচ্ছে না।

লছমী এখন যেন এক আলাদা প্রকৃতির। কাল রাতে যে নিদারুণ মনোবেদনায় ছটফট করছিল আজ সকালে সে স্বতোৎসারিত আনন্দোচ্ছ্বাসে বিভোর। চেনাই যায় না কালকের মেয়েটিকে আজকের এই সময়টিতে।

পৃথিবীটা কি সত্যিই বিরাট এক রঙ্গমঞ্চ? যে যেমনটি অভিনয় করে যেতে পারে তার তেমনটি কৃতিত্ব। অথবা হয়তো আমারই বা কোথাও বোঝবার ভুল হচ্ছে। কে জানে!

প্রায় দেড় ঘণ্টা একনাগাড়ে ওঠার পর আমরা আবার একটা পাস-এর নিকটবর্তী হলুম। দৃষ্টিগোচর হল আগের মতই কতকগুলো প্রেয়ার-ফ্লাগ, প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ—বৌদ্ধপ্রভাবের সেই একই প্রকার জাজ্জ্বল্য নিদর্শন। কতকগুলো কুঁড়েঘরও চোখে পড়ল। ওখানে একটা ছোটখাট চায়ের দোকানও রয়েছে দেখলুম।

পোর্টাররা কেউ কেউ চা কিনে খেল। চা ছাড়া আরও একটি জিনিস এখানে বিক্রি হয়। সেটি 'ছাঙ'—যে অমৃতে পোর্টারদের কখনও অরুচি নেই! আগেও সে কথা বলেছি।

তবু ওটা ওরা আর আমাদের সামনে এই প্রকাশ্য দিবালোকে কিনে খেতে সাহস করল না বোধ হয়। তবে ও জিনিসটার কেনাবেচা যে কিছু হল তা টের পেলুম ঠিকই।

আরও কিছু এগিয়ে আমরা একটা সুন্দর খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। এও একটা মনে রাখবার মত জায়গা। চারদিকের দৃশ্যাবলী কী যেন এক অনবদ্য সৌন্দর্যে রহস্যঘন। চোখ ফেরানো যায় না।

দূরে—বহুদূরে ওই দেখা যাচ্ছে স্ফটিকশুভ্র তুষারে আবৃত শৃঙ্গমালা। চেনা যায় না ঠিক সবগুলোকে আলাদা আলাদা করে।

ওর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট চৌ-ঐ শৃঙ্গ। খালি চোখে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না মোটেই। দু বছর আগে ওই শৃঙ্গটির অভিযানে গিয়েছিলেন হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারীং ইনস্টিটিউটের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মেজর জয়াল।

ফিরে আসা তাঁর হয়নি। মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শ তাঁর বলিষ্ঠ কর্মজীবনকে কোন্ এক অভিশপ্ত মুহূর্তে স্তম্ভিত করে দিয়েছে চিরদিনের জন্যে।

এক সময় এসে পৌছলুম খুম্বু ডিস্ট্রিক্টে। রূপে যোলুর সঙ্গে এর কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য রয়েছে। তবে ওখানে দেখে এসেছি চাষবাসের বৈশিষ্ট্য ওখানকার অধিবাসীদের জমি পৃথকীকরণে, চমৎকার রুচিবোধে

ও কর্মনৈপুণ্যে। সেখানে চোখ চাইলেই বোঝা যায় মানুষের হাতের অদৃশ্য স্পর্শ মাটির বুকে কোথাও না কোথাও রয়েছে।

কিন্তু খুম্বু অঞ্চলে সেটির বড় অভাব।

দেখলেই মনে হয় পরিত্যক্ত অনাদৃত জায়গাটা। মানুষের স্নেহ-স্পর্শের তেমন কোন চিহ্ন নেই কোথাও। এখানে প্রকৃতি আপন খেয়ালে—রূপে, রসে, গন্ধে যেটুকু করে রেখেছে সেইটুকুই যা এর বিশেষত্ব।

খুম্বুর কথা এখন থাক্।

দুপুর গড়িয়ে গেল ক্যাম্পে পৌঁছতে।

ক্যাম্পটা করা হয়েছে পুঁইয়ায়—একটা ছোট্ট নদীর তীরে। নদীটার নামের খোঁজ করিনি। তবে ওর আশপাশের শোভা দেখে মজেছি। ও যেন এক চঞ্চলা কিশোরী। লঘুচরণের নূপুরনিক্কণে রুনু রুনু সুর তুলেছে মৃদুমন্দ বাতাসের বুকে।

দু'কূলে তার ম্যাগনোলিয়ার বন। গন্ধে মাতাল চৌদিক।

খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা নির্জন জায়গায় বসে চারিদিক দেখছি আর পাঁচকথা ভাবছি। এমন সময়—

দু'কূল-ছাপা জোয়ারের মত উচ্ছল আনন্দ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল ঝুরা।

ওকে আমার বড় ভয়! কখন কী বলে বসে মুখরা মেয়েটা তার ঠিক কী! মানমর্যাদা আছে তো নিজের।

কোথায় গেল ভাবনা, কোথায় গেল ঝিমোনি ভাব! মুহূর্তে যেন তাজা হয়ে উঠলুম।

ঝুরার কিন্তু অত তলিয়ে দেখার গরজ নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে ও বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলব, কাউকে বলবেন না বলুন!'

—না, না। কী, বল না।

ঝুরা আমায় আর একটু কৌতূহলী করতে ঠাণ্ডাগলায় বলল, 'আপনার আবার যা ঠোঁট-আলগা, বলতে ভয় করে। এক্ষুনি হয়তো পাঁচ-কান করবেন। তখন আমায় মুশকিলে পড়তে হবে।'

আবদারের সুরে বললুম, 'সত্যি বলছি কাউকে বলব না। বল, বল, কী?'

জানি তো কথার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। তবু এ আগ্রহটা দেখাতেই হবে। তা না হলে ওই লাল মুখটা এখুনি কালো হয়ে যাবে। অভিমানে হয়তো ফুলতে থাকবে আমারই সামনে। তা তো আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

অতএব এ অভিনয়টা আমায় করতেই হবে। এতে আমার যত অপরাধই হোক না কেন।

এবার খুশী হয়ে ও বলল, 'রাজু না (ফিক্ করে হাসল) আমায় একটা চক্‌লেট দিতে এসেছিল। আমি নিইনি।'

—ছি, ছি, অন্যায় করেছ। বেচারী কী ভাববে বল তো?

—আর ও যখন কালকে ঝাঁজ দেখিয়ে চলে গেল তখন? আমারও বুঝি রাগ হয় না!

—তা হয়, আর রাগ হয়েছে বলেই তো ওর চক্‌লেট দিতে আসা, এটা কি তুমি—

—আহা, চক্‌লেট দিয়ে ভোলাতে এসেছে—যেন কচি খুকী ঠাওরেছে আমাকে! চুপ করল ও।

এবার সুযোগ বুঝে বেশ ভারী গলা করে বিজ্ঞের মত উপদেশ দিলুম ওকে—'দেখ ঝুরা, মানুষের রাগ হয় সময় সময় মানি। তবে কী জানো, 'তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন'? তোমাকে সে আঘাত করেছে বলে তুমিও কি তাকে প্রতিঘাত করবে? একবারও কি বিচার করে দেখবে না সে যা করল তা ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, বুঝে কি না-বুঝে?'

—আপনি তো সব সময় ওর দিকে জানি।

—ওই তো তোমাদের দোষ। উচিত কথা বললেই রাগ। নাঃ, দেখছি তোমাদের কোন কথায় আর থাকা চলবে না।

আমার কপটতা বিচার করে দেখবার ইচ্ছে বা অবকাশ ঝুরার নেই। তাই আমার অভিমানের মেঘখানা দূর করে দিতে ও সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, বাবা আচ্ছা, অত আর রাগ করতে হবে না আপনাকে। এবার থেকে ও যা দেবে তা নোব, নোব, নোব—হল তো?'

উদ্গত হাসিকে কোনপ্রকারে দমন করে কৃত্রিম খুশির ভাব কণ্ঠে এনে বললুম, 'হ্যাঁ, নেবে। লক্ষ্মী মেয়ের মত।'

মুখ ফিরিয়ে ছিলুম। ও প্রায় লাফাতে লাফাতে বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কাউকে বলবেন না কিন্তু, তা হলে আড়ি।'

—ক্ষেপেছ নাকি! ও-কথা আবার কেউ কাউকে বলে!

কী জ্বালায় পড়েছি আমি!

হিমালয় আমাকে অনেক দিন থেকেই টানে। তাই অনেক সৌভাগ্যের ফলে যখন সুযোগ মিলল, তখন ভেবেছিলুম তার শান্তিময় কোলে কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাবই পাব!

কিন্তু এ কী উৎপরীক্ষা! এ কী মধুর অশান্তি! কোন কালে তো অভিনয় করিনি, কিন্তু এমন অভিনয় আমি করছি কেমন করে! এরা আমাকে পাকা অভিনেতা না করে রেহাই দেবে না দেখছি!

এখুনি ডিস্‌পেন্‌সারি যেতে হবে। আজ রুগীর ঠাসাঠাসি। রুগীর সংখ্যা ইদানীং বেড়ে যাওয়ার মস্ত বড় একটা কারণ হচ্ছে, প্রথম দল ওই সব জায়গা হয়ে যাবার সময় অবশিষ্ট রুগীদের জানিয়ে যায় আমাদের দলের আসবার কথা—আর সেই সঙ্গে এই হতভাগ্য ডাক্তারটির কথাও।

ফলে দূর-দূর অঞ্চল থেকে রুগীরা দল বেঁধে এসে জমায়েত হয়

আমাদের প্রতীক্ষায়। আর সেই কারণে আমরাও আর তাদের নিরাশ করে ফেরাতে পারি না। কোনদিন তাই সকাল পার হয়ে যায় যাত্রা আরম্ভ করতে। কোনদিন বা আবার বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যায় বিশ্রাম নিতে।

এখানে পৌঁছেই একটা চিঠি পেলুম। ওটা ভোরার লেখা। তাতে ব্রিগেডিয়ার জানিয়েছেন, ২১ তারিখে জঙ্গল যেন ডবল মার্চ করে ওঁদের সঙ্গে অ্যাড্‌মিনেস্‌ট্রেটিভ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে সাক্ষাৎ করে।

কাল ২১ তারিখ। ভোরেই জঙ্গলকে বেরিয়ে পড়তে হবে ওঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

সন্ধ্যেবেলা জঙ্গল একটা নতুন খেলা আবিষ্কার করল। যতই হোক্, উপনায়কের উর্বর মাথা তো! খেলাটার নাম দিয়েছে ও 'ওয়্যারলেস মেসেজ'।

হঠাৎ বন্ধুদের মধ্যে ও একজন বিশেষ বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি একজনের মনের খবর চাঁদে পাঠাচ্ছি। আর সেখান থেকে ওটা চলে যাচ্ছে তার স্ত্রীর কাছে। কথাগুলো তার ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না একবার সে মিলিয়ে দেখুক।'

বলেই ও দাঁড়িয়ে উঠল। মুখটাকে গম্ভীর করে ও বলল, 'হ্যালো! হ্যালো! হ্যাঁ, আমি কথা বলছি। তুমি কি— যাক্ বাঁচলুম। শোন, তোমায় ছেড়ে আজ ক'দিনই বা হল আমি এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে কী জান? কত যুগ-যুগান্তর যেন তোমায় আমি দেখিনি। বুকের ভেতরটা তাই যেন কেমন খাবি খাচ্ছে। চোখে সরষেফুল দেখছি সব সময়। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেও ঘুম আসে না চোখে। কেবলই যেন হাতছানি দিচ্ছ তুমি আমায়। পুঁইয়ে-পাওয়ার মত তাই আমি শুকিয়ে যাচ্ছি দিনকে দিন। ভালবাসার ধর্মই বুঝি এই —হ্যা? আচ্ছা, তুমি আমার কথা এমন করে ভাব? ভাবতে ভাবতে তোমার বুক ধড়ফড় করে? মনে হয় না পাকে-চক্রে যদি এটা আমার

অগস্ত্যযাত্রাই হয় তখন তুমি কী করবে? ভেউ ভেউ করে আজীবন কেঁদে কাটাবে—না অন্য কিছু?'

উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে টেন্ট ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। জঙ্গলের গলা আর শোনা গেল না। কিছুক্ষণের জন্যে আমিও ওই স্বতঃস্ফূর্ত হাসির বন্যায় নিজেকে হারিয়ে ফেললুম।

একটু পরে জঙ্গল আবার প্রস্তুত হয়ে উঠল। আবার গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল। একবার গাম্বুর দিকে তির্যকভাবে চেয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

অপ্রতিভের মত গাম্বু হাসতে লাগল।

জঙ্গল বক্তৃতার ঢঙে বলল, 'শোন সব, এবার প্রতিপক্ষের বক্তব্য।'

সকলে চুপ করল। তাঁবুটা আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

হেঁড়ে গলাটাকে মেয়েলী করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে ও বলতে লাগল, 'হ্যালো! হ্যাঁ আমি। তোমার সব কথাই শুনলুম। (একটু থেমে) দেখ, আমি এ যুগের মেয়ে। তোমার বিরহে হা-হুতাশ করবার পাত্রী আমি নই। তুমি চলে যাওয়ার পর দু-একটা দিন আমার কষ্ট হয়েছিল ঠিক, তবে অমন কষ্ট একটা পোষাপাখি উড়ে গেলেও হয়। এখন তাও নেই। দিব্যি আরামে আছি বিশ্বাস করো। ...(গলাটাতে এবার একটু সোহাগ মিশিয়ে) ওগো শুনছ, দেখ, বাঁচা মরা তো আর মানুষের হাত নয়। যদি পিছলে পড়ে অক্কাই পাও তার আগে আমার একটা গতি করে যেয়ো—তোমার বাড়ি-ঘর-দোর যা কিছু সব আমার নামে উইল করে। যা-সব তোমার ভায়েরা। ভয় করে। আমার দুর্ভাবনা এখানেই। উইল যদি না করে মর, তাহলে জেনো মরেও তুমি শান্তি পাবে না। দু বেলা তোমার আমি পিণ্ডি চট্‌কাব, শাপ-শাপান্ত করব—সেই কি ভাল হবে? হ্যাঁগো, মরবার আগে তুমি কি আমায় এমন করেই ভাসিয়ে যাবে! বিধবার চোখের জলে কি ভাবছ ধরণী তখন দ্বিধা হবে না? আর তার মধ্যে চাপা পড়ে তোমার মৃত আত্মা কি দু বেলা ত্রাহি ত্রাহি করবে না?'

ভিক্ষা করছে ঈশ্বরের কাছে—তাদের কথা।'...এই ছিল ওর বক্তব্যের মর্মার্থ।

লছমীকে নিবৃত্ত করতে তবু আমি বলেছিলুম—আমি সাহিত্যিক নই। লিখতে জানি না। এ ছাড়া বাংলা লেখা তুমি পড়বেই বা কী করে?

লছমী ম্লান হেসে বলেছিল, 'নাই-বা পারলুম পড়তে। তবু তো জানব যা বলতে চাই অথচ বলতে পারি না গুছিয়ে, তার সবটুকুই আছে ওই লেখাটির মধ্যে। ওইটেই আমার জীবনবাণী—সর্বজনীন হলেও একান্ত ব্যক্তিগত। কারণ আমিই ওর উৎস। খুব যখন ওটাকে পড়তে ইচ্ছে করবে তখন পড়িয়ে নেব কাউকে দিয়ে। ভুলে যাব যেখানটার মানে, জেনে নেব সেগুলো আবার।'

চিঠিগুলো শেষ করেই তাই লিখতে চেষ্টা করলুম ওর কিছু কথা। মোমবাতির আলো-আঁধারে—নিস্তব্ধতার এই রহস্যঘন সুন্দর অবকাশ —লছমীর বেদনায় একবার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠুক আমার মন। দেখি কিছু বেরোয় কি না? আমি কি এতই অপদার্থ?

ঠাণ্ডাটা আজ বেশ চেপে পড়েছে। হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। পোর্টারদের তাই এখন পাত্তা নেই। অনেক হাঁকা-হাঁকির পর দেখি সব সুড়্‌সুড়্‌ করে আসছে এদিক-সেদিক থেকে। ওদের সঙ্গে দেখি সেই পোর্টারটাও আছে কিছুদিন আগে যার নিউমোনিয়া হয়েছিল। জিজ্ঞেস করলুম খুশী হয়ে, 'কেমন আছ?'

—ভাল আছি। মোট নিয়ে চলতে চাই এখন। বিনীতভাবে সে জানাল।

এত তাড়াতাড়ি ও এতটা উন্নতি করবে ভাবতে পারিনি। তবু ওকে আরও কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিতে বললুম।

•

জঙ্গলরা চলে গেছে—কাল আমরাও যাব প্রথম দলের সঙ্গে একত্রিত হতে। সব এক সঙ্গে যাওয়া হবে তখন।

লোহমানব নয়—একজন লামা

কী মজা! ভাবতেও যেন ভাল লাগছে কথাটা। ও দলে আছে কুমার, কোলী, ভোরা, মিশ্র—সব এক-একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র—আমার বিশিষ্ট বন্ধু—ব্রিজের জুটী। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর ওদের কথা কতবার কতভাবে যে মনে পড়েছে তার আর সংখ্যা নেই।

থাক্ সেকথা। সকালের কাজ সেরে আমরা ব্রেকফাস্টে বসলুম—হালুয়া, চা, ডিম, বিস্কুট। তারপর ধীরে-সুস্থে সাতটা নাগাদ রওনা হলুম পরবর্তী ক্যাম্পের অভিমুখে।

পথ আজ অন্যদিনের তুলনায় অনেক কম। তাই উদ্বিগ্ন হবারও কোন কারণ নেই। চলেছি সব খোস-মেজাজে। প্রায় পা গুনে-গুনে।

একদল ইয়ক চলে গেল আমাদের পথ দিয়ে। রাও-এর আমোদ ধরে না। ও কখনও ইয়ক দেখেনি। এখানে এসেই প্রথম দেখছে। ওর উচ্ছ্বাসকে চরিতার্থ করতে প্রতিবারের মত এবারও কতকগুলো ছবি তুলল।

রাও-এর কানে কানে বললুম, 'এবার আমাদেরও কিছু ছবি তুললে হয় না, কারণ ইয়কের সঙ্গে এখন আমাদের আর বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে বলে তো মনে হয় না। মাথার চুল আর দাড়ির শ্রীবৃদ্ধিতে এখন আমাদের যে দশা হয়েছে তাতে ঠিক ইয়ক না দেখালেও বনমানুষ বলে চিনতে কারও ভুল হবে না!'

হেসে রাও বলল, 'মাইরি, কামানোর শাসন থেকে অব্যাহতি পেয়ে বেটারা কি মারাত্মক হারে বেড়ে চলেছে দেখ। আর দু'দিন বাদে হয়তো মাথায় খোঁপা বাঁধতে হবে। গোঁফে গেরো দিতে হবে, নইলে খেতে বসে হয়তো অসাবধানে গোঁফটাকেই চিবিয়ে খাব কোন্‌দিন।'

কিছুদূর গিয়ে পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা দেখলুম—লাক খোক্‌পা তার নাম। দেখতে এটাকে নাকি ভেড়ার মতন, তাই এর নাম এই রকম। গুহার মুখে মুখ বাড়িয়ে একবার ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করলুম।

গেলুম সাজসরঞ্জাম নিয়ে।

দেখলুম বাইশ-তেইশ বছরের একটা ছেলে অপরূপ সুন্দরী একটা মেয়ের কোলে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। অচৈতন্য হয়ে। ওই মেয়েটি কাঁদছে করুণভাবে।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পাগলিনীর মত ও আমার হাতটা ধরে বলল, 'দেখুন ডাক্তার সাব্, ও মরে গেল নাকি।' ওর করুণ বিলাপধ্বনি জায়গাটাকে যেন এক মর্মান্তিক বেদনায় দুঃসহ করে তুলেছে। তারই ছোঁয়া যেন আমার মনেও এসে লাগল।

মুহূর্তমাত্র। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ছেলেটাকে পরীক্ষা করতে লাগলুম। নিশ্চিত বুঝলুম ওর ভেতরের কোন 'অরগ্যান' ফেটে গেছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু থেকে ও পড়েছে নীচে। এমনটা হওয়া এ অঞ্চলে অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে যতই লাগুক, ও মরবে না। তেমন মারাত্মক কিছু হয়নি।

সাধ্যমত যত্ন নিয়ে ওর চিকিৎসা করলুম। সব শেষ করে যখন ফিরছি, মেয়েটা তখন সামনে এসে দাঁড়াল। আবদারের সুরে বলল আর কিছুক্ষণ থেকে যেতে। বাধ্য হয়েই থাকতে হল।

ইতিমধ্যে রুগীকে আমি পর্যবেক্ষণও করতে লাগলুম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। এক সময় ওর জ্ঞান হল। মেয়েটা তখন থেকে ওর সঙ্গিনীদের নিয়ে আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিল। বিদ্‌ঘুটে নানা জিজ্ঞাসাবাদ ওরা করছিল আমায়—

—আপনার বাড়ি কোথায়?···সেখানে আপনার কে কে আছে? আপনি বিয়ে করেছেন কি?···আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কখনও প্রেমে পড়েছেন কি?

এমনি কত কী! এত দুঃখেও ওরা প্রেম কথাটি উচ্চারণের সময় খিলখিল করে হেসে উঠছিল। আমিও সেই সুযোগে ছেলেটার পরিচয় জেনে নিই। ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটার সম্পর্কের কথা জিজ্ঞেস করাতে ওর সঙ্গিনীরা জানাল ওদের উভয়ের ভালবাসার কথা।

কিছুদিনের মধ্যেই নাকি ওদের বিয়ে হবে। ওরা আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল। বলা হল না। মেয়েটা চিমটি কেটে ওদের থামিয়ে দিল।

এই সময় ওদের চোখ পড়ল জ্ঞান-ফিরে-পাওয়া ছেলেটার দিকে। আর যায় কোথায়! ওরা ঘুরে বসল ওর সঙ্গে গল্প করতে।

নিষেধ করলুম।

ফেরবার পথে ওদের সাবধান করে এলুম কোন রকমেই যেন ওরা ওকে বিরক্ত বা উত্তেজিত না করে। এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব ওকে নিরিবিলি একলাটি থাকতে দেওয়াই ভাল।

সন্ধ্যেবেলা বেশ কিছুক্ষণ হৈ-চৈয়ের পর শেরপা, শেরপানী ও পোর্টাররা সব একে একে চলে গেল। লছমী, ঝুরা, লামুও গেল ওদের সঙ্গে মুখর হাস্যে বিদায় নিয়ে। রয়ে গেল শুধু বুড়ো বাহাদুর। সেই বিয়ে-পাগলা।

আমি ওর দিকে নজর না দিয়ে অন্য কাজে মন দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় ও উঠে এসে নিরাসক্তের ভাব দেখিয়ে বলল, 'জানলেন, লেমোটার সঙ্গে আর আমি কথাই বলি না, আপনি বারণ করা থেকে।'

—ঠিক করেছ।

—ভেবে দেখলুম আপনার কথাই ঠিক। গরজ থাকে ও এসে কথা বলবে। আমার ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী? আর ওর কী-ই বা আছে যে অত ডাঁট দেখায়?

—ঠিকই তো। কথায় বলে না 'নাই দিলেই মাথায় ওঠে!'

—হাঃ, হাঃ, হাঃ। যা বলেছেন। ওষুধ হচ্ছে ওদের মুগুরের ডগা। বাড়াবাড়ি করেছে কি দমাস করে এক-ঘা। বাস্ একেবারে ঠাণ্ডা।

আর নয়।

মনে মনে ভাবলুম—তুমিও তো চাঁদ কম বাড়াবাড়ি করছ না আমার কাছে! কথার তোড় ক্রমেই যেন তোমার বেড়ে যাচ্ছে!

গম্ভীর হবার চেষ্টা করলুম তাই একটা বই খুলে পড়বার অছিলায়।

বাহাদুরের কিন্তু সেদিকে নজর নেই।

ও আরও উল্লসিত হয়ে আপন খেয়ালে মনের কথাটি খুলে বলে ফেলল, 'তবে কী জানেন, কেউ আমার ওপর রাগ করে মুখভার করে থাকুক এ আমি চাই না। এস বাবা, দু দণ্ড খোলা মনে কথা কও। একটু হাসি-তামাশা কর, তারপর যে যার কাজে চলে যাও। চুকে গেল ল্যাঠা! কেউ কারও মানমর্যাদা টেনে কথা না বললেই হল; কারণ যত গোল তো ওই নিয়েই। বলুন কি না?'

ইঙ্গিতটা যে লামুর প্রতি তা বলাই বাহুল্য।

সাড়া দিলুম না। কেবল বইটাতে আরও নিবিষ্ট হবার ভান করলুম।

বাহাদুর কী বুঝলো জানি না, ও আমার কাছে আরও দু' পা সরে এসে খাটো গলায় প্রসঙ্গ পালটে বলল, 'আপনার কাছে আমার একটা মিনতি আছে। কথাটা আপনাকে শুনতেই হবে।'

বইটা মুড়ে রেখে বললুম, 'কী কথা? বল।'

—আপনারা আমায় ক্ষমা করুন সাব্। না-বুঝে যদি কিছু অন্যায় করে থাকি সেদিন, তার কি ক্ষমা নেই? আমার আর কেউই নেই—আপনারাই আমার সব।

কাঁদো-কাঁদো গলা ওর। অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে বললুম, 'সে কী কথা! তা ছাড়া ন্যায়-অন্যায়ের পালা তো সেদিনই চুকে গেছে। আচ্ছা পাগল তো!'

তারপর সাদরে হাত দুটো ধরে ওকে পায়ের কাছ থেকে টেনে তুললুম। আরও কিছু সান্ত্বনার কথা বলে ওকে চাঙ্গা করতে চেষ্টা করলুম।

ও খুশী হয়ে চলে গেল।

বসে আছি একলাটি। শূন্য টেণ্টে।

হঠাৎ মনে একটা সন্দেহ জাগল। বাহাদুর সত্যি কি আমার কাছেই ক্ষমা চেয়ে গেল!···না, লামুর কাছে!···কে জানে!

২২শে মার্চ ॥ মঙ্গলবার

সকালটা আজ ভারি সুন্দর লাগছে। প্রথম দলের সঙ্গে আমরা আর কয়েক ঘণ্টা পরেই গিয়ে মিলব। কুমার, কোলী, মিশ্র, ভগ্নানী, বিক্রম সকলেই সেখানে আছে—আরও আছেন লীডার। সকলেরই সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। জঙ্গলটাও বাদ পড়বে না। লীডারের ডাকে একদিন আগেই ও ভেগেছে আমাদের ছেড়ে। আজ সব একচোট খুব হৈ-চৈ করা যাবে। আবেগ ও উত্তেজনাকে এখন ধরে রাখা দায় হয়েছে। তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করলুম ক্যাম্পের উদ্দেশে। কালকের মত আজও পথটা খুব দীর্ঘ নয়—পোর্টার-সর্দার জানাল। কিন্তু আজ আর আস্তে আস্তে চলতে মন চায় না। কারণ মিলনের আনন্দে মন এখন বিভোর।

দুধকোশী নদীর তীর দিয়ে চলেছি আমরা। কাকলি-কূজনে মুখর চতুর্দিক। ছল্‌ছল্‌ করে বয়ে চলেছে তীব্র গতিতে দুধকোশীর কালো জলধারা। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পিছু পিছু ভেসে যাচ্ছে শুভ্র-নরম তার ফেনাগুলো। মনে পড়ে যাচ্ছে কবির সেই কথাগুলো—নদী যেন বলছে ঃ

> "আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হ'তে
> বিরামবিহীন রাত্রি ও দিন পথ হ'তে আনপথে।
> নিজ বাস হ'ল চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণ পরে
> বাহিরিনু পথে গিরি-পর্বতে—ফিরি নাই আর ঘরে।
> পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিনু গিরি-কন্যার কোলে,
> বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে আসিলাম ছুটে চ'লে।"

চলতে চলতে মাঝে মাঝে নদীটা আমাদের পারাপার হতে হচ্ছে। কারণ নদীর মতই পথটা আমাদের অনেক ঘুরের।

যেদিকেই চোখ পড়ছে সেদিকেই দেখছি এক-একটি মন-মোহন দৃশ্য। কোন্‌টাকে উপেক্ষা করে যাই! আমাদের মত পরদেশী

পথিককে ওরা যেন সব সময়েই হাতছানি দিয়ে বলছে—দেখে যাও, এমনটি আর-কোথাও দেখতে পাবে না। দ্রুত পা চালিয়েও পা যেন আটকে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। মনটাও যেন সেই ফাঁকে পালিয়ে যাচ্ছে কোথায় তা বুঝতে পারছি না কিছু।

আরও কিছুটা চলার পর হঠাৎ আমরা থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলুম—দূরে, বহুদূরে নাম-না-জানা একটি গিরিশৃঙ্গের গা বেয়ে সরু একটা রূপালী রেখার মত দুধকোশী নদীর উদ্দাম স্রোত নেমে আসছে সোজা আমাদের কাছে। দুকূলে তার শ্যামল বনরাজি বহুদূরবিস্তৃত। মেঘলা আকাশ। তারই গায়ে একটি-দুটি পাহাড়ী পাখির অলস ঘোরাফেরা। সব জড়িয়ে বড় অদ্ভুত লাগছে। পটে-আঁকা ছবিও বুঝি হার মানে এ সৌন্দর্যের কাছে।

এই অঞ্চলটার সর্বত্রই রয়েছে একটা-না-একটা মণিওয়াল, চোর্টেন অথবা প্রেয়ার-ফ্লাগ। মণিওয়ালগুলোর গায়ে তিব্বতী ভাষায় খোদাই করা রয়েছে প্রার্থনাবাণী তা আগেই বলেছি। অভ্যাসবশেই এখন আমরা ওগুলোর ডান পাশ দিয়ে যাই সব সময়। স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না কাউকে।

নাম্‌চেবাজারের কিছু আগে আমাদের ক্যাম্প পড়ল প্রায় বেলা বারোটার সময়। কাছেই দুধকোশী আর ভোটেকোশী নদীর সঙ্গম। কাছে-পিঠে সর্বত্রই তুষারের মেলা। পর পর দু দিন ধরে তুষারপাত চলেছে অবিরাম। সুতরাং শুভ্র তুষাররাজ্য গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এখনও আকাশ মেঘলা আর ইলশেগুঁড়ির ধারা নেমে আসছে মাথার ওপর। কেমন যেন বিবশ-করা দিন।

আমরা পথে একটা লোকালয় পেরিয়ে এলুম। জানি না সেখানে লোক বাস করে কি না! ক'টি নিঃঝুম বাড়িঘর দাঁড়িয়ে আছে অত্যন্ত অসহায়ভাবে। তারই একটি বাড়ির দরজায় দেখলুম দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহন, ভোরা আর কোলী। ওরা পোর্টারদের পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছে।

দার্জিলিঙের পোর্টাররা আর এগুতে রাজী নয়। কারণ বরফে চলবার মত জামাজুতো ওদের কিছু নেই।

সামনের ক্যাম্পের সঙ্গে আমাদের ফারাক ছিল মাত্র কয়েক শ' গজ। মধ্যে রয়েছে তুধকোশী নদী। তার ওপর ব্রীজ। আমরা তুপুরের খাওয়ার আয়োজন করছি এমন সময় দেখি ব্রীজ পেরিয়ে আসছেন আমাদের লীডার। আমরা তাঁকে নিয়ে আসতে এগিয়ে যাবার আগেই তিনি আমাদের মধ্যে হাজির হলেন। কুশল প্রশ্ন করলেন আমাদের। এর আগে আমারই সময়মত অস্ত্রোপচারের ফলে একটা পোর্টারের জীবন রক্ষা সম্ভব হয়েছে—তার উল্লেখ করে তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। এ ছাড়া এখানকার বাসিন্দা আর পোর্টারদের চিকিৎসা করছি বলেও তিনি খুশী হয়েছেন, বোঝা গেল তাঁর কথায়। তারপর শুরু করলেন আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা। পরে আমাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া সারলেন এবং মন্তব্য করলেন—'এখন বুঝতে পারছি, সব মেম্বাররা দ্বিতীয় দলে কেন খেতে চায়।' অর্থাৎ ঘুরিয়ে কটাক্ষ করলেন আমাদের। তিনি ফিরে গেলেন তাঁর ক্যাম্পে। আমিও সঙ্গী হয়ে গেলুম।

ইতিমধ্যে পোর্টারদের পাওনা মিটিয়ে ফিরে এল সোহন, ভোরা আর কোলী। ওদের ফিরে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, কারণ কয়েকটা পোর্টার নাকি তাদের সংখ্যা-দেওয়া চাকতি হারিয়ে ফেলেছিল, সুতরাং ভাল করে সন্ধান নিয়ে তবে তাদের পাওনা চুকিয়ে দিতে হয়েছে। সোহনের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন একটা বিরাট কাজ করে এসেছে। আমাদের লীডারের সেদিনকার নির্দেশনামাও পেলুম ওদের কাছে। সেই আদেশের মর্ম হল—

(১) আজ সকাল দশটায় সোহন, ভোরা আর কোলী তুশো পোর্টারের পাওনা মিটিয়ে দেবে।

(২) থিয়ানবুচির দিকে আর অগ্রসর হওয়া চলবে না। (কারণ নতুন পোর্টার না এলে আর এগুনো অসম্ভব।)

(৩) নতুন পোর্টার সংগ্রহ করার জন্যে দুজন শেরপা নামচে-বাজার ও অন্যান্য গ্রামে যাবে।

(৪) জঙ্গলওয়ালা ও তার পাঁচজন সঙ্গীকে ক্যাম্পে ফিরে আসতে হবে। তারা নামচেবাজারে আজ অন্যান্য সঙ্গীদের প্রত্যাশা করছে।

(৫) দ্বিতীয় দলকে আমাদের কাছে আসতে খবর দিতে হবে।

এইবার বোঝা গেল জঙ্গলওয়ালা প্রথম সুযোগেই নামচেবাজারে গিয়ালজেন-গিন্নীর আতিথ্য গ্রহণ করেছে। শ্রীমতী গিয়ালজেন আমাদের দ্বিতীয় পোর্টার-সর্দারের স্ত্রী। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর রাশ-ভারী। পোর্টাররা একে খুব সমীহ করে চলে। নামচেবাজারে গিয়ালজেন-পরিবার বেশ নাম-করা। পয়সাও আছে যথেষ্ট। শ্রীমতী গিয়ালজেন আমাদের দ্বিতীয় দলে সর্দারনী হয়ে যোগদান করে জয়নগর থেকে। মনে পড়ছে শ্রীমতী গিয়ালজেন চলে যাবার সময় আমাদের সকলকেই অনুরোধ জানিয়ে গেছে আমরা যেন একদিনের জন্যেও তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করি। আর সেই সুযোগ প্রথমেই গ্রহণ করেছে জঙ্গল। অহো ভাগ্যম্ !

সোহনের সঙ্গে আমরা গল্পগুজব করছি। এমন সময় নামচে-বাজারের দল ফিরে এল। তাদের মধ্যে ছিল জঙ্গল, চাও (চৌধুরী), সোনাম, গোপাল ও ভগ্নানী। সুতরাং নরক গুলজার। আমাকে দেখেই ওরা জড়িয়ে ধরল। ওদের উচ্ছ্বাসে মনে হতে লাগল আমি যেন আমার প্রিয়জনদের কাছে ফিরে এসেছি। সত্যি, কী সরল ভালবাসা এদের কাছে পেলুম ! কোনদিন ভুলতে পারব না তা। এরা আমার আত্মীয় নয়; রক্তের দূরতম সম্পর্কও নেই এদের সঙ্গে। তবু মাঝে মাঝে ভাবি, এরা কি সত্যিই আমার অনাত্মীয় !

যা হোক, প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর শুরু হল নামচে-বাজারের গল্প। সেই সঙ্গে মিসেস গিয়ালজেনের কাহিনী। তার অপূর্ব আতিথেয়তা, মধুর আপ্যায়ন ইত্যাদি। লীডারের নির্দেশ না

থাকলে ওরা নাকি আজ ফিরত না কোনমতে। নামচেবাজার এমনই সুন্দর, শুনতে শুনতে মন উন্মুখ হয়ে উঠল, আগামী কাল কখন নামচেবাজার পৌঁছব!

ভেবেছিলুম, সবাই যখন একত্র হয়েছি তখন একটু তাস খেলা যেতে পারে। কিন্তু ভাগ্য বিমুখ। লীডারের আদেশে লেঃ নন্দ (ওয়্যারলেস অফিসার) এল আমাদের বেতার সম্বন্ধে হাতে-কলমে কাজ শেখাতে। আর সেই সঙ্গে বেতার সম্বন্ধে ছোটখাটো বক্তৃতাও দিতে। বড় বিরক্তি বোধ করলুম। কোথায় এই রকম আলসে দিনে একটু হৈ-চৈ করব, তা নয়, পড়ুয়াদের মত মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা নিতে হবে! এটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কী! কিন্তু পরে অনুভব করলুম এই শিক্ষার কী দাম!

শুধু মাত্র বেতার বিষয়ক নয়, আমাদের লীডার চান আমরা যেন পর্বতারোহণে লাগে এমন সব বিষয়েই মোটামুটি শিক্ষা লাভ করি। সুতরাং ভূ-বিজ্ঞানী ভোরাকে দিতে হল ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে বক্তৃতা। গোপাল এগিয়ে এল—কী করে ক্যামেরা ব্যবহার করতে হয়, কী ভাবে ছবি তুলতে হয় শেখাতে। অক্সিজেন-অফিসার অক্সিজেনের ওপর আলোকপাত করলেন। কুমার বলল পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম বিষয়ে। ডাক্তারকে জানাতে হল পাহাড়ের ওপর কী রকম রোগের আবির্ভাব ঘটে—এই সব।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, বরাবর ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিংয়ের লক্ষ্য রয়েছে সব দিকেই। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তা সে যত সামান্যই হোক। এক দিকে যেমন দেখছি আমাদের সকলের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা, অন্য দিকে অনুভব করছি তাঁর চিন্তার একাগ্রতা—কী করে বর্তমান অভিযান সফল করা যায়। অফুরন্ত প্রাণ আর দরদ নিয়ে জন্মেছেন আমাদের লীডার। সর্বদাই হাসিমুখ, সব সময়েই কর্মপ্রবণ। সমগ্র অভিযানের মধ্যে ইনি নানাভাবে আমাদের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন।

তাই তাঁর কোন নির্দেশই আমরা অবহেলা করতে পারি না।

শিক্ষা সমাপনান্তে সন্ধ্যার কুলায় আগুনের পাশে বসে খোসগল্প শুরু করা গেল। যত না গল্প তার চেয়ে বেশী হৈ-চৈ। মানুষের সমস্ত সভ্যতা থেকে দূরে এই বরফের রাজ্যে আজ আমরা ভুলে যাচ্ছি বাস্তব পৃথিবীর কথা। হাসি, গল্প, গানে মৌন তুষাররাজ্য বোধহয় আজ সন্ধ্যায় ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছে।

কাল রাতে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। অত্যধিক তুষারপাতে একটা তাঁবুর মধ্যেকার পোল ভেঙে গিয়েছিল। কাজেই সমগ্র তাঁবু নেমে এসেছিল কয়েকটি নিদ্রিত মানুষের ওপর—সোহন, কুমার, কোলী, কেকী আর ভোরা। ওদিকে তার ওপরেই তুষারপাত চলছিল অবিরাম। কেকী প্রথমে উঠে পড়ে। কুমারকে ঠেলা দিয়ে বলে—এই কুমার, ওঠ শীগ্‌গির, আমরা টেন্ট চাপা পড়েছি। প্রত্যুত্তরে কলিযুগের কুম্ভকর্ণ কুমার জানায়—চেপে যাও, কাল সকালে দেখা যাবে। অগত্যা কেকী কোলীকে তোলবার চেষ্টা করে। কোলী আর-এক কাঠি বাড়া। বলে—টেন্ট্‌টা বড় বক্‌বক্‌ করছিল (পত্‌পত্‌ আওয়াজ হচ্ছিল ঝড় আর তুষারপাতের জন্যে), এমন ধমক দিয়েছি যে একদম শুয়ে পড়েছে। এবার বেশ হয়েছে। ইতিমধ্যেই সোহন আর ভোরা উঠে পড়ে। সোহন ছিল সবার বয়োজ্যেষ্ঠ। তার দায়িত্ব হিসেবেই বোধ হয় সে চিৎকার শুরু করে—এই, সব উঠে পড়। আমরা তাঁবু চাপা পড়েছি। কিন্তু কারোই ওঠার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বরং সোহনের কথা শুনে সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে। সোহন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু ওদিকে তুষার পড়ার জন্যে তাঁবু বেশ ভারী হয়ে ওঠে। গায়ের ওপর চাপও লাগে। আর উপায় না পেয়ে অনেক কসরৎ করে কুমার, কোলী আর কেকী বেরিয়ে এসে লীডারের তাঁবুতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু কখন যে সোহন আর ভোরা বেরিয়ে গিয়েছিল তা ওরা জানতেও পারেনি। এই ভাবেই কাল ঘটনাটার পরিসমাপ্তি হয়।

এই প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কয়েক বছর আগে আমরা গিয়েছিলুম গাড়োয়ালে ছোটখাটো একটা অভিযানে। সেদিন আমরা ক্যাম্প করেছিলুম ১৯০০০ ফুট উঁচুতে। জায়গাটা ছিল বরফে আবৃত। বিকেল থেকেই শুরু হয়েছিল তুষারপাত। তাঁবুর মধ্যে হারিকেন জ্বালিয়ে গল্প জুড়েছিলুম আমরা। কিন্তু সারাদিনের ক্লান্তিতে একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়লুম। ওদিকে তাঁবুর মাথায় সমানে বরফ জমা হচ্ছে। রাত্রি প্রায় দুটোর সময় ভীষণ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, সমস্ত তাঁবু তার মাথায় জমা বরফসুদ্ধ আমাদের ওপর ভেঙে পড়েছে। আমরা সঙ্গী ছিলুম তিনজন। তারই মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল—এইরে, আমরা যে চাপা পড়ে গেছি! বেরুব কী করে! বললুম—চুপ করে শুয়ে থাক-না বাবা। বরফ-সমাধি তো খুব খারাপ জিনিস নয়। আসলে ওপরে বরফ পড়াতে ওই প্রচণ্ড শীতেও আমাদের বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। সুতরাং কেউ ওঠবার নাম করলুম না। ওদিকে হারিকেনের সমস্ত কেরোসিন তেল আমার বিছানা-পত্র ভিজিয়ে দিয়ে এক বীভৎস গন্ধের সৃষ্টি করেছিল। আমরা কিন্তু নির্বিকার। সকালে ঘুম ভাঙল পোর্টারদের ডাকে। ওরা কয়েক ফুট বরফ সরিয়ে আমাদের টেনে বার করল। আশ্চর্য আমাদের ঘুম! ওরা বোধ হয় ভেবেছিল সাহেবরা মরে গেছে!

এদিকে রাতের খাওয়ার ডাক এসে গেল। খেতে বসেছি এমন সময় এক বিরাট তিব্বতী কুকুর এসে হাজির। রাত্রির আবছা আলো-অন্ধকারে চমকে উঠলুম। শুনলুম, গত কদিনই কুকুরটা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। থণ্ডু বলল—এ সময়ে কুকুর দেখা শুভ লক্ষণ। অর্থাৎ অভিযান সফল না হয়ে যায় না। তবু কেন জানি না কল্পনা আমার রঙিন পাখা মেলে বর্তমান ছেড়ে বিস্মৃত অতীতের সেই মহাভারতের অধ্যায়ে ছুটে যায়—চোখের সামনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় পথক্লান্ত যুধিষ্ঠিরের ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের প্রলোভন প্রদর্শনের প্রতি

তীব্র শ্লেষোক্তি—এই কুকুর আমার আশ্রিত। স্বর্গের লোভে একে আমি ত্যাগ করতে পারি না। আমার মর্ত্যের যত পুণ্য সঞ্চয় আছে তার অর্ধেক আমি এই কুকুরকে দান করছি, এখন উভয়ের পথ সুগম করুন। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরবেশী কৃষ্ণ আর ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র নিজ নিজ রূপ ধারণ করলেন। কী মধুর, কী রোমাঞ্চকর !

কুকুরটার সমাদর তাই আমার কাছে বেড়ে গেল অতিমাত্রায়।

এই সময় শ্রীযুক্ত সেরিনের কাছ থেকে পাওয়া একটা তারবার্তা নিয়ে আমাদের লীডার হাজির হলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমাদের সাফল্য কামনা করে। এই রকম অবশ-করা দিনে তারবার্তাটি আমাদের নতুন করে প্রাণ-চাঞ্চল্যে জাগিয়ে তুলল। কুমার উৎসাহের চোটে বলে উঠল—একবার লড়ে যেতেই হবে। দেখলুম সবাই তাতে সায় দিল। জঙ্গল গান গেয়ে উঠল।

২৩শে মার্চ ॥ বুধবার

আজকের পথ চলা খুব দীর্ঘ হবে না। তবে পথে একটু থামতে হবে। নামচেবাজার গ্রামে। বিশ্রাম কিংবা দেখার জন্যেই নয় শুধু—এখানে আমাদের রয়েছে বিশেষ আমন্ত্রণ। সেই অন্তরের আহ্বান আমরা এড়াতে পারিনি।

আজ আর আলাদা দু দলে ভাগ হয়ে যাওয়া নয়। একসঙ্গে মিলেমিশে হাঁটা। আমাদের দ্বিতীয় দলটা জঙ্গলওয়ালা অভিযাত্রী দল বলে খ্যাত ছিল। আজ জঙ্গলের মাতব্বরি একেবারে খতম !

ভোরে উঠে দেখি প্রথম দলের তাঁবু তখনও বেশ বহালতবিয়তেই খাড়া হয়ে রয়েছে ও সবাই যথারীতি ঘুমুচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানলুম আমাদের আজকের যাত্রারম্ভ সকাল আটটায়। অথচ সাতসকালে

উঠে বসে আছি। বড় আপসোস হতে লাগল। কাল রাতে যদি সময়টা জেনে রাখতুম! কোলী, ভোগু (ভগ্নানী)—এদের ডেকে তুলে তখন ভোরে-ঘুম-ভাঙার উপকারিতা সম্পর্কে বক্তৃতা শুরু করলুম। নিজের লেজ যখন কাটা গেছে তখন এরাই বা বাদ থাকে কেন? কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! ওরা আগের মতই অকাতরে নাক ডাকিয়ে ঘুমতে লাগল। এমন সময় ভাগ্য বোধ হয় সুপ্রসন্ন হল। কুমার বেরিয়ে এল বিছানা ছেড়ে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সোহন। আমিও তৎক্ষণাৎ সুড়ুত করে ঢুকে পড়লুম কুমারের স্লিপিং ব্যাগে। সঙ্গে ছিল জঙ্গল। সেও সুযোগ নিল সোহনেরটায়। বাঁচা গেল। এখন আটটা অবধি নিশ্চিন্ত। কিন্তু অলক্ষ্যে বোধ হয় বিধাতাপুরুষ হেসেছিলেন। খানিক বাদেই স্বয়ং লীডার এসে হাজির। অগত্যা উঠতেই হল।

বাইরে এসে দেখি হৈ-চৈ। কী ব্যাপার! না, পোর্টাররা সব এসে হাজির। কিন্তু এ যে জনারণ্য। দরকার তো মোটে দুশো জন। প্রথমে সকলে লেগে গেলুম পোর্টার-নির্বাচনে।

ঠিক আটটার সময় আমাদের যাত্রা শুরু হল। প্রথমেই যাব নামচেবাজার। যেতে হবে প্রায় দু হাজার ফুট চড়াই-উতরাই বেয়ে। খানিক পরেই দেখি সামনে মা চুমালুংমা (এভারেস্ট)। তুষারাবৃত শুভ্র মসৃণ তার শরীর। তুষার-ঝড় দেখে মনে হল হাওয়ায় তার শাড়ির আঁচল যেন উড়ছে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে লুপৎসের চূড়া আর ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড়ের শিখর। আকাশ পরিষ্কার। রোদ উঠেছে। বরফের রাজ্যে সূর্যের আলো পড়ে এক আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। সে উজ্জ্বলতা বড় পবিত্র, বড় মনোমুগ্ধকর। বরফের পথ পিচ্ছিল। অভিসারিকা রাধার মত তাই আমরা সবাই 'চলত হি অঙ্গুলি চাপি।' তা ছাড়া তুষার-অন্ধতার ভয়ে সকলের চোখে আঁটা রয়েছে রঙিন চশমা।

ধীরে ধীরে আমরা এসে গেলুম নামচেবাজার। এই গ্রামটার

অবস্থিতি এমন চমৎকার যে কাছে না আসা পর্যন্ত এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না। গ্রামে ঢোকবার মুখে একটা বিরাট পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা রয়েছে বুদ্ধের বাণী—পালি ভাষায় লেখা। নামচেবাজার গ্রামটা যেন একটা বাটির মধ্যে বসানো। বাইরের কোন দিক থেকেই তাকে দেখা যায় না। চারিদিকের পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। তারই চারপাশে বাড়িগুলো সুন্দরভাবে সাজানো। দেখলে মনে হয় প্রাচীন রোমের অ্যামপিথিয়েটার। সারিবদ্ধ বাড়িগুলো তারই থাকে থাকে সাজানো যেন আসনের সারি।

গ্রামে ঢুকতেই কয়েকজন এগিয়ে এসে লীডারের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত সি. পি. সুদল (চেকপোস্ট অফিসার) ও শ্রীযুক্ত আর. এন. সিং (ওয়্যারলেস অপারেটর)। এঁরা দুজনেই ভারতীয়, বৈদেশিক দপ্তরের অধীনে কাজ করেন। আমাদের ওঁরা নিয়ে গেলেন ওঁদের অফিসে, চা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। একটা ভোজের আয়োজনও ওঁরা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সময়াভাবের অজুহাত দেখিয়ে ওঁদের সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে হল।

একটু নিরিবিলিতে এসে দাঁড়িয়েছি। ঝুরা কোথায় ছিল জানি না, একরকম ছুটে সামনে এসে দাঁড়াল। কপালে চুলে ওর আবীরের পুরু দাগ। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ও কৈফিয়তের সুরে বলল, 'বাড়ি গিয়েছিলুম। এখানেই আমার বাড়ি। হোলীর দিন এখানে ছিলুম না বলে' বোনেরা আজ তার প্রতিশোধ নিয়েছে।' কপালটা ও ভাল করে মুছতে লাগল।

—তা বেশ করেছে। ঠাট্টা করে বললুম।

—এবার আপনাকে একটু দিই।

দাঁড়াতে বলল ও আমায়। দাঁড়ালুম। ও আমায় আবীর মাখাল। রাজু ইত্যবসরে এসে হাজির। ঝুরার দেখাদেখি সেও ওর কাছ থেকে একটুখানি আবীর নিয়ে আমার কপালে দিল। তারপর দুজনে দুজনের দিকে মিষ্টি হেসে তাকাল।

আমি বললুম, 'দাও তো ঝুরা ওকে আচ্ছা করে মাখিয়ে।'

—না-আ-আ। আমি পারব না!

মুখ নীচু করল ও।

এবার রাজুকে বললুম, 'ঝুরা বড় অবাধ্য হয়েছে। দাও তো রাজু ওকে জব্দ করে।' রাজু ইতস্ততঃ করছে এমন সময় ঝুরাই সুযোগ করে দিল। মারল ও লম্বা ছুট। আর পালাবে কোথায়! রাজু দৌড়ে গিয়ে খপ করে ওকে কোলে তুলে নিল। তারপর বিজয়ীর মত হাসতে হাসতে ওকে আমার কাছে নিয়ে এল। লজ্জা পেয়ে ঝুরা রাজুর বুকে মুখ লুকাল। উৎসাহ দিয়ে বললুম, 'দাও এবার আবীর দিয়ে ওর লাল মুখটা আরও লাল করে।'

ঝুরা আবার ছটফট করে উঠল। কিন্তু রাজুর হাতে নিস্তার নেই। ও আমার কথামত কাজ করল। ছাড়া পেয়ে ঝুরা আমার হাতে একটা টোকা মেরে বলল, 'ভারি দুষ্টু!'

তারপর ছুটে পালাল।

ব্রিগেডিয়ারকে নিয়ে আমরা হাজির হলুম শ্রীযুক্ত গিয়ালজেনের বাড়ি। গিয়ালজেন পোর্টারদের ছোট সর্দার। গিয়ালজেন-দম্পতির বিশেষ অনুরোধে আমরা আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি। বাড়িতে ঢোকবার দরজা ওদের খুবই নিচু। ঢুকতে গিয়ে দীর্ঘদেহী ব্রিগেডিয়ার মাথায় প্রচণ্ড চোট খেলেন। আমরা বলে উঠলুম, 'কী সার্, হেড করলেন নাকি?'

লীডারও হারবার পাত্র নন। হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ছেলেবেলার অভ্যাসটা ছাড়তে পারিনি দেখছি।' হাসিটা কিন্তু বড় কষ্টকৃত করুণ। বুঝলুম বেশ লেগেছে।

একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করছি, নামচেবাজারের বাড়িগুলো সব একই ধরনের। একতলার ঘরে থাকে ইয়ক, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু। ঘরগুলো বড় অন্ধকার। ওপরে যাওয়ার জন্যে রয়েছে কাঠের সিঁড়ি। সেখানেও আলোর সম্পর্ক বড় কম।

দোতলায় এরা বসবাস করে। সাধারণভাবে এই হল ওখানকার ব্যবস্থা।

গিয়ালজেনের বাড়িতে ওপরে উঠেই যে ঘরটা দেখলুম সেটা প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ ফুট লম্বা। আর চওড়ায় বোধ হয় পনরো-বিশ ফুট। ঘরটার উত্তর দিকে একটু বাড়িয়ে নিয়ে ভাঁড়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে তাকের ওপর রয়েছে বাসন-কোসন আর ঝোলানো রয়েছে মাংস। আর রয়েছে একটা উনুন। ওপরের চিমনিটা বোধ হয় কোন কাজ করে না। কারণ ঘরটা ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। পূবদিকে বসবার ব্যবস্থা—কাঠের বেঞ্চ পাতা। তার ওপর কুসন। বেঞ্চের সামনে সরু টেবিল। ঘরের একধারে সাজানো আছে পাহাড়ে ওঠবার সাজ-সরঞ্জাম। উচ্চারোহী শেরপা হিসেবে গিয়ালজেন পেয়েছে এইসব জিনিস। গিয়ালজেন এর আগে ব্রিটিশ, সুইস ও মহিলা চৌ-ঔ অভিযাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ঘরের দেওয়ালে লাগানো তাকের ওপর রয়েছে নানা ধরনের গৃহস্থালী-বস্তু। দেওয়ালে সাঁটা আছে হরেক রকমের ছবি—খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিন থেকে সংগ্রহ করা। অবশ্য ধোঁয়ার কল্যাণে তাদের স্বরূপ আর চেনা যায় না। এ ছাড়া আছে লামাদের ফোটো আর বিভিন্ন অভিযানে তোলা গিয়ালজেনের ছবি। দু-একটা সমগ্র পরিবারের ছবিও রয়েছে।

ওরা আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ জানাল। এমনকি, দুপুরের খানাও খেয়ে যেতে বলল। সেই সঙ্গে ছাঙ আর রক্সীও।

দেখি, একটা মেয়ে রাঁধছে। জিজ্ঞাসা করে জানলুম ও রাঁধছে থুপ্‌কা—মাংস, ডিম আর বিভিন্ন রকমের তরিতরকারি সহযোগে একটা অপূর্ব খাদ্য।

ইতিমধ্যে গিয়ালজেন-গৃহিণী একপাত্র ছাঙ এনে ব্রিগেডিয়ারকে খেতে অনুরোধ জানাল। ব্রিগেডিয়ার বিনীতভাবে বললেন, 'থুজি চে মু খান্দাএ না'—অর্থাৎ, ধন্যবাদ, আমি খাই না। কিন্তু মহিলা শুনল না। পীড়াপীড়ি করতে লাগল। উনিও খাবেন না, মহিলাও ছাড়বে

না। তখন গিয়ালজেন-গৃহিণী আর-একজন মহিলাকে ডাকল। দু'জনে মিলে লীডারকে জোর করে খাওয়াবে। সে এক মজার দৃশ্য। আমরা কৌতুক অনুভব করতে লাগলুম অবস্থা দেখে। ফোটোগ্রাফার গোপাল চট্ করে তার ক্যামেরা বার করে ছবি তুলে রাখল। অগত্যা ছাড়া না পেয়ে লীডার পাত্রে আঙুল ডুবিয়ে জিবে ঠেকালেন। তবে নিষ্কৃতি। আসলে ছাঙ প্রত্যাখ্যানকে ওরা ভয়ানক অপমান বলে মনে করে। তাই অত সাধ্য-সাধনার ঘটা।

এবার আমাদের পালা। ছাঙভর্তি পাত্র আসতে লাগল আমাদের জন্যে। খাবার জন্যে যদিও আমরা ছটফট করতে লাগলুম ভেতরে ভেতরে, কিন্তু লীডারের সম্মানার্থে বলতে বাধ্য হলুম, 'খান্দাএ না'। মহিলা দু'জন কী বুঝল জানি না—মুচকে হাসল। লীডারও সব বুঝে অবুঝের মত হাসতে হাসতে বললেন, 'জানি তোমরা খুব ভাল ছেলে, তবে এবারের মত খেয়েই নাও।' আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে সকলের গ্লাস খালি হয়ে গেল। আমিই বা আর বাদ পড়ে থাকি কেন—'জয় বাবা মহাদেব' বলে একনিশ্বাসে খালি করে দিলুম গ্লাস-ভরা পানীয়টা। মহিলা দু'জন খালি গ্লাস আবার ভরে দিল। অতিথিদের গ্লাস খালি রাখা নাকি এখানে নিয়মবিরুদ্ধ। সাবধানে চুমুক লাগালুম এবার।

চা, জল-খাবার, ছাঙ খেয়ে আমরা উঠতে চাইলুম। কিন্তু ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। ওরা আমাদের জন্যে থুপকা আর মাংস রেঁধেছে। খেয়ে যেতেই হবে। আশ্চর্য লাগে ওদের এই জোর-জুলুম ব্যবহারে। উপেক্ষা করতে পারলুম না। দুপুরের আহার গিয়ালজেনের বাড়িতেই সারতে হল।

আমরা খেতে বসেছি এমন সময় আমার ডাক পড়ল—রুগী দেখার। একটা ছোট মেয়ের ভয়ানক জ্বর। আমি আর ভগ্নানী তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে মেয়েটার প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করে দিলুম। ওই সামান্য উপকারেই ওদের খুশি দেখে কে!

ওদিকে বেলা পড়ে আসছে। দীর্ঘপথ পড়ে রয়েছে সামনে। আমাদের এগোতে হবে। আর পাঁচ জায়গায় তাই নিমন্ত্রণ নেওয়া গেল না। আবার শুরু হল আমাদের পথ চলা।

পথটা অত্যন্ত সরু। পাশে দু হাজার ফুট খাড়াইয়ের অতল গহ্বর। সুতরাং সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে আমাদের। দূরে দেখা যাচ্ছে এভারেস্ট। মস্তকে তুষারশুভ্র কিরীট। সামনে আমাদাবলাম পর্বত। আজ পর্যন্ত যার শিখরে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। বিকেল চারটে সাড়ে-চারটের সময় পৌঁছলুম থ্যাংবুচে। ঠিক হল আগামী কাল স্থানীয় বৌদ্ধ মঠে যাওয়া হবে আর পরবর্তী অধ্যায়ের যাত্রা সম্বন্ধেও আলোচনা হবে।

এবার শুরু হবে আমাদের নতুন জলবায়ু সহ্য করার অভ্যাস। পাহাড়ের ওপর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু। সুতরাং আমাদের মত সমতল বাসিন্দেদের পক্ষে সেটা সইয়ে নেওয়া দরকার। প্রথমে কোথাও থেমে ক্রমশ ওপরে উঠে সেখানকার আবহাওয়া শরীরে সহ্য করে নিতে হয়। এইভাবে নতুন জলবায়ু ক্রমশ ধাতস্থ হয়ে আসে। এই অভ্যাসকেই বলা হয় অ্যাক্লামাটাইজেশন।

স্থির হল আমরা তিন দলে ভাগ হয়ে যাব। আগামী এপ্রিলের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হবে আমাদের নতুন জলবায়ু সহ্য করার অভ্যাস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের চিকিৎসার সাহায্যের ভার পড়ল আমার ওপর।

সন্ধ্যেবেলা মাথাটা একটু ধরেছে, চুপ করে বসে আছি। রাজু মাঝে মাঝে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ঝুরা একটা পাতায় করে কিছু খাবার এনে আমার সামনে রাখল। ঝুরা আজ সেজেছে খুব। খোঁপায় ওর নানা রঙের ফুল। গায়ে লাল রঙের জামা। কপালে একটা সোনালী টিপ। চূর্ণ চুলের গুচ্ছ কপালের এদিকে ওদিকে ছড়ানো। অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে এই আলো-আঁধারি পরিবেশে। জীবনে অনেক সুন্দরী দেখেছি, কিন্তু ও যেন এক আলাদা ধাতু দিয়ে

গড়া। হাঁ করে চেয়েছিলুম ওর দিকে। ও কিন্তু তা ভ্রুক্ষেপ না করে বলল, 'গুরুজনদের রঙ দিলে কিছু মিষ্টিমুখ করাতে হয়।'

—ভালই হল, আমার বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে।

ছটো খাবার তুলে একসঙ্গে মুখে পুরে দিলুম। ঝুরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। রাজুকে বললুম, 'চুপ করে বসে আছ কেন? নাও, ওটা খেয়ে নাও।'

—আর ঝুরা? অস্ফুট ভাবে ও বলে উঠলো।

—সে ব্যবস্থা আমি করছি।

রাজু খেয়ে নিল। আমি ঝুরার দিকে চেয়ে বললুম, 'এবার আমার সেই সকালকার কেনা খাবারটা বার কর তো রাজু।'

ও দৌড়ে গিয়ে ঠোঙাটা নিয়ে এল।

—নাও, এবার তোমরা খাও।

রাজু খেল। কিন্তু ঝুরা সেই যে একটা মিষ্টি খেয়েছে—সেই শেষ। আর কিছুতেই হাত তুলল না। রাজু সেধে সেধে একসময় ক্লান্ত হয়ে আমার কানে কানে এসে কী যেন বলল। আমি না বুঝেই স্বভাবদোষে সম্মতি দিয়ে বললুম, 'সেই ভাল।'

রাজু ঝপ করে একমুঠো মিষ্টি নিয়ে ঝুরাকে বাহুবন্ধনে আটকাল। তারপর ওর মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে মিষ্টিটুকু মুখে গুঁজে দিল। এত ত্বরিতে ও কাজটা শেষ করল যে সবটুকু আমি দেখবারও অবকাশ পেলুম না। ঝুরা রাগতভাবে আমায় বলে গেল,'আর কক্ষণো আপনার কাছে আমি আসব না।'

আটটার মধ্যেই রাতের আহারপর্ব সমাপ্ত হল। তারপর সবাই নিজের তাঁবুতে ফিরে শুয়ে পড়লুম। কাল ভোরে উঠেই কাজ শুরু করতে হবে। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম আমাদের পথ চলার কথা। মনে পড়ছে নামচেবাজারের কথা। অপূর্ব গ্রামটির অবস্থিতি আর সুন্দর গ্রামবাসীদের সহজ অনাড়ম্বর আত্মীয়তা। সকালের মধুর আপ্যায়নের কথা চিন্তা করে মনটা আশ্চর্য আবেশে ভরে উঠল।

'দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া।'—কবির কথা আজ মর্মে মর্মে অনুভূত হল। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই।

২৪শে মার্চ ॥ বৃহস্পতিবার

আজ সকলেরই মন থ্যাংবুচের বৌদ্ধমঠ দেখতে যাবার আগ্রহে চঞ্চল। গতকাল লীডার মঠের প্রধান লামার কাছে আমাদের নিয়ে দেখা করতে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে খবর পাঠিয়েছিলেন। তিনিও রাজী হয়ে সময় দিয়েছেন আজ সকাল নটায়। আমরা যাব আবার সেই ফেলে-আসা পথে দেড় মাইল, যেখানে শত সহস্র বছর আগে সভ্যতা আর ধর্ম-বিস্তারের মহান চেষ্টার ধারক আর বাহক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ওই মঠ। তাকে দেখার এ সুযোগ কি আমরা ছাড়তে পারি কখনও!

দিনটা ভারি সুন্দর লাগছে। গতকালের চেয়ে আজকের আবহাওয়া অনেক ভাল। প্রভাতসূর্যের আতপ্ত আলো সোনালী রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতির পায়ে। অত্যাশ্চর্য কমনীয়তায় তাই প্রাণময় হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। তারই ছোঁয়া যেন লেগেছে আমাদেরও মনে। আনন্দে গানে কলহাস্যে মুখর হয়ে চলেছি আমরা মঠের উদ্দেশ্যে।

মঠে আসামাত্র কয়েকজন লামা এসে আমাদের অভিনন্দন জানালেন। তারপর দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁরা ব্রিগেডিয়ারকে আলাদা একটা আসনও দিলেন।

ঘরের এককোণে উঁচু একটা গদিতে বসে আছেন প্রধান লামা। দূর থেকে তাঁকে ভাল করে চেনা যাচ্ছে না। সকলেরই চোখে অবাক

কৌতূহল। ঘরটাতে জ্বলছে ছোট্ট ছোট তেলের প্রদীপ। উজ্জ্বল স্নিগ্ধতায় তাই ঘরটা যেন ভরে গেছে। ঢোকবার আগে গাম্বু আমাদের একটা করে খাদা (স্কার্ফ) দিয়েছিল আর সেই সঙ্গে একটা বিবরণও দিয়েছিল, কেমন করে তা নিচু হয়ে লামার সামনে ধরতে হয়। এখানে খাদার সঙ্গে কিছু করে প্রণামী দেওয়ার রীতি আছে। ব্রিগেডিয়ার তাই এগিয়ে গিয়ে ১০১৲ টাকা প্রণামী দিলেন লামাকে, আর সেই সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও কইলেন। সোনাম দোভাষীর কাজ করল। আমরাও একই নিয়মে এগিয়ে গেলুম। এ-পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল এত বড় ধর্মপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন প্রবীণ হবেন, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম প্রবীণ তিনি মোটেই নন—একুশ-বাইশ বছরের মাত্র একজন যুবক।

প্রণামের পালা শেষ হলে লামা আমাদের অভিযানের সাফল্য কামনা করে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিলেন তিব্বতী ভাষায়। সোনাম এক্ষেত্রেও তা অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিল। এর পর পেতলের কাপে করে আমাদের সকলকে তিব্বতী চা পরিবেষণ করা হল। চা পান করে আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম ঘরটা। ছাদে ফ্রেসকো কাজ-করা। ঘরের দেওয়ালে নানারকমের ছবি। বাহুল্যটাই তার নজরে পড়ে বেশী করে। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে —বুদ্ধদেবের জীবনালেখ্য, মানুষের জন্ম-মৃত্যুর ক্রমপরিণতির ছবি, প্রাক্তন প্রধান লামাদের ছবি, বর্তমান দলাই লামা, নেপালের রাজা ও তেনজিংয়ের ছবি। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে ছাদ পর্যন্ত উঁচু র‍্যাকে সাজানো রয়েছে অজস্র ধর্মগ্রন্থ। এ ছাড়া যত্রতত্র সাজানো রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি। সোনার মূর্তিও যে নেই এমন নয়। সোনার কাজ করা একটা কাঠের বাক্সও দেখলুম এক জায়গায়। খোঁজ নিয়ে জানলুম তাতে প্রাক্তন লামার অস্থি সংরক্ষিত আছে। সব দেখা শেষ করে বেলা প্রায় সাড়ে-এগারোটার সময় আমরা বেরিয়ে এলুম।

দূরে সূর্যালোকে তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলোর কী গৌরবোজ্জ্বল রূপ! নির্বাক বিস্ময়ে দেখছি আমি ওগুলোর মধ্যমণি এভারেস্টকে। ভয়ঙ্কর ওর মূর্তি, বিরাট বিস্তৃত ওর দেহ, গগনচুম্বী ওর সুউন্নত শির। কী এক অতলস্পর্শী রহস্যে ও যেন সব সময়েই ঢেকে রেখেছে নিজেকে! ওর নিকটবর্তী হয়ে কিছু বোঝবার আগে, কিছু জানবার আগে, স্থির কোন সিদ্ধান্তে আসবার আগে ও লুকিয়ে ফেলে নিজেকে রূপান্তরের মধ্যে—এটা বহু বহু অভিযাত্রীর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা। 'Perhaps it is this very fact which inspired the long series of brave struggles to attain it, struggles which became more determined and even more gallant after man had reached both Poles and so left Everest in its solitary and inviolate majesty.'

ভাবছি এমন কত কথা, হঠাৎ দেখি গোপাল কখন লেগে গেছে ওর কাজে। একের পর এক শিখরগুলোর গর্বিত রূপের ছাপ ও ধরে রেখে চলেছে ক্যামেরার কালো ফিল্মের পাতায় পাতায়। ওর দেখাদেখি সকলেই ছবি তোলায় অতিমাত্রায় মনোযোগী হয়ে উঠল। কুমারও বসে রইল না হাত গুটিয়ে। সেও একটা ক্যামেরা জোগাড় করে গোপালকে জিজ্ঞেস করল, 'এক্সপোজার কত হবে?'

গোপাল গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, 'দশ-বিশ লাগিয়ে দাও না।'

কুমার হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মানে?'

আমরা হেসে উঠলুম।

থ্যাংবুচের পথে চলেছি আমরা। অসংখ্য চড়াই-উতরাইয়ের এই পথটা—দেবদারু, পাইন, রডোডেনড্রন গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে গেছে সর্পিল রেখায়। দ্রুত চলতে লাগলুম, কারণ হাতে অনেক কাজ। দুটোর সময় আমরা এসে পৌঁছলুম ইমজেখোলা নদীর তীরে—আমাদের আজকের ক্যাম্প-সাইটে। নদীর ঠিক ওপারে প্যাংবুচে গ্রাম। এপার থেকে গ্রামটাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। পাহাড়ের

গায়ে সাজানো বাড়িগুলোকে মনে হচ্ছে যেন এক-একটি পায়রার খোপ। লোকসংখ্যায় আমরা বোধ হয় ও-গ্রামের অধিবাসীদের চেয়ে বেশীই হব।

ক্যাম্প খাটানোর কাজ যথাসময়ে শেষ হল। সঙ্গে রয়েছে আমাদের ছ' শোর ওপর শেরপা ও পোর্টার। এ ছাড়া আমরা কুড়ি-একুশ জন মেম্বার। তাই সময়ের অপচয় হল না কিছু। তাঁবু খাটানো হল—চারটে বড় তাঁবু, বাকী সব ছোট ছোট। নদীর নির্জন প্রান্তর হঠাৎ যেন রূপকথার জাদুকাঠির স্পর্শে কোলাহলমুখর একটা নগরীতে পরিণত হল—চারিদিকে তার কর্মব্যস্ততার ছাপ।

এর পর শুরু হল মাল গোছানো। পোর্টাররা মাল নিয়ে আসতে লাগল আর আমরা সেগুলোকে এক-একটা ভাগে ঠিক ঠিক মত সাজাতে লাগলুম। পাথরের টুকরো সাজিয়ে তৈরি করলুম আলাদা আলাদা কুঠরি। তার মধ্যে কোথাও রাখলুম খাবারের বাক্স, কোথাও সাজ-সরঞ্জাম, কোথাও বা ওষুধ-পত্র।

যার যে জিনিসগুলোর ওপর দায়িত্ব সে সেগুলোকে বেছে বেছে সাজাতে লাগল। যেমন ওয়্যারলেস-অফিসার লেঃ নন্দা ও তার দু'জন সহকারী সাজাতে লাগল তাদের যন্ত্রপাতি। কুমার সাজাতে লাগল আগামী দিনের বিশেষ বিশেষ ক্যাম্পের সাজ-সরঞ্জাম আর কোলী ওই সমস্ত ক্যাম্পের খাবারদাবার।

সামনে পোর্টারদের বিরাট একটা জটলা দেখে এগিয়ে গেলুম। দেখলুম পোর্টারদের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। প্রাণান্ত ব্যাপার সন্দেহ নেই। দিচ্ছে চৌধুরী, দানামগিয়াল ও গিয়ালজেন। আর তদারক করছেন স্বয়ং লীডার। জঙ্গল আর পাশাং ওদের চাকতি দেখে নাম ও নম্বর মেলাচ্ছে। টাকা দেওয়ার মধ্যে ওইটেই বোধ হয় সব চেয়ে শক্ত কাজ। কারণ ওদের যে চাকতিগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো ওরা ওদের একজনের কাছে জমা রাখে। ফলে পারিশ্রমিক নেওয়ার সময় পড়তে না পারার দরুন একজনের চাকতি চলে যায়

আর-এক্কজনের হাতে। তার ওপর এক পাশাং নামেই রয়েছে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন। ফুতার, গিয়ালজেন নামেও রয়েছে অমন পঁচিশ-ত্রিশ জন। সুতরাং আসল লোক নির্বাচনে ফ্যাসাদ অনেক। উত্তেজনায় আর চেঁচামেচিতে ওদের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। এই সময় ব্রিগেডিয়ার উঠে পড়লেন। বসতে বললেন আমাকে তাঁর জায়গায়। বসতে হল। যা হোক, আর কিছুক্ষণ এইভাবে পাওনা-গণ্ডা দেওয়ার পর একসময় ওরা উঠে পড়ল। এত করেও কিন্তু সব পোর্টারকে মিটিয়ে ওঠা গেল না। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন বাকী রইল। স্থির হল, ওদের যথানিয়মে আগামী কাল মিটিয়ে দেওয়া হবে।

টেণ্টে এসে দেখি আবহাওয়াবিদ্ রাও তখনও যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে। সহজভাবে বললুম, 'তোমার কাজটা কিন্তু সবচেয়ে ভাল। এ ছাড়া ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও তোমার মেলে বেশ।' রাও সেই গল্প শোনার পর থেকে এ-ব্যাপারে আমায় বিশ্বাস করে না আর। প্রশংসাটাকে ও ব্যঙ্গ বলেই ভাবল বোধ হয়। রক্তবর্ণ চোখে ও তাই একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর কাজে মন দিল।

ওদিকে গোপাল আর বিক্রম ওদের যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরী হচ্ছে। নতুন কিছু একটা মতলব নিশ্চয়ই ওদের আছে। জিজ্ঞেস করে জানলুম ওরা শেরপা-শেরপানীদের নাচের কিছু ছবি তুলতে চায়। আর সেই সঙ্গে করতে চায় গানের কিছু রেকর্ডও। আয়োজনপর্ব শেষও হল। কিন্তু মুশকিল বাধল শেরপানীদের নিয়ে। ওরা কিছুতেই নাচবে না। নিরুপায় হয়ে ওরা আমায় ধরল। উপায় না দেখে আমি ঝুরা ও লামুর শরণাপন্ন হলুম। মুখ রক্ষে করল ওরা রাজী হয়ে।

ঝুরা ও লামুর সঙ্গে অন্যান্য শেরপানীরাও যোগ দিল। দেখতে দেখতে বেশ জমে উঠল। শেরপা ও পোর্টাররা সব এসে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের মধ্যে বিয়ে-পাগল বুড়ো বাহাত্তুরটাও রয়েছে। হাঁ করে ও বিস্ফারিত চোখে লামুর দিকে চেয়ে আছে। উচ্ছ্বসিত

আনন্দে মধ্যে মধ্যে ওর ওষ্ঠদ্বয় প্রসারিত হচ্ছে আর সেই সঙ্গে ওর মুখের কালো মাড়ি বেরিয়ে পড়ছে। ফলে মুখটা ওর কদাকার দেখাচ্ছে। সেদিকে কিন্তু ওর ভ্রুক্ষেপ নেই। নাচ শেষ হলে বাহাদুর আমায় একপাশে বিনীতভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'লামুকে আমি কিছু উপহার দিতে চাই। এতে কি কিছু অপরাধ হবে?'

—না, না। এতে আর অপরাধ কী! তা হঠাৎ উপহারের কী হল?

—ওর নাচ আমার বড় ভাল লেগেছে। জীবনে এমনটি আর আমি কখনও দেখিনি।

—বটে।

ডাকলুম লামুকে। লামু এসে চুপটি করে দাঁড়াল। বাহাদুর বিগলিত কণ্ঠে বলল, 'তোমার নাচে খুশী হয়ে আমি আমার আজকের পারিশ্রমিকটা তোমায় উপহার দিচ্ছি। নাও।'

পকেট থেকে ও টাকা ক'টা বার করল।

—না।

—তুই সেই রাগ করে আছিস্ লামু। কবে কী হয়েছে তা কি মনে করে রাখতে আছে রে! নে, নে লক্ষ্মী সোনা!

মুখটা আড়াল করে হাসতে লাগলুম বাহাদুরের উপহারের অছিলায় প্রেম নিবেদন দেখে।

লামু নীরস কণ্ঠে বলল, 'নিতে পারি, কিন্তু এই কারণ ধরে পরে যে তুমি আমার কাছে এসে কুত্তামি করবে, তা হবে না— বলে দিচ্ছি।'

—কী বললি, কুত্তামি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব জানিস্।

—যা, যা। জুতোতে গিয়ে জুতো না খেয়ে মরিস, দেখিস।

আর চুপ করে থাকা যায় না। ধমকের সুরে তাই বলতে হল— 'কী, হচ্ছে কী?'

বাহাত্তর আর্তনাদ করে বলল, 'শুনলেন তো হারামজাদীর কথা। কী অপমানটা করল আমায়।"

তিরস্কার করে লামুকে বললুম, 'ছি, ছি! লোকের মনে ব্যথা দিয়ে কি কিছু বলতে আছে? কাউকে অশ্রদ্ধা করার মধ্যে কোন গৌরব নেই মনে রেখো।'

লামু কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সামান্য এই সহানুভূতি-টাতেই বাহাত্তর একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। লামু হাজার হোক মেয়েছেলে। পুরুষের এই তুর্বলতায় ও আর স্থির থাকতে পারল না। নরম মনে সজল চোখে ওর জামা দিয়ে বাহাত্তরের চোখের জল মুছিয়ে দিল। বাহাত্তর কপট অভিমানের সুরে বলল, 'যাঃ, আর ভালবাসতে হবে না।'

কিছুক্ষণ বাদে আমি আর গোপাল ক্যাম্পের চারিদিকের পরিবেশটা বেশ ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। চোখ পড়ল অতিকায় এভারেস্টের দিকে। এই সময় তাকে যেন আরও স্পষ্ট আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তার সামনে বিরাট পাঁচিলের মত সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে নুপৎসে পাহাড়। উত্তর-পূর্ব দিকে আমাদাবলাম্ আজও যেন এক ভয়াবহ মূর্তিতে অভিযাত্রীদের নিষেধ করছে—'আমার কাছে এসো না, পতন অনিবার্য।' পূর্বদিকে কাংটেগা পর্বতের শ্রেণী। দক্ষিণে কোয়েঙ্গী। দক্ষিণ-পশ্চিমে সিপাহী পর্বত। ১৯৫৬ সনে সুইস অভিযাত্রীরা ছাড়া তার শীর্ষস্পর্শ করা আর কারও সাধ্যে কুলোয়নি।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আবছা আলো-আঁধারে নদীর ওপারটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। বাড়িগুলোকে এখন আর স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না। লোকজনের আনাগোনা মন্থর হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। সর্বত্র নামছে যেন একটা থমথমে ভাব। কিছুক্ষণ বাদে ওপারের কিছুই আর দেখা যাবে না। সবই মিলিয়ে যাবে অন্ধকারের কালো যবনিকায়। এখানে বৈদ্যুতিক আলো নেই। সে আলো এখানে

অলীক-স্বপ্ন মাত্র। আর শুধু এখানেই বা কেন, সারা নেপালে দু-একটি শহর ছাড়া কোথাও এর অস্তিত্বও দেখতে পেলুম না। ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠবে না তাই নদীর ওপার অজস্র বৈদ্যুতিক বাতির গৌরবে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে যাবে সমগ্র অঞ্চলটা।

টেণ্টের ওপাশটা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে উঠেছে। বুঝলুম পোর্টাররা রান্নাবান্নার আয়োজন করছে। কৌতূহলবশত ঘুরতে ঘুরতে আমরা ওদের মধ্যে গিয়ে হাজির হলুম। সমাদর করে ওরা বসাল আমাদের। দেখলুম, ওদের অধিকাংশই ভাত আর ডাল রাঁধছে। খুব বেশী কিছুর মধ্যে কেউ যদি কিছু করে তা হচ্ছে আলুপোড়া। বাস্‌। এর বেশী আর ওরা কিছু চায় না। এইতেই ওরা সন্তুষ্ট।

অতিথি হিসেবে ওরা আমাদের বিনীতভাবে আলুপোড়া আর নুন দিয়ে আপ্যায়ন করল। ওদের আতিথেয়তা আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারলুম না। বরং সাদরে তা গ্রহণ করলুম। ওরা খুবই খুশী হল। হাল্কা মনে এর পর আমরা ওদের সঙ্গে গল্প শুরু করলুম। এমন সময় খবর এল লীডার আমাদের ডাকছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়তে হল গল্প অসম্পূর্ণ রেখে।

আজকের অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয় হল নতুন জলবায়ু অভ্যাস নিয়ে ও আগামী কালের কার্যক্রম নিয়ে। আলোচনাশেষে দেখা গেল, কর্মসূচী অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু উপায় কী? সেই মতই কাজ চালাতে হবে এবার থেকে। অ্যাক্‌লামাটাইজেশন প্ল্যানের ব্যাপারে আমার ওপরও বিশেষ কতকগুলো কাজের ভার পড়ল। সেগুলোর চূড়ান্ত মীমাংসা করতে গিয়ে বেশ দেরিও হয়ে গেল।

যা হোক, কাজ শেষ করে রুগী দেখতে লেগে গেলুম যথানিয়মে। আজকের রুগীদের অনেকেই চোখের কষ্টে ভুগছে। কয়েকজনের অবস্থা আবার আশঙ্কাজনক—সব প্রথমে ওদেরই দিকে মনোযোগ দিলুম।

সমস্ত দিনের কর্মব্যস্ততায় সন্ধ্যেবেলাটা বড় বিশ্রী লাগছিল।

চুপি চুপি তাই ক্যাম্পে এসে শুয়ে পড়েছিলুম। ডিনারের ঘণ্টা শুনে আবার উঠে বসলুম। এতক্ষণ ক্ষিদের কথা মনে ছিল না। এবার মনে পড়ল। বুঝলুম এখন আর না খেলেই নয়, আগুন জ্বলছে পেটে।

মেস-টেণ্টে এসে দেখি, বিরাট আয়োজন। রাজকীয় ব্যাপার এক কথায়। পুরনো বাক্সগুলো একের পর এক সাজিয়ে টেবিল ও চেয়ার বানানো হয়েছে। মাঝখানে রাখা হয়েছে বড় বড় দুটো হ্যাসাক। এক পাশে রেডিও। বহুবিধ রান্নার মিষ্টি গন্ধে ভরপুর টেণ্টখানা।

খুশী মনে আজেবাজে গল্প করতে করতে খেয়ে চলেছি। এমন সময় লীডার আমাদের একটা দুঃসংবাদ দিলেন—আমাদের অতি প্রিয় 'কুক' থণ্ডুর স্ত্রী মারা গেছে। খবরটা নাকি ওয়্যারলেসে একটু আগেই এসেছে। চমকে উঠে থণ্ডুর দিকে তাকালুম। দেখলুম, থণ্ডু কাঁদছে। সমবেদনায় মনটা আমার হায়-হায় করে উঠল। ক্ষণিকের জন্যে সকলেই যেন মুষড়ে পড়ল এই মর্মান্তিক বিয়োগব্যথায়। থণ্ডুকে অল্প দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সে আর থাকতে চায় না আমাদের সঙ্গে। কালই রওনা হবে দার্জিলিঙে। সেখানে আছে ওর নাবালক ছেলেমেয়েরা। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ এখন থেকে ওকেই করতে হবে।

থণ্ডু শুধু বিখ্যাত 'কুক'ই নয়, ও একজন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। এর আগে ও আর দুটো এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিল। আর ওরই কপালজোরে কি-না জানি না, সে দুটো অভিযানই সফল হয়েছিল। সেই থেকে আমাদের ধারণা যে, ও অভিযানের মস্ত একটা পয়মন্ত। কিন্তু আজ আর ওকে থাকতে বলা যায় না। ওকে ছেড়ে দিতেই হবে। ওর জন্যে আমরা সকলে কিছু কিছু করে দিয়ে নগদ তিনশো এক টাকা সংগ্রহ করলুম। সেটা ওর হাতে তুলে দিলুম ওর নাবালক ছেলেমেয়েদের জন্যে।

থণ্ডু অজাতশত্রু। সকলেই ওকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ওর

গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং বলেন, Thondup was not only an excellent cook, but was really a good man. His experience and advice on routine administration and selection of camp sites had been invaluable to us. I could see that the possibility of his leaving the expedition affected the morale of the Sherpas and members alike. He was a very popular and well-respected Sherpa. We could see that he was really sorry to leave but was helpless. Thondup was a gem of a man and with his experience and sound judgment, an asset to the expedition, but he must go to his children.

২৫শে মার্চ ॥ শুক্রবার

ঘুম ভেঙে গেল। দরজাটা ফাঁক করে দেখলুম, বাইরেটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঘড়িতে পাঁচটা। ফিরে আর শোয়া যায় না। থণ্ডু আজ চলে যাবে। বিদায়কালে আর-কিছু না পারি, ওর কাছে গিয়ে অন্তত একবার দাঁড়াতে হবে। বেচারী থণ্ডু—ঘর ছেড়ে ও এসেছিল এই ভীষণ-ভয়ঙ্কর পথে ছুটো পয়সা রোজগারের জন্যে। কিন্তু পরিণামে কী পেল? সুখ-দুঃখের চিরবিশ্বস্ত সাথী স্ত্রী হারানোর বেদনা! আর ছন্নছাড়া সংসারের অপরিহার্য বোঝা।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার জন্যে ও প্রস্তুত হল। লামু, ঝুরা, লছমীরা সব দূরে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ ঝুরা দৌড়ে এসে ওর হাত দুটো চেপে ধরল—'দাদা, চললেন!'

—'হ্যাঁ বোন। তোদের নিয়ে এক সঙ্গেই তো ফিরব ভেবেছিলুম। তা আর হল কই?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ও। ঝুরা কাঁদতে লাগল ছেলেমানুষের মত। থণ্ডুরও চোখে জল। বলল, 'কেঁদে আর করবি কী বল? এখনও যে আমার অনেক কান্না বাকী রে! তোরা যেমন করে কেঁদে হাল্কা হয়ে যাস্ তেমন করে একবার যদি কাঁদতে পারতুম!'

ঝুরা ওর হাত ছেড়ে দিল। চোখ মুছে বলল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

—তা তো বলতে পারি না। বন্যার স্রোতে কুটোর মত আমরা এসে এক জায়গায় মিলে গিয়েছিলুম। আবার ভেসে চলেছি রিক্ত-সর্বস্ব হয়ে একাকী অনির্দিষ্টের মধ্যে। কোথায় গিয়ে উঠব, কী যে করব, তার কিছুরই হিসেব রাখতে পারছি না এখন!

চলতে লাগল থণ্ডু ধীরে ধীরে। রাজু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার এগিয়ে গেল ওর সঙ্গে ওকে কিছু দূর এগিয়ে দিতে। পেছনে অপলক চোখে আমরা থণ্ডুর দিকে চেয়ে রইলুম যতক্ষণ না ও আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

ভারাক্রান্ত মনে তাঁবুর দিকে পা বাড়ালুম।

হাতে অনেক কাজ। আজই নতুন জলবায়ু সহ্য করার অভ্যাস সম্বন্ধে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সকাল আটটায় তার অধিবেশন আছে। এর প্রস্তুতি হিসেবে ডাক্তারদেরও দায়িত্ব কম নয়। সুতরাং ভগ্নানী ও আমাকে দলের সকলের জীবনীশক্তি, রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষার কাজ যতটা সম্ভব সেরে ফেলতেই হবে। ব্রেক-ফাস্টটা কোনরকমে সেরে নিয়ে অধিবেশনে গিয়ে যোগ দিলুম। দেখলুম, আমার আগেই সকলে এসে গেছে। বিরাট একটা ম্যাপ খুলে তার ওপর এক রকম মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কুমার, কেকী ও কোলী। লীডার একটা ছড়ির প্রান্ত দিয়ে চিহ্নিত করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন নির্ধারিত দিনে কোন্ দল কোন্ দিকে যাবে।

ঠিক হল নতুন জলবায়ু সহ্য করার খসড়া অনুযায়ী প্রথম দিকে যে

যার ইচ্ছেমত সঙ্গী নিয়ে ইচ্ছেমত যে কোন পাহাড়ে উঠবে—১৬।১৭ হাজার ফুট পর্যন্ত। আর সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসবে ক্যাম্পে। বর্তমান ক্যাম্পটার উচ্চতাই তো এখন ১৩ হাজার ফুট।

আরও ঠিক হল, নতুন জলবায়ু সহ্যের অভ্যাস করে শেষের দিকে সমগ্র দলটা তিনটে দলে ভাগ হয়ে যাবে। প্রথম দলে থাকবে—আঙতেম্বা (বিখ্যাত শেরপা) কেকী, কোলী ও জঙ্গল। ওরা যাবে লোবুজ হয়ে কুম্ভ গ্লেসিয়ারের তলায়। সেখানে বেস-ক্যাম্প তৈরি করে ওরা 'আইস-ফলে' কাজ শুরু করবে। কাজের সময়ও নির্ধারণ করা হল এপ্রিলের গোড়ার দিক। ওই দলের্ নতুন জলবায়ু সহার অভ্যাসকরণের পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখিতভাবে একটা বিবরণ লীডারের কাছে দাখিল করার ভার পড়ল কেকীর ওপর। দ্বিতীয় দলে থাকবে—দানামগিয়াল, কুমার, মিত্র ও ভোরা। ওরা যাবে আমাদাবলাম্ অভিমুখে। ওদের শিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করার ভার পড়ল কুমারের ওপর। গাম্বু, সোনাম, রাজকাপুর (শেরপা) ও চাও (চৌধুরী) থাকবে তৃতীয় দলে—ওদের পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার নিল রাজকাপুর।

এর পর আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা চলল। সেই অনুসারে ঠিক করা হল বেস-ক্যাম্পের পর কবে কোথায় কতখানি উঁচুতে কোন্ ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। আর কে কে কোথায় কাজ করবে। অধিবেশনের শেষে লীডার একটা বক্তৃতা দিলেন। তার মধ্যে তিনি একটি কথায় খুব বেশী জোর দিলেন—নতুন জলবায়ু সহ্য করার অভ্যাসকরণের সময় আমরা যেন কোন ব্যাপারে কোন রকমের ঝুঁকি না নিই! কারণ এই ধরনের ঝুঁকি নেওয়ার দরুন প্রথম পর্যায়েই যদি কোন অঘটন ঘটে, তা হলে সেটা সমস্ত দলের পক্ষে ভীষণ নিরুৎসাহজনক হবে। তাই ঝুঁকি যদি নিতেই হয় তা এভারেস্টে গিয়ে নেওয়াই ভাল।

বক্তৃতা শেষ করে লীডার এলেন শেরপাদের কাছে। ওরাও আজ

সমবেত হয়েছে ওঁর কাছে কিছু শুনবে বলে। উদাত্তকণ্ঠে তিনি ওদের যা বললেন তার সারমর্ম হল এই—

শেরপা ভায়েরা যেন এই অভিযানটাকে নিজেদের অভিযান বলেই ভাবে। আজকের অভিযানের সাফল্য শুধু মেম্বারদের ওপরেই নয়—তাদের ওপরও বহুলাংশে নির্ভর করছে। তাই পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলতে হবে। একের ত্রুটিতে অন্যকে বিমর্ষ হলে চলবে না, বরং সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে তা সংশোধন করে নিতে হবে সকুণ্ঠচিত্তে। আজকের এই তীর্থযাত্রায় কৃতকার্য যদি হওয়া যায় তার মুখ্য প্রেরণা যে শেরপা ভায়েরা—এ কথা তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেন।

বক্তৃতাশেষে আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলুম আজকের জীবনতত্ত্বের পরীক্ষার (Physiological test) কথা আর সেই সঙ্গে এখুনি প্রস্তুত হবার কথাও।

ডিসপেন্সারিতে এসে দেখি যন্ত্রপাতি সবই ঠিক গোছানো আছে। রাজু কথামত আগে থেকেই যে সব ঠিক করে রেখেছে তা আর আমার বুঝে নিতে দেরি হল না। রাজুর সব ভাল, তবে ওই একটা মস্ত দোষ—সময় সময় আমার অলক্ষ্যে মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে শেরপা-শেরপানীদের কাছে নাড়াচাড়া করে। উদ্দেশ্য আর-কিছুই নয়, নিজেকে জাহির করা ছাড়া। ওরা তাতে আমোদ পায় খুব আর ওইতেই ওর পরিতৃপ্তি। আজও ও স্বভাবমত আমার একমাত্র জীবনীশক্তি মাপবার যন্ত্রটা (spirometer) নিয়ে শেরপাদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। দোষের মধ্যে আমি ওকে ওর ব্যবহারটা শিখিয়ে দিয়েছি—এইমাত্র। যেমন ওকে শিখিয়ে দিয়েছি কতকগুলো রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা। কিন্তু আজকের বেয়াদপিটা ওর মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে হল—কারণ এইটেই আমার একমাত্র যন্ত্র, দ্বিতীয় নেই! ভাঙলে একেবারে খোঁড়া হয়ে যেতে হবে ওই মাপামাপির ব্যাপারে। তাই ভীষণ রেগে ওকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলুম। ভয়ে ও বিবর্ণ হয়ে গেল।

কাজ আরম্ভের আগে মেম্বাররা জীবনীশক্তি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইল। ওদের ব্যাপারটা বোঝানো কষ্টকর। তবু বোঝাতে চাইলুম—সাধারণভাবে আমরা যে নিশ্বাস নিই তাতে ৫০০ সি. সি. মাত্র বায়ু আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে আর তা বেরিয়েও আসে একই নিয়মে—একে বলে বায়ুস্রোত (tidal air)। এই সাধারণ নিশ্বাস ছাড়া খুব জোরে নিশ্বাস নিয়ে আমরা ৩০০০ সি. সি. পর্যন্ত বায়ু ফুসফুসে ঢোকাতে পারি—একে বলে অনুপূরক বায়ু (complemental air) ঠিক একই নিয়মে আমরা সাধারণ প্রশ্বাসের পর আর-কিছুটা বায়ু বারও করে দিতে পারি। এই জোর করে বায়ু বার করে দেওয়ার পরিমাণ হিসেব করে দেখা গেছে ১০০০ সি. সি.—এটাকে বলে পরিপূরক বায়ু (supplemental air), আর এই অনুপূরক ও পরিপূরক বায়ুর সমষ্টিই হল জীবনীশক্তি। এই জীবনীশক্তি যার যত বেশী সে তত ভাল কাজ করতে পারে উঁচুতে। তার কারণ সমতল-ভাগে বাতাসের ব্যারোমিটার চাপ ৭৬০ মিলিমিটার আর অক্সিজেন প্রসারণতা (টেন্‌শন্) ১৫৮·২৫। সেখান থেকে যত উঁচুতে আমরা উঠতে থাকি ব্যারোমিটার চাপ ততই কমতে থাকে—সেই সঙ্গে অক্সিজেনের পরিমাণও! ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টটাও বাড়তে থাকে একটু একটু করে। তাড়াতাড়ি নিশ্বাস নেওয়ার (Hyperventilation) প্রচেষ্টা থেকে তা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়। এই সঙ্গে এই কথাটাও মনে রাখা দরকার, পাহাড়ী-রোগের (Mountain sickness) উৎপত্তি এই অক্সিজেনের অভাব থেকে। তাই জীবনীশক্তি যার যত বেশী তার তত উঁচুতে পাহাড়ী-রোগ হবার সম্ভাবনা কম।

বোঝানো শেষ করে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলুম। একে একে সকলের জীবনীশক্তি পরীক্ষা করতে লাগলুম। শেরপাদেরও বাদ দিলুম না। ভগ্নানী সমানে আমায় সাহায্য করে চলল।

জীবনীশক্তি পরীক্ষার পর রক্ত পরীক্ষা করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অধিকাংশের অনিচ্ছায় আজকের মত ওটাকে স্থগিত রাখতে হল।

স্বল্পসময়সাপেক্ষ বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষাটাই (Intelligence test) তাই এই সময় করে নেওয়ার মনস্থ করলুম। কুমার এটাকে মস্ত কিছু একটা ভেবে বলল, 'বিশেষ একটা জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে। সেরে আসছি এখুনি।'

—'থাক্, এতক্ষণ যখন সারা হয়নি তখন আর কিছুক্ষণেও কিছু যাবে-আসবে না।' গম্ভীর হয়ে বললুম ওকে।

লীডার হাসতে হাসতে বললেন, 'তা বটে।'

ফলে কুমারের আর তু জন সঙ্গী সোনাম ও চাওয়েরও যাওয়া হল না।

ওদের ভয়টা এবার ভাঙতে ওদের খুলে বললুম পরীক্ষার রহস্যটা। প্রত্যেককে একটা করে ছাপা কাগজ দেওয়া হবে, তাতে অনেক সংখ্যা বসানো আছে, তার সাহায্যে আমার কথামত প্রত্যেককে একটা সাধারণ হিসেব করতে হবে।

ব্যাখ্যাটা ঠিক অনুধাবনযোগ্য হল কি-না জানি না, তবে সকলে বেশ উৎসাহের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে বসে পড়ল। ব্রিগেডিয়ারও গম্ভীর হয়ে বসলেন ওদের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে।

এরপর করতে চাইলুম সকলের দৈহিক কর্মক্ষমতার পরীক্ষা। এর সাহায্যে প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থার একটা সাধারণ পরিমাপ করা যাবে। পরীক্ষাটার পদ্ধতি—সামনে বিশ ফুট উঁচু একটা বাক্স খাড়া করা আছে। তার ওপর পরীক্ষার্থীদের একে একে ওঠা-নামা করতে হবে সাধ্যানুযায়ী। প্রতি ওঠা-নামায় হবে একটা চক্র। চল্লিশটা চক্রে হবে এক মিনিট। ওঠা-নামার পর্ব শেষ হলে—দেড় থেকে তু মিনিট বিশ্রাম। তারপর পরীক্ষা অর্থাৎ পালস্ গণনা।

এই পরীক্ষার প্রথম গিনিপিগ করলুম আমি কুমারকে। ও কিছুতেই আসতে চায় না দেখে ব্রিগেডিয়ার নিজেই এগিয়ে এলেন। কিন্তু ওঁরও কিছু করার আগে সোহন হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে সোজা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে গেল। বেশ ক'বার ওঠা-নামার পর

হাঁফাতে হাঁফাতে ও একেবারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। চিঁ-চিঁ করতে করতে কোন রকমে ও উচ্চারণ করল, 'দেখ তো ডাক্তার আমার পালস্‌টা।'

না দেখেও বলতে হল, 'বাঃ, বেশ ভালই তো দেখছি।'

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে বসল। আস্ফালন করে কুমারকে বলল, 'বয়স আমার পঞ্চাশ হলে কী হবে, শক্তিতে এখনও আমি তোমাদের গুরু।'

—'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। গরুর মত তা না হলে ঝিমোতে হয়।' ভ্রু কুঁচকে কুমার জবাব দিল।

—'কী বললে?' লাফিয়ে উঠল সোহন।

ভয় পেয়ে কুমার ছুট দিল উর্ধ্বশ্বাসে।

প্রয়োজনীয় কাজগুলো চুকিয়ে নিতে ছুটো বেজে গেল। ক্ষিধেয় নাড়ী চুঁই-চুঁই করছে। এখুনি কিছু না খেলেই নয়।

বিকেলবেলা আজ অনেকেই অক্সিজেন-মুখোশ পরে নতুন উদ্যমে তার ব্যবহার সম্বন্ধে তৎপর হয়ে উঠেছে। কারণটা আর-কিছুই নয়, আজ এই ব্যাপারে আলোচনাটাই ওদের নিজেদের সম্বন্ধে রীতিমত সন্দিহান করে তুলেছে। তারই ফল—এই। গাম্বুও দেখি একটা অক্সিজেন-মুখোশ পরে পিঠে সিলিণ্ডার ঝুলিয়ে সামনের পাহাড়টার প্রায় ছু-তিন শো ফুট উঁচুতে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে মুখ গোমড়া করে ফিরে এসে খুলে ফেলল ওর মুখোশটা। তারপর অভ্যস্তভাবে 'নো গুড্, নো গুড্' বলতে বলতে চলে গেল তাঁবুর আড়ালে।

সন্ধ্যের পর আজও একটা নাচগানের আসর হল। শেরপানীদের আজ আর নাচে কোন কুণ্ঠা দেখলুম না। সাবলীল ভঙ্গিমায় ওরা নেচে চলল গোড়া থেকে। ওরা ছুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। প্রথম দলটা নামচেবাজারের আর দ্বিতীয়টা খুমজুংয়ের। হাত-ধরাধরি করে ওরা দ্রুততালে একবার কয়েক পা পিছিয়ে যাচ্ছে আবার এগিয়ে আসছে ঠিক সেই কয়েক পা একইভাবে। মুখে ওদের গানের ছু-একটি কলি।

অস্পষ্ট হলেও শোনা যাচ্ছে। দুটো দল হওয়ার ফলে ওদের মধ্যে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাল কখনও দ্রুত উঠছে আবার কখনও দ্রুত নামছে। আসর বেশ সরগরম হয়ে উঠলে মেম্বারদেরও কেউ কেউ উঠে গেল নাচতে। এরই মধ্যে একবার শেরপা-শেরপানীদের ছাঙ এবং মেম্বারদের কোকো বিতরণ করা হল। বিতরণ করল রাজু। মাঝখানে জ্বালা রয়েছে মস্ত একটা অগ্নিকুণ্ড। তারই অস্পষ্ট আলোয় সমগ্র জায়গাটাকে কেমন যেন রোমান্টিক দেখাচ্ছে।

নাচ শেষ হলে যে যার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে স্পষ্ট এখনও যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, শেরপা-শেরপানীরা নেচে চলেছে অবিশ্রান্তভাবে—কাল থেকে কালান্তরে। ওদের নাচের শেষ নেই—ওদের গানের একঘেয়েমি নেই, কারণ ওদের স্ফূর্তির অভাব যে নেই একটুও।

২৬শে মার্চ ॥ শনিবার

আকাশটা বেশ পরিষ্কার। সূর্য ওঠার আর দেরিও নেই তত। স্নিগ্ধ মোলায়েম আবহাওয়া আবেশ লাগাচ্ছে মনে। বিহ্বল দুটো চোখ মেলে দেখছি শুধু প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য। এমন সময় অদূরের ক্যাম্প থেকে ভেসে এল জঙ্গলের গলা। দুটো কথা কইবার জন্তে সহসা মনটা কেমন যেন ছটফট করে উঠল। এগিয়ে গেলুম ওর ক্যাম্পের কাছে। ঢোকা আর হল না ওর সোহাগমাখা কণ্ঠ শুনে। চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলুম। ও বলছে—'এই দূর লোকালয়হীন পরবাসে দেখছি তোকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছি। মুহূর্তের জন্মে তাই তুই চোখের আড়াল হলে আমিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী বিব্রত বোধ করি। কদিনে তুই কী করে আমায় এমন করে অভিভূত করলি বলতে পারিস 'তাসি' ?'

এই রে, এ যে একেবারে মেয়েমানুষের নাম। পর্বত-অভিযানে এসে শেষে কি না প্রেম-নিবেদন! ছি-ছি-ছি, কাকে করছে হতভাগাটা! মনে মনে ভাবছি কথাগুলো।

আবার ওর গলা ভেসে এল—'তোরা সবাই স্বার্থপর। তোরা এ সবের মর্ম কিছু বুঝিস না, বুঝতে চাসও না। তাই যার কাছে দু মুঠো পাস অম্লানবদনে তার কাছেই চলে যাস। ফিরেও চাস না পুরনো মানুষটার দিকে—তার কী হল, কী হতে পারে? এমনি নিমকহারাম, হৃদয়হীন তোরা।'

হওয়াই উচিত। নীতিভ্রষ্ট যারা তাদের শাস্তি ওদের দিয়েই ভগবান কড়ায়-গণ্ডায় দেন। নাঃ, তাতে দেরি হয়ে যেতে পারে। এখুনি লীডারকে গিয়ে সব কথা খুলে বললে কী হয়? বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই এমন কত জল্পনা-কল্পনা করছি মনে মনে।

আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'আচ্ছা 'তাসি', কার্যসিদ্ধি করে ধর্ আমরা ফিরে এলুম। তারপর জয়ের মুকুট পরে আমরা নিশ্চয়ই একবার যে যার বাড়ি যাব। তুইও তখন আমার সঙ্গে যাবি তো? সকলেই তোকে আদরযত্ন করবে, ভালবাসবে। কী রে, যাবি তো? ঠিক এমন করে আমার বুকে উঠে আমায় আদরযত্ন করবি তো? কী রে, বল্ কিছু! বল্ না দুষ্টু!'

বলাচ্ছি রাসকেল্। প্রলোভন দেখিয়ে একজনকে টেনে বার করে নিয়ে যেতে চাইছ তার সর্বনাশ করতে! এতদূর স্পর্ধা! দাঁড়াও, আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন! যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করবই এখুনি।

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লুম টেণ্টে। কিন্তু এ কী! দারুণ একটা উত্তেজনা যে দৃশ্যটাকে কল্পনা করে আমায় ভয়ঙ্করভাবে ক্রোধোন্মত্ত করেছিল, প্রকৃত ব্যাপারে তার কোন সাদৃশ্য নেই দেখে আমি যেন কী রকম হয়ে গেলুম। মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুট পর্যন্ত হল না কিছুক্ষণ।

জঙ্গল বোধ হয় কিছুই তার নজর করেনি। তাই স্বাভাবিকভাবে

জিজ্ঞেস করল, 'কি হে ডাক্তার, হঠাৎ যে বড় এ-সময়! কী মনে করে?'

ছ্যাঁত্ করে উঠল বুকের ভেতরটা। কাষ্ঠহাসি হেসে বললুম, 'এ-ম-নি।' চার-পাঁচবার ঢোক গিলে গলাটাকে ভিজিয়ে নিয়ে কোন রকমে আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'তা কুকুরটার (সেই বিরাট তিব্বতী কুকুরটা, যার সঙ্গে আমাদের আগে পরিচয় হয়েছে) নাম বুঝি 'তাসি'?'

জঙ্গল উচ্চহাস্য করে বলল, 'তাও বুঝি জান না। আরে ব্রিগেডিয়ার স্বয়ং যে ওর ওই নামটা রেখেছেন।'

জঙ্গল মহৎ, জঙ্গল উদার, জঙ্গল পুরুষোত্তম। কিন্তু আমি? থাক্। সে-কথায় আর কাজ নেই। ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলবারও সাহস নেই এখন আমার। পালিয়ে এলুম তাই কোন রকমে ওর টেণ্ট ছেড়ে।

প্রাতঃকালীন যা-কিছু সব সেরে নিয়ে ব্রেক-ফাস্টের জন্যে প্রস্তুত হলুম। আমাদের নতুন 'কুক' অ্যাংশ্রীং আয়োজনের ত্রুটি করেনি কিছু—পুরি, ক্রনফ্লেক্স্, তরকারি, ডিম, দুধ, জ্যাম, লিভার, কিডনি, হালুয়া সবই ও তৈরি করে রেখেছে।

মৌজ করে ব্রেক-ফাস্টটা সেরে গেলুম অ্যাসিস্টেণ্ট পোর্টার-সর্দার সোনামের কাছে। ও এখুনি রওনা হচ্ছে বেস্-ক্যাম্প অভিমুখে, দু শো জন পোর্টার নিয়ে। সেখানে ওরা রেখে আসবে আগামী দিনের কিছু কিছু খাবার, সাজ-সরঞ্জাম, অক্সিজেনের যন্ত্রপাতি আর কিছু জ্বালানী কাঠ। ডাক্তারী সরঞ্জামগুলো সব ঠিক আছে কি না একবার ভাল করে পরখ করে নিলুম। পোর্টাররা সব হাসি-খুশি। সুস্থ সবল ওদের দেহ ও মন। ওদের সম্বন্ধে চিন্তিত হবার কোন কারণই নেই। সর্দারের নির্দেশে ওরা যথাসময়ে যাত্রা শুরু করল।

লীডারের টেণ্টের সামনে পাশাপাশি উড়ছে নেপালের ও আমাদের জাতীয় পতাকা। ওই পতাকা দুটোর রঙের আকর্ষণেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, কতকগুলো ইয়ক এসে জড়ো হয়েছে ওখানে। গোপাল ইয়কগুলোর ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরা নিয়ে

তৈরী হয়ে দাঁড়াল। ইয়কগুলো বোধ হয় তাতে বিরক্ত বোধ করল। ওর মধ্যে একটা ইয়ক হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল গোপালের দিকে। ব্যাপারটা সুবিধের নয় বুঝে ও বেচারী আস্তে আস্তে কেটে পড়ল।

সাড়ে-দশটার সময় পূর্ব ঘোষণানুযায়ী অধিবেশনে গিয়ে যোগ দিলুম। সকাল থেকে অনেক মেম্বারই আজ ব্যস্ত ছিল নতুন জলবায়ু সহনের অভ্যাসকরণ পরিকল্পনা তৈরি করা নিয়ে। এখন দেখি, সকলেই এসে গেছে। দাখিলও করেছে সকলে যে যার পরিকল্পনা লীডারের কাছে। লীডার সেগুলো আবার একটা একটা করে আমাদের পড়ে শোনালেন। পরিকল্পনা অনুসারে দেখা গেল—প্রথম দল পয়লা এপ্রিল যাবে লোবুজে। সেখানে পাঁচ তারিখ পর্যন্ত থেকে সাত তারিখে ওরা গিয়ে উঠবে এভারেস্ট-বেসক্যাম্পে। তারপর সাত তারিখ থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত ওরা কাজ করবে আইস-ফলে।

দ্বিতীয় দল প্রথমে যাবে আমাদাবলামের উত্তরে ডিংবুচের ছোট ছোট শৃঙ্গগুলোতে (১৯।২০ হাজার ফুট)। সেখান থেকে বারো তারিখে ওরা গিয়ে উঠবে বেস-ক্যাম্পে। প্রথম দল তখন আইস-ফলের সব কাজের ভার ওদের ওপর ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে লোবুজে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে।

তৃতীয় দল প্রথমে যাবে তাওয়াচে। সেখান থেকে ওরা যাবে উনিশ-কুড়ি হাজার ফুট উঁচু নুপৎসের দক্ষিণের শৃঙ্গগুলো পর্যবেক্ষণ করতে।

পড়া শেষ হলে মেম্বাররা আমায় নতুন জলবায়ুসহনের প্রয়োজন ও উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলতে বলল। বুঝলুম এই-ই সুযোগ। সকলেই আছে। ঠিকমত বোঝাতে পারলে রক্তপরীক্ষার নমুনা নিতে আর কারও কাছে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। উৎসাহের সঙ্গে তাই বলতে লাগলুম গতকালের সূত্র ধরে—

যতই ওপরে আমরা উঠতে থাকি অক্সিজেন সম্প্রসারণতা ততই কমতে থাকে, ফলে শরীরযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলো পরিবর্তন ধীরে ধীরে পরিলক্ষিত হতে থাকে। সেই পরিবর্তনগুলো

আমাদের সুউচ্চ ভূভাগে শরীরকে টিঁকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। পরিবর্তনগুলো আর-কিছুই নয়—শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবৃদ্ধির ফলে প্রচুর পরিমানে কার্বণ-ডায়োক্সাইডের নির্গমন ও তদনুযায়ী অক্সিজেন পরিপূরিত হওয়া। হৃদ্‌যন্ত্রের দ্রুত কম্পনের ফলে রক্তপ্রবাহের গতি-বৃদ্ধি। ফলে রক্তকণিকা ও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি। এই প্রসঙ্গে আরও জানা দরকার উপযুক্ত পরিমাণ রক্তকণিকা ও হিমোগ্লোবিন শরীরে না থাকলে কিংবা উচ্চ ভূভাগের আবহাওয়ানুযায়ী ওগুলোর প্রয়োজনানুরূপ সৃষ্টি না হলে নানা ধরনের রোগের আক্রমণ হবার সম্ভাবনা থাকে। সমতল থেকে একাদিক্রমে উচ্চ ভূভাগে যাওয়া যায় না। কারণ শরীরযন্ত্র ক্রমপরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। তাই নতুন জলবায়ু সহনে অভ্যাসকরণ প্রয়োজন। আর এই সময়েই বিশেষ করে দেখা যায় উপরোক্ত জিনিসগুলোর আশানুরূপ উৎপাদনের অভাবে বিশেষ বিশেষ অভি-যাত্রীকে বিশেষ বিশেষ রোগে আক্রান্ত হতে। রোগগুলো নিম্নরূপ—

একেবারে ক্ষিধে না হওয়া, ঘুম না হওয়া, অসহ্য মাথার যন্ত্রণা, ভীষণ কাশি, বুক ধড়ফড়ানি, হাত-পা ঝিমঝিম করা, সারা শরীরে বেদনা, ইত্যাদি।

শুধু এই সব শারীরিক রোগই নয়, আশ্চর্য রকমের মানসিক রোগও দেখা গেছে কারও কারও মধ্যে। সেগুলো যেমন—

নিরীহ লোকের খিটখিটে হয়ে ওঠা কিংবা বিচক্ষণ লোকের উদাসীন হয়ে যাওয়া। আমুদে লোকের বিমর্ষ হয়ে পড়া কিংবা গম্ভীর লোকের বাচাল হয়ে ওঠা। এ ছাড়া আরও অনেক মানসিক রোগের নজীর পুরনো অভিযান-ইতিহাসে পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটা ঘটনার এখানে উল্লেখ করছি—

কোন এক অভিযাত্রী দীর্ঘদিন ধরে একই সহযাত্রীদের দেখতে দেখতে ভীষণ অতিষ্ঠ হয়ে শেষে তাদের খুন করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, পরক্ষণেই তার মত বদল হয় এই ভেবে যে, সে

তাদের স্ত্রীদের কাছে গিয়ে কী কৈফিয়ৎ দেবে? ফলে স্ত্রীভাগ্যে প্রাণে বেঁচে যায় ওই সব সহযাত্রীরা।

পাহাড়ের উপরিভাগে ব্যারোমিটার-চাপ ও অক্সিজেন-সম্প্রসারণতা (-tension) হ্রাসের অসুবিধেই একমাত্র অসুবিধে নয়। এ ছাড়া আছে প্রচণ্ড তুষারঝড়, ভয়াবহ অ্যাভালাঞ্চ, অভাবনীয় ঠাণ্ডা। সবশেষে আছে মারাত্মক সূর্যকিরণ। মারাত্মক এই জন্যে যে, ওই সব উচ্চতায় সূর্যকিরণে গা পুড়ে যায়, চোখ ঝলসে যায়, এমন কী অন্ধও হয়ে যেতে হয় সময় সময়। কারণ সূর্যকিরণে উল্লেখযোগ্য তিনটে রশ্মি—আলট্রা-ভায়োলেট রে, ইন্‌ফ্রা রে আর ভিজিব্‌ল্ রে ওই সব জায়গায় ভীষণ সক্রিয় থাকে। সমতলভাগে ওগুলোর সে সক্রিয়তা থাকে না, কারণ বাতাসে ভাসমান জলীয় কণায় ও অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণায় নিয়ত প্রতিহত হয়ে ওগুলোর প্রাখর্য বহুলাংশে হ্রাস পায়। তাই অভিযাত্রীদের পাহাড়ের উপরিভাগে যাওয়ার আগে ওই সব রশ্মির আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষার জন্যে সাজ-পোশাকের ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি।

সেবার কিছু সংখ্যক শেরপা নিয়ে উনিশ-কুড়ি হাজার ফুট ওপরে আমরা উঠেছি। বেলা তখন দুপুর। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর চারিদিকে। অসহ্য লাগছে সময়টা। এমন সময় কতকগুলো শেরপা হঠাৎ হৈ-চৈ করে ছুটে এল আমার কাছে নালিশ নিয়ে—তাদের চোখ ভীষণ জ্বালা করছে, চাইতে পারছে না কিছুতে। পরীক্ষা করে দেখলুম ভয়ঙ্কর স্ট্রেন পড়ার দরুন চোখ ওদের টক্‌টকে লাল হয়েছে। ওই ভাবে আর কিছুক্ষণ ওদের খালি চোখে থাকতে দিলে অন্ধ হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে কারও কারও। অত্যন্ত:বিচলিত হয়ে উঠলুম সেইজন্যে। আমাদের চোখে চশমা ছিল, ফলে আমাদের কিছু অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ওদের সে-সবের বালাই না থাকায় সূর্যালোকে চোখগুলো ওদের ওই ভাবে জখম হয়েছে। তাড়াতাড়ি তাই ওদের

কারও চোখ পাতলা কাপড় দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিলুম। আর কাউকে কাউকে, যাদের অবস্থা তখনও তেমন খারাপ হয়নি চুলের গুচ্ছ দিয়ে চশমা বানিয়ে দিলুম তখনকার মত। এই ভাবে তাদের সে-যাত্রায় রক্ষা করেছিলুম কোনক্রমে।

এবারে তাই আমরা ভুল করিনি। শুধু আমাদের জন্যেই নয়, শেরপা ও পোর্টারদের জন্যেও কমপক্ষে আমরা চশমা এনেছি তিনশোরও কিছু অধিক।

বোঝানো শেষ হলো। ওরা কিছু বুঝল কি না বলতে পারি না, তবে সকলেই দেখলুম রক্তপরীক্ষার মত রক্ত দিতে রাজী হয়ে গেল।

ডিসপেন্সারিতে বসে প্রত্যেকের রক্ত পরীক্ষা করতে করতে বিকেল প্রায় গড়িয়ে এল। ভগ্নানী আমায় সমানে সাহায্য করে চলেছে। এখানে এখন আর-কেউ না থাকায় মনোযোগটাও এসেছে খুব। আর মাত্র কিছু পরীক্ষা বাকী, এমন সময় হঠাৎ চাও এসে ঢুকল। বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'আরে, করছ কী এখন? ওদিকে কুমার যে বিস্ফোরক সম্বন্ধে মস্ত বক্তৃতা দিচ্ছে মেম্বারদের কাছে। পরীক্ষা এবার তার শুরু হয়ে গেল বলে।'

আর বসা গেল না। শুনে অবধি মনটা উসখুস করতে লাগল পরীক্ষাটা দেখার জন্যে। সব গুছিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম কুমারের কাছে। দেখি, ও তখনও একটা বিস্ফোরক হাতে নিয়ে সকলকে বোঝাচ্ছে ওটাতে আগুন ধরাবার কৌশল। অনেকে ওর কথা মন দিয়ে শুনছে বটে, কিন্তু ও কাছে ডাকা সত্ত্বেও কেউ ভয়ে ওর কাছে এগোতে সাহস করছে না। সবশেষে ও বিস্ফোরকটাকে ঠিকমত সাজিয়ে আগুন ধরাতে উদ্যত হল। আর তাই দেখামাত্র শেরপা, পোর্টার, এমনকি মেম্বারদেরও কেউ কেউ ছুটতে শুরু করল। দু-এক মিনিট পরেই বিস্ফোরকটা ভীষণ একটা শব্দ করে ফাটল আর সেই সঙ্গে সমস্ত জায়গাটা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। কাছে

গিয়ে দেখি, পাহাড়ের যে জায়গাটায় ওটা রাখা হয়েছিল সে জায়গাটায় বিরাট একটা গর্ত হয়েছে। আর ছোট ছোট অসংখ্য পাথরের টুকরোয় ভরে গেছে জায়গাটা। কুমার গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করল, 'মানুষ বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে সোজা পথেই চলতে চায়, কিন্তু বিস্ফোরকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ও যেদিকে বাধা পায় সেদিকেই ছুটে যায় সর্বাগ্রে।'

রাজকাপুর তার জবাবে বলল, 'মানুষের অমন ছোটার পেছনে হাত-পা ভাঙার ভয় আছে, কিন্তু বিস্ফোরকের মনে হয় তেমন কোন বালাই নেই।'

২৭শে মার্চ ॥ রবিবার

আজ থেকে নতুন জলবায়ু সহনে অভ্যাসকরণ আরম্ভ। সকলেই তাই বেশ সকাল সকাল উঠে পড়েছে। এরই মধ্যে শুনলুম কুমার, আঙ তেম্বা, কেকী, দানামগিয়াল বেরিয়ে পড়েছে। ওরা গেছে আমাদের ক্যাম্পের দক্ষিণের পাহাড়টায়। আমিও তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যোগ দিলুম গাম্বু, সোনাম ও চাওয়েদের সঙ্গে। ইচ্ছে, নদীর ওপারটায় প্যাংবুচের পাহাড়টায় চড়া। ব্রিগেডিয়ার, ভগ্নানী ঠিক করেছে ক্যাম্পের কাছাকাছি কোন পাহাড়ে যাওয়ার।

যা হোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা সকলে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের দলের গাম্বু আর সোনাম আগেই বেরিয়ে গেছে। আমি আর চাও ব্রেক-ফাস্ট সেরে বেরুলুম। নদীর ওপারে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত আমরা একসঙ্গেই গেলুম। হাজার তিনেক ফুট উঠলুমও। কিন্তু একটা মোড়ের মাথায় এসে আমরা দুজন দু'দিকে হয়ে গেলুম। যাওয়ার সময় চাও বলে গেল—দেখি, আমাদের মধ্যে কে আগে প্যাংবুচের শিখরে উঠতে পারে! আমি যে পথটা ধরলুম বোধ হয় সেটাই সবচেয়ে বেশী ঘুর পথ। ঘুরে-ফিরে, উঠে-নেমে

বহুক্ষণ ধরে চলতে লাগলুম। ক্ষিধেও পেয়ে গেছে খুব—কিন্তু খাবারের বাক্স চাওয়ের কাছে। অগত্যা ওর শ্রাদ্ধ করতে করতে চলতে লাগলুম প্যাংবুচের পথে। পৌঁছেও গেলুম এক সময় তার শিখরে। ক্ষিধে তেষ্টা আর ধরে রাখা যায় না। ঘায়েল হয়ে পড়েছি একেবারে। অসহায়ভাবে একবার চিৎকারও করলুম 'চাও, চাও' বলে। কিন্তু হায়, চাওয়ের কোন সাড়া-শব্দই পেলুম না!

এ-পর্যন্ত আমি প্রায় সতের হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছি। বাঁচতে গেলে নামতে হবেই যে-কোন প্রকারে। দারুণ একটা উত্তেজনায় ক্ষেপে গিয়ে তাই নামতে শুরু করলুম ক্ষিপ্রগতিতে। যেদিকে চাই সেদিকেই দিগন্তবিস্তৃত পাহাড় আর পাহাড়। ছোট-বড় অসংখ্য। একঘেয়েমি আসে দেখতে দেখতে। আমার কিন্তু এখন পাহাড় দেখার শখ একেবারেই উধাও হয়েছে। তৃষিত নয়নে খুঁজে মরছি শুধু চাওকে। দেখা যদি কোন রকমে একবার মেলে, বেঁচে যাই তা হলে এ-যাত্রায়। এমন সময় হঠাৎ বহুদূরে দেখতে পেলুম দুজন লোককে নীচের দিকে নামতে। চিৎকার করে ওদের ডাকলুম। হাত তুলে ওরা প্রত্যুত্তর দিল। ভাবলুম, চাও নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে আছে। আর দ্রুত নামতে লাগলুম সেই আশায়। কিন্তু হতাশ হলুম ওদের কাছে এসে। ওদের মধ্যে চাও কেউ-ই নয়—একজন সোনাম আর অপরজন গাম্বু। চাও তা হলে গেল কোথায়? মহাদুর্ভাবনায় পড়লুম। প্রকাশও করে ফেললুম তাই কথাটা ওদের কাছে। উদ্বিগ্ন হয়ে ওরাও আমার সঙ্গে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করল। গোদের ওপর বিষফোড়া নিয়ে আমি প্রায় নাজেহাল হয়ে উঠলুম। তিনটে বাজে। এলোমেলো ঘোরাঘুরি, চেঁচামেচিতে আর লাভ নেই। মনস্থ করলুম শেষে একটা পাকাপোক্ত সন্ধানী দল পাঠাবার, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যারা সর্বত্র অনুসন্ধান চালাতে পারবে। এমন সময় দেখি, মূর্তিমান ধীরে-সুস্থে অদূরের নদীটা পার হচ্ছে। চিৎকার করে ডাকলুম। শব্দটা ক্ষীণ আর্তনাদের মত মনে হল নিজেরই

কানে। যা হোক, সুখের কথা ও ফিরল। ওরই মুখে শুনলুম ওর অন্তর্হিত হওয়ার কারণটা। ও নাকি সোজাপথে আমার অনেক আগে প্যাংবুচের শিখরে পৌঁছেছিল। সেখান থেকে ও আমাকে উঠতেও দেখেছে শিখরে। তারপর ও চলে গিয়েছিল প্যাংবুচের মঠে, সেখান থেকেই ও নাকি ফিরছে।

ক্ষিধেয় পেটটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শোনার ধৈর্য এখন আমি হারিয়েছি। এ ছাড়া ওর বাহাদুরিতে মোটেই যে আমি খুশী হইনি, বরং অসন্তুষ্টই যে হয়েছি খুব সেইটেই জানিয়ে সোজা চলে গেলুম ক্যাম্পে।

ডিসপেন্সারিতে এসে সবেমাত্র বসেছি। কেউ কোথাও নেই। রাজু কালকের বাকী নমুনাগুলো (রক্তপরীক্ষার) সাজাচ্ছে। এমন সময় ঝুরা এসে ঢুকল। কোনখানে না দাঁড়িয়ে, কোনদিকে না চেয়ে সোজা ও আমার কাছে এসে বলল, 'একটা ট্যাবলেট দিতে পারেন ? বড় মাথা ধরেছে।'

কপালে লুটিয়ে পড়া চূর্ণ চুলগুলো ও ডান হাত দিয়ে ওপর দিকে তুলে দিল।

রাজু ওর কথায় কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'বিরক্ত করো না কাজের সময়।'

—ও-ওঃ, কত আমার কাজের রে! তবু যদি বুঝত কাজের কিছু। চিনির-বলদ কোথাকার!

রাজু ওর মন্তব্যে সায় দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তা তো বটেই। তবে আলটুসকি নই তোমার মত। কথায় কথায় ট্যাবলেট গিলি না যখন-তখন।'

ঝুরা গম্ভীর হয়ে উঠল। বুঝতে আর বাকী রইল না, ও রেগে উঠছে ভেতরে ভেতরে। রাজুও বোধ হয় সেটাকে বুঝতে পেরে গলাটাকে আর-এক পর্দায় তুলে জনান্তিকে বলল, 'আরে বাবা, অত যার ওষুধের বায়নাক্কা, তার এখানে না এসে কোন ওষুধ-

কারখানাতেই কাজের খোঁজ করা উচিত ছিল। ঢুকে যেত ল্যাঠা।'

'যাও, চাই না।' ভীষণ রেগে চলে যাচ্ছিল ঝুরা। ডাকলুম ওকে। হাতে ট্যাবলেটটা দিয়ে বললুম, 'ঝট্ করে অত রেগে যাও কেন? আর রেগে যাও বলেই তো তোমাকে আরো রাগাতে চায়। চুপ করে থেকে একদিন দেখ তো, ও কত বক্‌তে পারে।'

—'আমি কি আপনার কাছে শুধু শুধু ওষুধ নিতে এসেছি? লছমীদিকে জিজ্ঞেস করবেন চলুন তো, সেই দুপুর থেকে আমি মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছি কি না?'

ঝুরার গলা ভারী হয়ে এসেছে। কেলেঙ্কারি বাধাল বুঝি!

তাড়াতাড়ি সান্ত্বনার সুরে বললুম, 'কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। তোমার লাল চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তোমার অবস্থাটা।'

রাজু এবার গম্ভীর হয়ে সরে এল ঝুরার কাছে। সস্নেহে ওর একটা হাত ধরে বলল, 'হাওয়া দেব একটু মাথায়?'

—'খুব হয়েছে, থাক্। আর সোহাগ দেখাতে হবে না।' একটু থেমে ও আবার টিপ্পনি কাটল—'মুরোদ তো কত!'

—রাগ করলে?

—না, করবে না! মুখ দেখলেও পাপ হয় অমন মানুষের।

—আচ্ছা, ক্ষমা চাইছি। এবার হল তো।

ঝুরা গলে একেবারে জল হয়ে গেল। কিন্তু ওর কথা যেন কানেই তোলেনি এঁমনভাবে একগাল হেসে আমায় বলল, 'আমার জানলেন চুপ করে বসে থাকা একেবারে ধাতে সয় না। দুপুরবেলাটা আজ এত বিশ্রী লাগছিল সে আর আপনাকে কী বলব।' একটু থেমে রাজুকে কটাক্ষ করে—'আপনার কাছে কত লোকই তো গান গায়, আমার পোড়া কপালে আর কেউ জোটে না।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। রাজুর কাছে ও দুটো গান শুনতে চায়। কিন্তু রাজু বোধ হয় ধরতে পারেনি কথাটার ভাবার্থ। তাই ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে ও চেয়ে আছে আমার দিকে।

আমি অভ্যাসমত ঠিকই বললুম, 'কী যে বল !'

এমন সময় গুন্ গুন্ করতে করতে জঙ্গল এসে ঢুকল। কুমার পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞেস করল, 'গানের কী কথা বলছিলে ?'

'না, ও কিছু না।' কিছুটা অপ্রতিভের মত ও চলে গেল টেন্ট ছেড়ে।

আজ সকলেই প্রায় গড়ে ষোলো-সতেরো হাজার ফুট উঠেছে। সৌভাগ্যই বলতে হবে সামান্য সর্দি, কাশি, কী খুব জোর গা-বমি-বমি ছাড়া কারও বিশেষ কিছু অসুস্থতা দেখা যায়নি। সকলেই বহাল-তবিয়তে আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা শোনাবার চেষ্টা করছে সন্ধ্যের মজ্‌লিসে। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। সকলেই চায় নিজ নিজ কৃতিত্বকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে। সকলেরই গলা ক্রমে ক্রমে সপ্তমে চড়ছে। কেউ কারও কথা শুনতে চায় না। কেউ কারও কাছে হারতে চায় না। সকলেই স্ব স্ব ব্যক্তিত্বে, বিচক্ষণতায়, কষ্টস্বীকারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করছে। ফলে অযথা হৈ-চৈ হচ্ছে। বুড়ো সোহন বসে বসে বলায় সুবিধে হবে না বুঝে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে শুরু করছে—ওর কৈলাস ও মানস সরোবরের ভ্রমণকাহিনী। ওর বন্দরপুংচের লোমহর্ষক বিবরণ। দু-একটা কথায় কান দিয়েছি কি দিইনি, এমন সময় ওকে আড়াল করে দাঁড়াল কুমার। আস্ফালন করে বলতে শুরু করল ও ওর পুরনো ত্রিশূল জয়ের কথা। কয়েকজনের দৃষ্টি ও আকর্ষণ করেছে, কয়েকজনের মনোযোগ ওর ওপর গিয়ে পড়েছে, এমন সময় লাফিয়ে একেবারে আসরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল কোলী। চিৎকার করে বলল, 'সব ঝুটা হ্যায়।'

সকলের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ ওর ওপর গিয়ে পড়ল। আর সে-ও এই সুযোগে বলে নিল ওর নন্দাকোট যাওয়ার গল্পটা।

হৈ-চৈয়ের মধ্যে কিন্তু অনেকের দৃষ্টি যেন পড়ে রয়েছে বাইরের দিকে। আজ ডাক-হরকরার আসার কথা। সকলেই বোধ হয় তাই

উন্মুখ। চঞ্চলও হয়ে উঠেছে কেউ কেউ সময় এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কেউ কেউ অধৈর্য হয়ে মাঝে মাঝে বাইরেও ঘুরে আসছে দেখতে পাচ্ছি। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছে গোপাল, ভগু, আর কোলী। কোলী ওর গল্প শোনানো শেষ করেই তো স্পষ্ট স্বীকার করে ফেলল ওর ঔৎসুক্যের কথা। এমন সময় টর্চ হাতে দ্রুতপায়ে এসে হাজির হল বহুপ্রতীক্ষিত ডাক-হরকরা। মজলিস ভেঙে গেল, বাহবা নেওয়ার রেষারেষি কেটে গেল, চলতি প্রসঙ্গ ভুলে সকলে মেতে উঠল চিঠি পাওয়ার আর-এক আনন্দে। গোল হয়ে দাঁড়াল সকলে। হাসি-আনন্দ-উত্তেজনায় উজ্জ্বল সকলের মুখ। বিরাট কিছু একটা যেন পাবার সৌভাগ্যে সকলে উদ্‌গ্রীব। ডাক-হরকরা ঝোলা থেকে চিঠিগুলো তুলে দিল আমাদের এখনকার নেতা সোহনের হাতে। তারপর চলে গেল ও বকশিশ নিয়ে।

আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম যেমন ভাবে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম। সোহন বেছে বেছে যার যে চিঠিগুলো দিয়ে দিল। ভগ্নানীরগুলোই যে সংখ্যায় বেশী তা ওর বাণ্ডিলটা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল। এরপর শুরু হবে চিঠি পড়া। এ আর-এক অদ্ভুত দৃশ্য! প্রথমে সকলেই পড়ে নিতে চেষ্টা করবে চিঠিগুলো এক পলকে, রুদ্ধনিশ্বাসে—কোন ভাল খবর আছে কি না। কোন খারাপ খবর এল কি না? কারও চোখে-মুখে ফুটে উঠবে হাসি-খুশির তরঙ্গ। কারও বা আবার বিষাদ মলিনতার ছাপ। পরস্পরবিরোধী দৃশ্য। যার যে জায়গাটা ভাল লাগবে সে চিঠির সেই জায়গাটা আঁচড় মারবে। গুরুত্ব অনুসারে সাজানোও হয়ে যাবে ওই ফাঁকে সব। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর ধীরে-সুস্থে মন্থর-গতিতে চিত হয়ে শুয়ে সকলে পড়তে থাকবে আর-একবার চিঠিগুলো। খুব ভাল লাগলে, আনন্দের ধাক্কাটা মাত্রাতিরিক্ত হলে পড়ে শোনাবে পার্শ্ববর্তীদের লাইনগুলো। তারপর আরও কিছুক্ষণ পরে শুরু হবে উত্তর লেখা। সে কী উৎসাহ! সে কী অস্থিরতা! না দেখলে বোঝানো যায় না। মাঝে মাঝে শেক্সপীয়র, শেলী, কিট্‌স্, বায়রনের উদ্ধৃতি।

বই-ঘাঁটাঘাটি, জিজ্ঞেস-করা-করি, শেষে তর্কাতর্কি। এইভাবে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত।

এইদিন বিশেষ করে খাওয়ার সময় দেখা যায় সকলেরই কেমন যেন বৈরাগ্যের ভাব, আসক্তিহীনতা, সময়সংক্ষেপের অপচেষ্টা। কেন, তা বুঝতে বাকীও থাকে না নতুন 'কুক' অ্যাংশ্রীংয়ের। তাই ও 'আর দেব' বলে জোর করে না এই সব দিনে। কেউ রান্না খারাপ হয়েছে বলে তিরস্কার করলেও গায়ে মাখে না। জানে আজ সাহেবদের মন কোথায়? খাবারে অরুচি কেন? পাত ফেলে পালাতে চায় কিসের তাগিদে?

২৮শে মার্চ ॥ সোমবার

আজ নতুন জলবায়ু অভ্যাসের দ্বিতীয় দিন। সকাল থেকেই পড়ে গেছে সাজো-সাজো রব। শরীরটা আজ আমার ভাল নেই। তাই বেরুবো না ঠিক করেছি। চুপ করে শুয়ে আছি টেণ্টে। টেণ্টটা এখন খালি। জনমানব নেই। প্রতীক্ষা করছি শুধু রানারের। ও কখন আসবে? সময় তো হয়েছে নতুন খবর আনার। বাইরে থেকে ভেসে আসছে মেম্বারদের চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ির বিক্ষিপ্ত কোলাহল। উপভোগ করছি শুয়ে শুয়ে। এমন সময় আমায় সচকিত করে সমবেত গলায় একটা উৎসুক আগ্রহধ্বনি ভেসে এল ঠিক টেণ্টের গা থেকেই। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম কারা যেন বলছে—'সেই জায়গাটা একবার পড় না মাইরি।'

—পড়াটা অত মাগ্‌না নয়। আর যখন-তখন পড়লেই হল?

—তবে যে বললে—।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখনও বলছি যা লিখেছি ওই জায়গাটায় দাঁত ফোটাতে হবে না কাউকে। যতবড় কঠিন প্রাণই হোক না কেন, গলতে বাধ্য।

—তবে আর দর বাড়িও না, পড়। বান্ধবীকে যেটা লিখতে পার বন্ধুদের সেটা শোনাতেও পার। তাতে কিছু দোষের হবে না।

একটুখানি চুপচাপ।

—আচ্ছা, বলছ যেকালে পড়ছি। তবে এ নিয়ে মশকরা করতে পাবে না, বলে দিচ্ছি।

—না না না। সমবেত কণ্ঠের স্বীকারোক্তি।

দুবার গলা ঝাড়ার আওয়াজ, তারপর—'আমি তোমারই প্রেমে পাগল হয়েছি। তোমার আগে আমি আরও তো দু-চারজনকে ভালবেসেছি, কিন্তু কই, তা তো তেমন দানা বেঁধে ওঠেনি যেমন তোমাকে পেয়ে উঠেছে। রক্তের কণায় কণায় তুমি যেন আমার সঙ্গে মিশে রয়েছ। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন তোমায় আমি উপলব্ধি করছি। তুমি আমার নয়নের মণি, ছিন্ন হৃদ্‌পিণ্ড। আমার ইহজীবনের আশা-ভরসা, স্বপ্ন-সাধনা, বেদ-পুরাণ, কাব্য-কবিতা, সূর্য-চন্দ্—'

—'বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। দারুন হয়েছে জায়গাটা।'—উৎসাহ-ব্যঞ্জক সমবেত ধ্বনি।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। এবার এই জায়গাটা শোন—রাত্রে শোবার আগে তোমার নাম জপ করে শুই—বিশ্বাস কর। তাই সকালটা প্রতিদিন আমার কাছে মধুরতম হয়ে ওঠে। তুমি আমার ইষ্ট। উল্কার মত তুমি এসেছ আমার জীবনে। খালি ভয় হয় তাই, উধাও না হয়ে যাও না দেখলে। আশঙ্কায় মাঝে মাঝে আমার চোখ ধোঁয়া হয়ে যায়, কানে তালা লেগে যায়, পায়ে ঝিনঝিন্ ধরে, বুক ধুকধুক্ করে, মুখ—

—'বাস্, বাস্, যথেষ্ট হয়েছে। ওইতেই বুঝে নেবে কষ্টটা কতখানি।'—আবার সমবেতকণ্ঠে শোনা গেল মোলায়েম সান্ত্বনা।

—'আচ্ছা। এবার শোন শেষ লাইন দুটো।' শোনানো আর হল না। 'ওই এসেছে, ওই এসেছে' বলে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে কে কোথায় মিলিয়ে গেল তার কোন হদিসই রাখতে পারলুম না আর।

বুঝতে বাকী রইল না ডাক-হরকরার প্রতিই ওদের এই উল্লাস প্রদর্শন। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, সকলেই চলে গেছে, রয়েছে শুধু কোলী বারো-তেরো পাতার একখানা চিঠি হাতে। আমায় দেখে গম্ভীর-মুখে ও চিঠিখানা ভাঁজ করে খামে পুরল।

তা হলে এতক্ষণ কোলীই কি ভাষার কারুণ্যে পাষাণ গলাচ্ছিল? কী অন্ধবিশ্বাস, কত অক্ষম চেষ্টা!

চলে গেল ওরা যে যার নির্দিষ্ট গন্তব্য পথে ব্রেক-ফাস্ট সেরে। অধিকাংশই আজ অক্সিজেন মুখোশ নিয়ে গেছে আরও ভালভাবে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে। চলে গেল একে একে কুমার, কোলী, দানাম-গিয়াল, গাম্বু, সোনাম, জঙ্গল, এমনকি সোহন সিং পর্যন্ত। পড়ে রইলুম শুধু আমি। ওরা যেন অলক্ষ্যে আমায় টানছে। ওই পাহাড় যেন অদৃশ্য ইঙ্গিতে আমায় ডাকছে। একাকী অবাকবিস্ময়ে চেয়ে আছি সুউচ্চ ওই শৃঙ্গগুলোর দিকে। ওখানে মানুষের বসবাস নেই, জীবজন্তুর কোলাহল নেই, হিংসা ঘৃণা ভয় নেই। ওখানে আছে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য, অক্ষয় গাম্ভীর্য, চিরস্নিগ্ধ পবিত্রতা। ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে পথের ক্লান্তি থাকে না, সাংসারিক আয়ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ ভাল লাগে না, শত্রু-মিত্রে সংঘর্ষ বাধে না। ওখানে সকলের জন্যে সকলে আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত। ওখানে বহুর মধ্যে সকলে এক। ক্ষুদ্র হয়েও সকলে বৃহৎ। অনন্তের চিরবার্তা ওখানে ছড়িয়ে। ওখানে দেবতারা নিত্য বিহার করেন, তাই ওখানকার মাটি স্পর্শ করা মাত্রই অনির্বচনীয় প্রসন্নতায় মন ভরে ওঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অধ্যাত্মবাদে অনুরাগ আসে—

'There is much comfort in high hills
And a great easing of the heart
We look upon them and our nature fills
With loftier images from their life apart.'

রাজুর ডাকে সচকিত হয়ে ফিরে এলুম টেন্টে। কোন কিছুতেই

আজ যেন মন বসছে না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছি। এমন সময় রাজুর সঙ্গে টেণ্টে এসে ঢুকল লছমী, ঝুরা, লামু। মনটা ওদের দেখামাত্রই প্রফুল্ল হয়ে উঠল। খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'হঠাৎ এমন সময় যে? কী মনে করে?'

লছমী মুচকে হেসে বলল, 'তা না হলে আপনাকে পাওয়া যায় না যে। ডাক্তার মানুষের হাঙ্গামা অনেক। ব্যস্ত থাকতে হয় সব সময় কোন-না-কোন কাজে।'

হাসতে লাগলুম।

রাজু ঝুরাকে হাসতে দেখে মন্তব্য করল, 'সকলকে হাসতে দেখে অবুঝের মত হাসা মানে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করা।'

ঝুরা গম্ভীর হয়ে গেল। লামু ওর হয়ে জবাব দিল, 'এতে আর বোঝাবুঝির কী আছে? আর ওর হাসিতে বোকামিটাই বা দেখলে কী?'

—আরে বাবা, সাপের হাসি বেদেয় চেনে। জিজ্ঞেসই কর না ওকে।

—'তোরা আসবি, না আমি উঠব?' ধমক লাগাল লছমী। তারপর বিনীতভাবে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে যা লিখতে বলেছিলুম লিখেছেন?'

—কী বল তো?

—আমার ইতিহাস। নিজেকে যেন ব্যঙ্গ করে ও হেসে উঠল।

অম্লানবদনে অস্বীকার করবার চেষ্টা করলুম, 'সময় করে উঠতে পারিনি। তাছাড়া লিখবই বা কী যার কিছুই আমি প্রত্যক্ষ করিনি! শুনে কতটুকুই বা লেখা যায় বল সত্যিকারের ভাবপ্রবণতা যদি না থাকে?'

—তাহলে লেখেননি কিছু। থাক, তবে আর লিখতে হবে না। চললুম।

বিরস বদনে উঠতে যাচ্ছিল ও। বসতে বললুম ওকে। বসল। কাঁচুমাচু হয়ে এবার সত্য কথাটা বলে ফেললুম, 'সেদিন সকালে

তোমার জন্যেই কিছু লিখতে বসেছিলুম, কিন্তু লেখাশেষে দেখলুম সবই আমার কথা লিখেছি—তাও আবার পদ্যে। দেখবে সেটা, চলবে কিনা?'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বার করুন না দেখি।

কাগজটা বার করে আনলুম। ও খুশী হয়ে বলল, 'পড়ুন শুনি।'

লজ্জায় ইতস্তত করতে লাগলুম। ও আবার তাগাদা দিল। সুতরাং পড়তে হল—

শুধু অনাদর অবহেলা আর সহে নাকো ভগবান
মৃত্যু দিয়ে জুড়াও এবার আমার আকুল প্রাণ।
কোথায় আছে সান্ত্বনাবাণী
কে স্নেহে মোরে দিয়ে হাতছানি
স্পর্শমণির সন্ধান দিতে পথে পথে মোর যাবে,
অসহায় জেনে সাথী করিতে কে বল আমারে চাবে?
ভয়ে ভয়ে আমি নিজেরে লুকায়ে যত চাহি হায় থাকিতে
তত আসে ভয় চকিতে যেন অহরহ মোরে গ্রাসিতে।
পারি নে যে আর সহিতে আমি
সংশয় এত ওগো অন্তর্যামী
গ্লানিতে যেন সারাটি জীবন বিষময় হয়ে গেছে,
মুক্তির তরে তাইতো এ-প্রাণ মৃত্যুরে ডাকিতেছে।
আশা লয়ে শুধু হতাশাই যত পেয়েছি জীবনে নাথ
ন্যায় হল মোর অপরের চোখে অন্যায় অপরাধ।
প্রতিঘাত করা হল নাকো মোর
কটাক্ষে কারো এ-জীবনভোর
নির্জনে শুধু নীরব অশ্রু ফেলাই হয়েছে সার,
নিষ্ঠুর হতে পারি নে কেন বল মোরে মহাভার।
কেন পারি নে শয়তানদের উদ্ধত কলরব
নটরাজ হয়ে স্তব্ধ করিতে তচ্‌নচ্‌ করে সব?

কেন পারি নে ভীমসম ক্রোধে
বক্ষ-রুধিরে নিতে প্রতিশোধে
অযোগ্য যত অজ্ঞ পশুর—দুনিয়ার জঞ্জাল,
গুণের কদর না করে যারা গুণীকে দিতেছে গাল ?
অন্যায় সাথে সংগ্রামে যদি না পাই মনেতে বল
দয়াময় তবে এ-জীবনে আর বেঁচে থেকে কী বা ফল !
নির্জিত হয়ে মুখ বুজে থাকা
বাঁচার তাগিদে খোসামোদে মাখা
কুকুরের মত জীবন ধারণ—চাহি নে ঠাকুর ভবে,
পৌরুষ যদি না দাও হৃদয়ে মৃত্যুরে দাও তবে।

উচ্ছ্বসিতভাবে লছমী বলে উঠল, 'চমৎকার হয়েছে ! সত্যি বলছি, ভগবানের নামে বলছি এমন কতকগুলো কথাই আমি কায়-মনে খুঁজেছি সারা জীবন। কিন্তু পাইনি। আপনি আমায় বাঁচালেন।'

হাত থেকে কাগজটা ও একরকম ছিনিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল।

যাবার সময় ঝুরাও খুশী হয়ে বলে গেল, 'আমায়ও একটা লিখে দিতে হবে।'

রাজু কৃত্রিম ভর্ৎসনা করে শুনিয়ে দিল, 'আচ্ছা আদেখলে তো ! যা দু'চোখে দেখবে তাই-ই চাই—।'

আড়াইটে-তিনটের মধ্যে নতুন জলবায়ু অভ্যাস শেষ করে সকলেই ফিরে এল। সকলকেই বেশ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। ওরা প্রত্যেকেই আজ কমপক্ষে চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছে—কথাটা ওদের মুখেই শুনলুম। দানামগিয়াল ও কোলী আমাদের ক্যাম্পের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পাহাড়গুলোর অনেকখানি উচ্চতা পরিভ্রমণ করে এসেছে। সুখের বিষয় ওদের কেউই কিছুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না। নতুন যারা পাহাড়ে চড়তে এসেছে তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ যা একটু-আধটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর সে অসুস্থতাটাও আবার অধিকাংশের 'সান্-স্ট্রোকে'র দরুন। যা হোক, ওদের

যথাযথ চিকিৎসা দিয়ে সর্বাগ্রে সুস্থ করে তুলতে লেগে গেলুম।

ডিসপেন্‌সারিতে আজ বহু রুগীর ভিড় জমেছে। শুধু আশ-পাশের গাঁয়ের লোকই ওরা নয়, দূর দূর গাঁ থেকেও এসেছে অনেকে। সব বয়সেরই রুগী এখানে রয়েছে। সকলেরই সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। ওদের মধ্যে একজন আশি বছরের বৃদ্ধও রয়েছে—পাঁচ-ছ মাইল পায়ে হেঁটে এসেছে—ঠক ঠক করে কাঁপছে বেচারী। একজন বৃদ্ধাও এসেছে দূর কোন্ গাঁ থেকে—ছ-সাত মাসের একটা শিশুকে পিঠে বেতের ঝুড়িতে নিয়ে। আপাদমস্তক ঢাকা শিশুটার। বেঁচে আছে কি না সন্দেহ।

সকলকে ওষুধপত্র দিয়ে কাজ চুকিয়ে উঠতে অনেকখানি সময় লেগে গেল। টেন্টে এসে দেখি, আশ্চর্য ব্যাপার! সুবোধ বালকের মত সকলে খাতা-কলম হাতে বাক্-দেবীর সাধনায় মগ্ন। এই দু-এক ঘণ্টার মধ্যে যেন কোন মায়ামন্ত্রে টেন্টটা একটা পাঠশালায় পরিণত হয়ে গেছে। অস্বাভাবিক এক গাম্ভীর্য বিরাজ করছে সর্বত্র। অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলতে-কইতেও যেন ভয় হয় এখন। বুক দুর-দুর করে ওঠে। তবু সাহস সঞ্চয় করে কোলীকে জিজ্ঞেস করে জানলুম—সকলে ডায়েরী লিখছে, ব্রিগেডিয়ারের পরামর্শে। অদূরে একটা জায়গা দেখিয়ে আমায়ও ও বসে পড়তে বলল। বসে পড়লুম তক্ষুনি। লিখবই কিছু আজ এই সঙ্কল্প নিয়ে দু-এক লাইন প্রথম ঝোঁকে লিখেও ফেললুম। তারপর ভাল ভাষার জন্যে একটু ক্ষান্ত দিলুম—চিন্তা করে গোছাতে লাগলুম কথাগুলো মনে মনে—এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট করে একটা ঘণ্টাও পার হয়ে গেল কিন্তু সেই যে ক্ষান্ত দিয়েছি তারপর আর-একটি অক্ষরও যোগ করতে পারলুম না পুরনো ওই দুটো লাইনে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জোর করে আবার কিছু লিখতে চেষ্টা করলুম। বসেও রইলুম আর কিছুক্ষণ। তারপর মস্তবড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়লুম। পড়ে দেখলুম একবার, কী লিখেছি—লিখেছি শুধু আবোল আর

তাবোল। যা মনে এসেছে। লিখেছি কয়েক জায়গায় নিজের নাম ঠিকানা। লিখেছি শ্যামসুন্দর, রাধাশ্যাম দয়া করো। এঁকেছি দু-এক জায়গায় ল্যাণ্ডস্কেপ চার বছরের বালকের চেয়েও নিকৃষ্ট। এমন অনেক কিছু।

কোলী জিজ্ঞেস করল, 'চললে? হয়ে গেল এর মধ্যে?'

'কতক্ষণ লাগে মন দিয়ে লিখলে!' দরাজ কণ্ঠে জবাব দিয়ে বেরিয়ে এলুম।

অনেক দিন বাদে সন্ধ্যেবেলাটা আজ বেশ তাসে জমে উঠল। ব্রিজের জুটী আমার কুমার। ওদিকে বসেছে কোলী, মিশ্র। আর আর সব গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ খেলোয়াড়কে ওরা পরামর্শ দিচ্ছে। মন্তব্যও করছে সময় সময়। বিশেষ বিশেষ চালে যে যে-পক্ষকে সমর্থন করছে সে সেই পক্ষের হয়ে উল্লাস প্রদর্শন করছে। সব জড়িয়ে বড় মধুর হয়ে উঠেছে সময়টা। তাসি (তিব্বতী কুকুর) আমার গায়ের কাছে চুপটি করে বসে আছে। মাঝে মাঝে ও মস্ত বড় সমঝদারের মত পিট পিট করে দেখছে আমার চালগুলো। চালের ফাঁকে ফাঁকে আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। ও আবেশে চোখ বুজছে। হঠাৎ এমনি এক ফাঁকে আমার গুরুত্বপূর্ণ একটা চাল ভুল হয়ে গেল। কুমার আর সহ্য করতে না পেরে শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করল, 'ভাল লাগছে না বোধ হয়! তা উঠেই পড় না, সোহাগটা ভাল করেই দেখাতে পারবে।'

অত্যন্ত অপমান বোধ করলুম। ঠাস করে কুকুরটার গালে একটা চড় বসিয়ে নতুন করে মন বসাতে চেষ্টা করলুম খেলায়।

৩০শে মার্চ ॥ বুধবার

ঘুমটা বেশ হচ্ছিল। 'সাব্‌ চা'—রাজু এসে ডাকল। উঠে পড়লুম।

সকালবেলা উঠে চা না পেলে মেজাজটা ঠিক থাকে না। রাজুর হাতে ধূমায়িত এক মগ চা দেখে তাই খুশীই হলুম।

এখুনি বেরোতে হবে ভোরা আর নন্দার সঙ্গে। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কাজ এখন পুরোদমে চলছে। প্রত্যেকের মধ্যেই এখন পাহাড়ে চড়ার একটা চাপা উত্তেজনা সব সময়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ট্রেণিংয়ের জায়গাটা ভারি সুন্দর। চতুর্দিকে তার ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়। ইচ্ছেমত তাই চড়া হচ্ছে বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন দলে, বিভিন্ন পাহাড়ে।

আজ যদিও আমাদের ক্যাম্পে থেকে সব-কিছু পুনর্বিন্যাস করার দিন, তবু এই পাহাড়ের ডাককে উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। ওরা যেন নিয়ত আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। ভেতরে ভেতরে তাই যেন আমরা কেমন উৎসুক হয়ে উঠছি। যেতেই হবে—

'It is a call of the great spaces, and of the great mountains.
It is a call that mocks at the song of the Lotus-eaters of old,
It is more insidious than the siren's call,
And it is a call that, once heard is never forgotten.'

ভোরা, নন্দা আর আমি বেরিয়ে পড়লুম। আজ আমরা চড়ব নাম-না-জানা ওই পাহাড়ে—ইমজেখোলার ওপারে—তাওয়াচের দক্ষিণে—সিপাই পিকের কাছে। প্রাণে আমার একটা গোপন ইচ্ছে, ওর চূড়ায় চড়তে পারলে নাম দেব ওর এল-১। এল হচ্ছে আমারই এক প্রিয়জনের নামের প্রথম অক্ষর। ব্যাপারটা জেনে ভোরা ও নন্দা এমন উৎসাহিত হয়ে উঠল—যেন ওরা ওর চূড়ায় উঠবেই। জানের বিনিময়েও।

ওদিকে কোলী, জঙ্গল, ভগ্নানী ও আঙ তেম্বা কতকগুলো শেরপা নিয়ে চলে গেছে সিপাই পিকে। ১৯৫৬ সনে সুইস্ অভিযাত্রীদল ওই পিকটা জয় করেছিলেন আমাদেরই মত এই নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর সময়। তারপর তাঁরা এভারেস্ট জয় করে

বিশ্বের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। সুইস্‌দল উপরোক্ত পিকে চড়েছিলেন থ্যাংবুচের দিক থেকে। কিন্তু ওরা চড়বে উল্টো দিক থেকে—যেদিক থেকে চড়া এককথায় অসম্ভব। এমনি গোঁয়ার ওরা।

গোপাল, রাও তৈরী হয়েছে প্যাংবুচের চূড়ায় যাওয়ার জন্যে।

সোনাম, গাম্বু, চৌধুরী ও রাজকাপুর চলেছে ক্যাম্পের কাছাকাছি কণ্টেগা শ্রেণীর দিকে। আর আর সব সদস্য নির্বাচন করে নিয়েছে কোন-না-কোন চূড়া। কেউ এখন বসে নেই।

যা হোক, আমি, নন্দা ও ভোরা বেরিয়ে পড়লুম। ব্রেক-ফাস্ট খেয়ে, লাঞ্চ পিঠে নিয়ে। ব্রিগেডিয়ার বলেছেন তাড়াতাড়ি ফিরতে, সেটাও মনে আছে। চলেছি তো চলেইছি। খালি চড়াই আর চড়াই। তবে আজকাল বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তেমন আর কষ্ট হয় না চড়াই ঠেলে ওপরে উঠতে।

প্যাংবুচে গ্রামকে বাঁয়ে ফেলে, চারণক্ষেতকে ডাইনে রেখে এগিয়ে চলেছি আমরা। চারণক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছে ইয়কের দল। আরও ওপরে এসে দেখি—ছোট একটা কুটির। ওখানে থাকে ইয়কপালকেরা। লোভ সামলাতে পারলুম না শক্তি অর্জনের। দুধ কিনতে ছুটলুম তাই ওই কুটিরে। ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে। প্রচুর দুধ ছিল ওখানে। প্রতিজনে প্রায় সেরখানেক করে দুধ গলাধঃকরণ করে আশ মেটালুম।

এগিয়ে চলেছি। সবুজ ক্ষেত শেষ হয়ে আসছে। শেষ হয়ে আসছে সবুজের সমারোহ। এতক্ষণ শুধু জুনিপারের ঝোপঝাড় কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল। এবার তাও শেষ হয়ে গেল। এখন শুধু কঠিন ন্যাড়া পাহাড়। উদ্ভিদের কোথাও চিহ্নমাত্র নেই। পা টিপে টিপে চলেছি, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে দড়ির গাঁটছড়া বেঁধে—সাবধানে, সতর্কে। গত কয়েকদিনের তুষারপাতের নরম আবরণ এর ওপর রয়েছে, ফলে হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবে যাচ্ছে কোথাও কোথাও। বিপদও রয়েছে ভয়াবহ। তুষার ফাটলের, শিলাস্তূপের খাঁজের। প্রতি মুহূর্তে এখানে পা ভাঙবার কিংবা তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে বড় ক্লান্ত বোধ করলুম। পা আড়ষ্ট হয়ে আসছে। জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় নজরে পড়ল অদূরে একটা বিরাট শিলাস্তূপ। মরুভূমির ওপর মরূদ্যান যেন। তুষারময় স্থানে তুষারমুক্ত শিলা। অভিযাত্রীদের যেন পরম আশ্রয়স্থল। কাল-বিলম্ব না করে সত্বর গিয়ে উঠলুম আমরা ওখানে। আর ঠিক এই সময় রাজুও আমাদের মুখের কাছে খুলে ধরল বড় একটা চায়ের ফ্লাক্স্। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমরা ভাগ-বাটোয়ারা করে খেতে লেগে গেলুম চাটুকু।

রাজুর বুদ্ধিটা সত্যি তারিফ করবার মত। এই সময়ে গরম চায়ের উপকারিতা যে কত তা একমাত্র অভিযাত্রীরাই অনুভব করতে পারে।

পায়ের তলায় রাশি রাশি তুষারখণ্ড দেখে, কেন জানি না, কী যেন এক আবেগে রাণুর মুখটাই বার বার মানসপটে উদিত হচ্ছে।

আসবার দিন বাড়ির সকলের সমবেত বিদায়-সম্ভাষণের মধ্যে রাণু হঠাৎ অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়ে আমার কাছে জানতে চাইল—'তুমি না বলেছিলে কাকু, পাহাড়ের এক-এক জায়গায় খালি বরফ? আমার জন্যে এক ধামা আনবে কাকু?'

বউদি ওর কথা শুনে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে বলল, 'পোড়া কপাল! দু চোখে তোর কি আর-কিছু নজরে পড়ল না রে?'

রাণু থতমত খেয়ে গেল। আমি ওকে উৎসাহিত করতে বউদির কথায় আমল না দিয়ে বললুম, 'আনতে কি আর সাধ যায় না মা-মণি? কোদালের এক-এক কোপে চাঁই চাঁই বরফ উঠবে। কিন্তু তোমাকে কি আর এনে খাওয়াতে পারব?'

—'কেন, কেন?' রাণুর দু চোখে উৎকণ্ঠা।

—সব সাবড়ে দেবে তোমার মা। একটুতে তো আর ওঁর পেট ভরে না। আর সে সময় তুমি একটু বে-সামাল হলেই দেখবে লাগিয়ে দেবে তোমায় দু-চার ঘা।

বউদি গম্ভীর হয়ে বলল, 'বয়ে গেছে। কি আমার অমৃত যে একেবারে!'

—কোন্‌টা অমৃত আর কোন্‌টা যে নয় সেইটেই এখন আমাদের জানতে বাকী। কী গো রাণু?

—'হ্যাঁ···।' কিছু না বুঝেই রাণু লম্বা সায় দিল।

—এই ধর না আজকের কথা। সকালে তোমার মা তোমার লজেন্স চুরি করে খাচ্ছিল কি-না? কথা কইতে কইতে নেহাত অসাবধানে আমার সামনে কামড়ে ফেলেছিল বলেই না ধরে ফেললুম।

দাদা এতক্ষণ উপভোগ করছিল আমাদের ঝগড়াটা। এবার সশব্দে হেসে উঠল।

বউদি লোকলজ্জা ভুলে ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে উঠল, 'মা দেখুন না, ঠাকুরপো কী রকম করছে।'

সঙ্গে সঙ্গে মা'র কৃত্রিম ভর্ৎসনা শোনা গেল, 'সব সময় কি তুই ওর পেছনে লাগবি? যাচ্ছিস্ কোন্ দূর দেশে, কোথায় ঠাকুরদেবতার নাম মুখে নিবি, না খুনসুড়ি করতে বসলি ওর সঙ্গে!'

আমি আগের প্রসঙ্গ টেনে রাণুকে আদর করে বললুম, 'তুমি তো সবই জান? নয় কি-না বল?'

—'হ্যাঁ···।' আগেরই মত ও আবার সায় দিল।

—তাহলে বরফ আনা এক্ষেত্রে উচিত হবে কি না, একবার হেঁকে জবাব দাও।

—'না।' রাণু জোর গলায় বলল, 'কক্ষনো না কাকু।'

ভোরার তাগাদায় ফিরে এলুম আবার চলতি প্রসঙ্গে। ও বলছে, 'এইবার চরম পরীক্ষার সময়। পিকটার কাছেও প্রায় আমরা এসে গেছি। শুধু শীর্ষজয়টা করতে পারলেই আমাদের আজকের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।'

তাই নতুন উদ্যমে আবার আমরা এগোতে লাগলুম। বেশ কিছুক্ষণ তুষারক্ষেত্রে ধস্তাধস্তির পর আমরা আরও প্রায় দু শো ফুট উঁচুতেও

উঠলুম। কিন্তু হায়, এ কোথায় এলুম? এখান থেকে শীর্ষের নাগাল পাওয়া যে অসম্ভব। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যে, এই বিরাট খাদকে অতিক্রম করে খাড়া ওই শীর্ষে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

নন্দা তবু নানা পরিকল্পনা খাটাতে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই একে একে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

এমনি হয়। ভাগ্য যখন পরিহাস করে তখন জয়ের কিনারায় দাঁড়িয়েও জয়লাভ আর কিছুতেই হয়ে ওঠে না। যুগে যুগে এমনি হয়ে আসছে। আর এমনি যে হবে আমাদের বেলায়ও তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে? বিফলমনোরথ হয়ে শেষে আমাদের ফিরতেই হল ক্যাম্পের দিকে।

বিকেলবেলা ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে আছি একটু অন্যমনস্ক হয়ে, কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ বাহাদুর এসে অভিবাদন করল। খুশী হয়ে আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলুম। ও পায়ের একটা ছোট্ট ক্ষত দেখিয়ে ওষুধ চাইল। মনটাকে একটু হাল্কা করে নেবার জন্যে আমি ওকে বসতে বললুম। আর তারপর ওকে ওষুধ দিয়ে শুরু করলুম নানা অর্থহীন প্রশ্ন।

ঠিক এই সময় লামু আর লছমী এসে ঢুকল। ওদের এ আসাটা অভিসন্ধিমূলক কি না জানি না, তবে লছমী লামুকে কী যেন ইশারা করল আর লামু সঙ্গে সঙ্গে মুচকে হেসে বাহাদুরকে বলল, 'বাহাদুর কাকা ভাল?'

—কেন কাকা বল? এতে আমি কত ব্যথা পাই জান?

—তাহলে কী বলব? জ্যাঠা, না মামা, না—?

—তুমি ভারি দুষ্টু লামু।

—'মরি, মরি। কেন দুষ্টুমি করিস্ লামু। সব-কিছুর একটা সীমা থাকা উচিত। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া তোর যেন একটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে।' কপট সহানুভূতির সুরে লছমী বলল।

লামু আবার মুচকে হেসে লছমীর দিকে ফিরল। আর সঙ্গে সঙ্গে লছমীও ওকে তাড়া দিল। ও সেই মত গলায় কৃত্রিম সোহাগ মিশিয়ে বলল, 'আজ কিন্তু আমাদের খাওয়াতে হবে। অনেক দিন কিছু খাওয়াও নি বাপু।'

—'এ আর বড় কথা কী গো! কী খাবে বল?' গদগদ কণ্ঠে বাহাদুর জিজ্ঞেস করল।

—যা খাওয়াবে।

—বেশ, বেশ। তাই হবে। তুমি তাহলে আর এবার থেকে আমার কথায় রাগ করবে না?

—না, না। কক্ষনো না।

বাহাদুর এবার আবেগে হিতাহিতজ্ঞান ভুলে লামুর একটা হাত ধরে মনের কথাটি খুলে বলল, 'আর-একটা কথা। আমার তিনকুলে কেউ নেই। তুমি, তুমি আমায়—মানে—বলছিলুম—'

বিয়ে করার প্রস্তাব। বুঝতে আর বাকী থাকে না কারও। লছমী কথাটাকে লুফে নিয়ে বলল, 'রাজী হয়ে যা না লামু। সাধলে বলে না গুমোর বাড়ে, তোর হয়েছে সেই তাই।'

—'বল তো, বল তো দিদি।' কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধা নিবেদন করল বাহাদুর লছমীর প্রতি।

লামু আর দ্বিধা না করে স্পষ্ট অথচ স্বাভাবিক সুরে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। সে হবে ক্ষুন। এখন তাহলে আসি।'

—এস, এস। সন্ধ্যেবেলা আমি খাবার নিয়ে তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। ঠিক থেকো কিন্তু।

ডিনারের সময় তাসিকে সামনে বসিয়ে আমরা খাওয়ালুম। এটা কেমন যেন আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আহা বেচারা! কোথায় ছিল, আকস্মিকভাবেই আমাদের দলে এসে মিশে গেছে। চলেছে আমাদের সঙ্গে কোথায় তা হয়তো ও নিজেই জানে না। তবু রয়েছে। তাই অজ্ঞান্তে ওর ওপরও আমাদের কেমন যেন একটা মায়া

'রডোডেন্‌ড্রন ডালহাউসী' (৬০০০-১০০০০ ফুট)
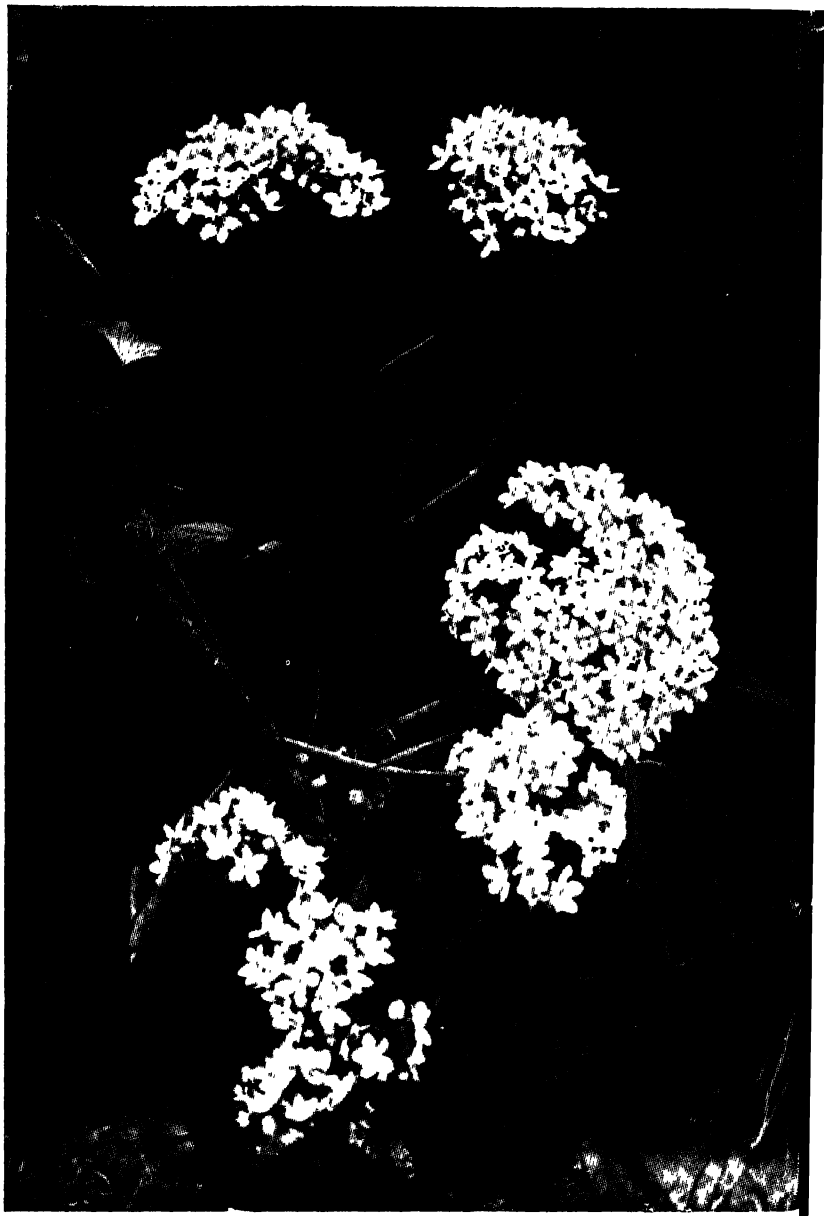
ভাইবারনাম কর্ডিফোলিয়া (৮০০০-১১০০০ ফুট)

পড়ে গেছে। ওর কোন রকম অযত্ন তাই আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

ব্রিগেডিয়ারেরও ও পরম স্নেহভাজন। আর শ্বশুর—।

সে কথায় আর কাজ নেই। কতদূর চলে গেছে সে আজ আমাদের ছেড়ে। কী মর্মদাহ নিয়েই না ও আজ ফিরছে ওর ছেলেমেয়েদের কাছে—এই বৃদ্ধ বয়সে!

কুকুরটাকে তো ও দেবতার আসনে বসিয়েছিল ওর মনের মন্দিরে। আর তারই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আমাদেরও কম প্রত্যয় লাভ করেনি এই কুকুরটার ব্যাপারে। তাই তো তাসি আজ আমাদের এত প্রিয়, এত স্নেহভাজন।

থাক্ সেকথা। বৃথা জল্পনা-কল্পনায় কাজ কী? এবার শুতে যাওয়াই ভাল। ভোরে ভোরে ওঠা যাবে তা হলে।

৩১শে মার্চ ॥ বৃহস্পতিবার

উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল। টেন্ট থেকে বেরিয়েই দেখি চতুর্দিকে একটা কর্মব্যস্ততার ছবি। মনে পড়ে গেল আজ আমাদের তিনটে দল তিন দিকে যাবে। তিনটে দলেরই লক্ষ্যস্থল যদিও বেস্-ক্যাম্প, তবু বলব, নতুন জলবায়ুসেবনে অভ্যস্ত হওয়াই অন্যতম উদ্দেশ্য। উচ্চ ভূ-ভাগের সঙ্গে সখ্যতা করার একমাত্র যোগসূত্রই তো হচ্ছে এই অভ্যাস-করণ।

সকলেই কাজে ব্যস্ত—একলা আমিই শুধু ঘুমুচ্ছিলুম ভেবে নিজের ওপর কেমন যেন রাগ হল। যা হোক, তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে ওদের সাহায্য করতে লেগে গেলুম।

তিনটে দল নিজেদের প্রয়োজনমত জিনিস গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। কোন জিনিসই যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা

দরকার। কারণ এ ক'দিন ওরা নিজেদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে কাটাবে। সব রকম জিনিসই ওদের নিতে হবে—টেণ্ট, এয়ার-ম্যাটরেস্, স্লিপিং-ব্যাগ, ফেদার-জ্যাকেট, উইণ্ডপ্রুফ স্যুট, গ্লাব্স্, জামা, টুপি। খাবারের দিক থেকে—টিনে আঁটা খাবার নানা রকমের, এমনকি চাল, ডাল, আটা, আলু পর্যন্ত। রান্নার জোগাড়ের জন্যে—স্টোভ, কেরোসিন, স্পিরিট। তা ছাড়া—দড়ি, কম্পাস, রুক-স্যাক, জলের বোতল, ফ্লাস্ক্, এমন অনেককিছু। এর ওপর আমি আবার প্রত্যেক দলের হাতে একটা করে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স দিলুম। অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে একটা করে অক্সিজেন মুখোশ ও সিলিণ্ডারও দিয়ে দেওয়া হল প্রত্যেককে। নন্দা প্রত্যেক দলের সঙ্গে একটা করে ওয়্যারলেস্-সেট দিল। আর সেই সঙ্গে বুঝিয়েও দিল কোন্ কোন্ সময় কেমন করে ওটার সাহায্যে হেড-কোয়ার্টার পার্টির সঙ্গে সংযোগ করা যায়।

যা হোক, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে প্রত্যেক দল নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। প্রত্যেক দলেই আছে চার-পাঁচজন করে সদস্য ও আট-ন'জন করে শেরপা। এ ছাড়া দু'শো জন পোর্টারও তৈরি রয়েছে মালপত্র ফেরি করার জন্যে।

এখন সব-কিছুই বেশ নিয়মমাফিক হচ্ছে। প্রত্যেকটা বোঝা করা হয়েছে ষাট পাউণ্ডের। আর তাতে নম্বরও দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পোর্টারের চাকতির নম্বরের সঙ্গে মালের নম্বর মিলিয়ে প্রত্যেককে মাল দেওয়া হচ্ছে। রাও এসব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। তাই লীডার ঠিক বুঝেই এসবের ভার এখন রাওয়ের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আর সেও খুব নিপুণতার সঙ্গে এসব কাজ করে চলেছে। কোন রকম পক্ষপাতিত্ব ও করেনি এ পর্যন্ত। কিন্তু যেই ঝুরা, লামু, লছমীরা এসে হাজির হল অমনি রাওয়ের মনোযোগেও কিছুটা শৈথিল্য দেখা দিলো আর সেই সঙ্গে মাল হস্তান্তর ব্যাপারেও কিছুটা রদবদল ঘটল। দু-একজনকে কম ওজনের মাল দিয়ে বেচারী আকর্ষণীয়

হবারও চেষ্টা কম করল না। কী আর করা যায়! এইটেই তো স্বাভাবিক। কেননা সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

রাজু এখন যেন একটু বেশী মাত্রায় আমার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। কিছু যেন ও বলতে চায় আমায়। উন্মুখ হয়ে আছে ও সেই সুযোগের প্রতীক্ষায়। সুযোগ করে দিলুম ওকে। উপযাচক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কিছু বলবে আমায়?'

—সব শেরপাই তো যাচ্ছে কোন-না-কোন দলের সঙ্গে বেস-ক্যাম্পে। একলা আমিই শুধু পড়ে থাকব এখানে?

—তা তুমি কী বল?

—আমারও ভারি ইচ্ছে হচ্ছে ওদের সঙ্গে যেতে। একলাটি কুঁড়ের মত সময় কাটাতে আমার ভাল লাগে না। তা ছাড়া ওখানে তো আপনার বেশ কিছুদিনের একটা ডিসপেন্সারি হবেই। আগেভাগে ওখানে গিয়ে উঠলে তার কাজটাও কিছুটা এগিয়ে রাখতে পারব আর তাতে ভবিষ্যতে আমাদের সুবিধেও হবে অনেক। বলুন হবে কি-না?

আসল কথাটা কিন্তু রাজুর তা নয়। ও খোঁজ নিয়ে জেনেছে ঝুরা যাচ্ছে। আর কি ওর মন বসে এখানে! হাজার আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য এখানে থাকলেও মোট নিয়ে দীর্ঘ দুর্গম পথে তার পিছু পিছু চলায় ওর আনন্দ অনেক।

তবু একটু দুষ্টুমি করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। গম্ভীর হয়ে বললুম, 'তা বটে। কুমারকে তাহলে বলে দিই ওর সঙ্গে তোমায় নিতে? আর বড় সাহেবকেও খুলে বলি ব্যাপারটা—কী বল?'

রাজুর মুখ কালো হয়ে গেল। তবু ও শেষ চেষ্টা করতে মরিয়া হয়ে আমায় বোঝাতে লাগল, ঝুরার দলে ওর যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা, কুমারের সঙ্গে থাকার অসুবিধা, বড় সাহেবের কানাকানি করার ঝামেলা ইত্যাদি। শেষে এক রকম যেন বাধ্য হয়েই ওর যাওয়ার সব ব্যবস্থা আমায় করে দিত হল।

কাজের চাপে আজ সবাই ব্রেকফাস্টের কথাও ভুলে গেছে। আটটা প্রায় বাজে। অগত্যা ঘণ্টা পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে গোছগাছের পর্ব মোটামুটিভাবে শেষ করে সকলে এসে হাজির হল ব্রেকফাস্ট সারতে। খাওয়ার উপকরণ আর পরিমাণ দেখে লীডার হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, 'ডাক্তাররা বলছিল উঁচুতে উঠলে ক্ষুধা মন্দা হয়। কিন্তু নমুনা যা দেখছি তাতে তো মনে হয় ওদের হিসেবে কোথাও ভুল হয়েছে।'

হৈ হৈ করে সকলে হেসে উঠল।

খাওয়ার শেষে লীডারকে শুনিয়ে বললুম, 'প্রথম পর্যায়ে নতুন জলবায়ুসহনে অভ্যাস সকলেরই দেখছি মোটামুটি ভাল হয়েছে। এবার আরও ঊর্ধ্বভাগের আবহাওয়ার মধ্যে যাওয়ার আগে সকলের শরীর আর-একবার পরীক্ষা করতে চাই।'

—বেশ তো, ভালই। কর না পরীক্ষা। আমরা না হয় আর-একটু পরেই যাত্রা করব।—লীডার বললেন।

অনেকের মুখ তাতে শুকিয়ে গেল। গাম্বু স্পষ্টই সোনামকে বলে ফেলল, 'সেরেছে! আবার বোধ হয় রক্ত নেবে। ওরে বাবা, এমন করে বারে বারে রক্ত নিলে তো মরে যাব।'

সোনাম পরামর্শ দিল, 'চল, তবে সরে পড়ি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'

পালাতে যাচ্ছিল ওরা। ডাকলুম ওদের। ভয়ে ভয়ে ওরা এগিয়ে এল। বললুম, 'ধর লীডারের হাতটা জোর করে চেপে।'

ধরল ওরা। প্রয়োজনমত রক্ত আমি বার করে নিলুম লীডারের হাত থেকে। তারপর লীডারকে বললুম একই ভাবে গাম্বুর হাতটা ধরে সাহায্য করতে। উনি কথামত কাজ করলেন। আর আমিও সেই ফাঁকে কাজটা গুছিয়ে নিলুম। সোনামের বেলায়ও ওই একই উপায় অবলম্বন করলুম। ফলে বড় একটা ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পেলুম ওঁকে সামনে রাখার সামান্য কারসাজিতে।

অন্যান্য সদস্যদের বেলায় আর এ ধরনের কোন হেফাজত পোয়াতে হল না। অনায়াসে নমুনা নিতে পারলুম সকলের শরীর থেকে ইচ্ছেমত।

এবার ফোটো তোলার হিড়িক পড়ল। প্রথমে সব সদস্যকে নিয়ে কয়েকটা গ্রুপ ফোটো তোলা হল নানা কোণ থেকে। অবশ্য বেশীর ভাগ ফোটো গোপালই নিল। এ ছাড়া বিভিন্ন দলের বিভিন্ন ভঙ্গিমাতেও ফোটো তোলা হল। ফোটো তোলার হুজুকটা ক্রমে এমন উৎকট হয়ে উঠল যে, মনে হতে লাগল এখনই সকলের কিছু ফোটো না তুললে বুঝিবা সুযোগই মিলবে না আর। ফোটোগ্রাফারও অনেকজন—গোপাল, কেকী, কোলী, ভগ্নানী, ভোরা, এমনকি কুমার, জঙ্গলও।

ছবি তোলার পর্ব শেষ হলে সকলে বিদায় নিতে এল এক-একটি দলে! প্রথম দলে আছে—কেকী, কোলী, জঙ্গল ও অ্যাঙ তেম্বা। লীডারের আদেশানুসারে ওরা সকলে চল্লিশ-পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের মাল নিয়ে হাসি-খুশি মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। জঙ্গল আবার আর-এক কাঠি বাড়া। ও আর-কিছু বেশী ওজনের মাল নিয়েছে পিঠে। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ওরা চলে গেল। যাবার সময় জঙ্গল হাত উঁচু করে চেঁচিয়ে বলে গেল, 'ডাক্তার, আবার দেখা হবে বেস-ক্যাম্পে।'

বলা বাহুল্য, তাসিও জঙ্গলের পিছু পিছু গেল।

দ্বিতীয় দল এল। এ দলে আছে—কুমার, ভোরা, মিশ্র, দানামগিয়াল। কুমার সহসা অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে আমায় জিজ্ঞেস করল, জঙ্গল কত ওজনের মাল নিয়েছে? বাহান্ন পাউণ্ড ওজনের জানাতে ও সঙ্গে সঙ্গে রুক-স্যাক খুলে আরও মাল ভরে নিল। তারপর স্কেলে চাপিয়ে তার পরিমাণ বাষট্টি পাউণ্ড দেখে খুশী হল। ওর বড় ইচ্ছে আমি ওদের সঙ্গে যাই। নানা রকম প্রলোভনও সেজন্যে দেখাল আমায়। কিন্তু আমার ভাগ্য বিরূপ। যাওয়া সম্ভব হল না বিশেষ কতকগুলো জরুরী কারণে। এ ছাড়া লীডারের

মতও আমার যাওয়ার স্বপক্ষে নয়। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে প্রত্যাখ্যান করতে হল। লীডার কিন্তু স্বয়ং গেলেন ওই দলে। যাবার সময় জানিয়েও গেলেন, ৩রা এপ্রিল তাঁরা আবার ফিরে আসছেন এখানে।

এইবার তৃতীয় দলের পালা। এই দলে আছে—সোনাম, গাম্বু, চাও ও রাজকাপুর। সোনাম, গাম্বু ও চাও অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে, কিন্তু রাজের আর হয় না। মেয়েদেরও বাড়া ও। তাগাদা লাগাতে বিরক্ত হয়ে ও জানিয়ে দিল—ওদের এগোতে। গোপাল এই ফাঁকে দেখি হাসতে হাসতে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। বক্তব্য ওর এই, ওরা যেদিকটায় যাচ্ছে সেদিকটায় নাকি ওর মোটে ঘোরা হয়নি। তাই যাচ্ছে ঘুরতে। উৎসাহ পেয়ে তাই গাম্বু আমায় ধরে বসল—ভিড়েই পড়ো না। একসঙ্গে বেশ মজা করে যাওয়া যাবে।

—উপায় নেই। তবে কাল নিশ্চয়ই যাচ্ছি। ভাল খাবারের যেন আয়োজন থাকে। নিবৃত্ত করলুম ওকে এই বলে।

চলে গেল ওরা। পড়ে রইলুম আমি কর্তব্যের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। কেউ কোথাও নেই। একান্ত একলা। দূরে ওই টেণ্টে আছে বাকী ক'জন সদস্য আর হেড কোয়ার্টার পার্টির কর্মচারীরা। ওদিকে আছে সামান্য কিছুসংখ্যক শেরপা ও পোর্টার—দৈনন্দিনের কাজে যাদের না হলে নয়। কী নিঃসীম নির্জনতা চারিদিকে! কেমন যেন অসহ্য বোধ করছি। প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্যে কোথাও যেন আর কাব্য খুঁজে পাচ্ছি না, বরং একঘেয়ে কুৎসিত লাগছে সব। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে—

'O Solitude! Where are thy charms
That sages have seen in thy face?
Better dwell in the midst of alarms
Than reign in this horrible place.'

উঠে দাঁড়াতে আর ইচ্ছে করছে না। অবসাদে দেহ ও মন ভরে গেছে। জায়গাটা পরিষ্কার দেখে তাই শুয়ে পড়লুম।

ঘুমিয়ে বোধহয় পড়েছিলুম। নন্দার ডাকে চেতনা ফিরে এল। ও বলছে, চল, খেয়ে আসা যাক্। দ্বিরুক্তি না করে ওর পিছু নিলুম। হাতে এখন অনেক কাজ। অনাবশ্যক সময় নষ্ট করা চলবে না, চলতে পারে না।

খাওয়াদাওয়ার পর অন্যদিনের মত আজ আর বিশ্রাম নিতে মন চাইল না। লেগে গেলুম কাজে। দেখতে লাগলুম কার রক্তে কতটা রক্তকণিকা আর হিমোগ্লোবিন বেড়েছে। আর ডিফারেনসিয়াল কাউণ্টেরই বা কী পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

আজ ঝুরা, রাজু নেই। দানামগিয়াল, এমনকি ভগ্নানীও নেই। তাদের জায়গায় সহৃদয়তার সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে রাও ও রায়। ওরা আমায় সমানে সাহায্য করে যেতে লাগল। বুঝতেই দিল না অন্যদের অনুপস্থিতির কথা।

কাজ করতে করতে কখন বেলা পড়ে এসেছে। কখন পাঁচটা বেজে গেছে জানি না, তখনও মাইক্রোসকোপে চোখ লাগিয়ে মনোযোগের সঙ্গে একটা ডিফারেনসিয়াল-কাউণ্ট করছি, এমন সময় রাও এসে তাগাদা লাগাল চা খেতে যাবার জন্যে। অগত্যা উঠতে হল সব ফেলে। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে মাইক্রোসকোপে কাজ করার দরুণ চোখটা টনটন করছে—বুঝতে পারছি। কী আর করা যায়! ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম চা খেতে।

ডিনারটা আজ যেন অনেক সকাল সকাল মিটে গেল। আর না মেটবার কোন কারণই দেখি না। দেরি করাবে যারা তাদের কেউ-ই যে নেই এখানে। বিরাট একটা শূন্যতা বিরাজ করছে চারিদিকে। টিমটিম করছে সারা তাঁবুটা। এখন শুধু শুয়ে পড়া। কত কথাই মনে আসছে। কুমার, কোহ্লী, চাও এবং জঙ্গলের অনুপস্থিতি ভীষণভাবে যেন অনুভব করছি। ক'টা দিন কি মজা করেই না

ওদের সঙ্গে কাটিয়েছি। ঠিক স্কুল-কলেজের ছেলেদের মত। মনে পড়ছে—লীডারের চোখে ধুলো দিয়ে চুরি করে লাড্ডু খাওয়া, তারপর লীডারকে ওই লাড্ডু খাইয়ে তাঁর কাছ থেকে রকেট আদায় করা। লীডারের অজান্তে সুবিধে পেলেই মাঠে-ঘাটে যেখানে হোক ব্রিজ খেলতে বসা, এমনকি রাত্রেও অনেক সময় মোমবাতি জ্বালিয়ে ব্রিজ খেলা, তারপর ধরা পড়ে তাঁর কাছে বকুনি। আর খেলব না বলে প্রতিজ্ঞা, সুযোগ পেলেই আবার তার পুনরাবৃত্তি। তা ছাড়া সময় সময় বড় বড় ম্যাপ খুলে আশপাশের শৃঙ্গগুলোর খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা, নানা অভিযান সম্বন্ধে মন্তব্য, আমাদের ভবিষ্যৎ প্লান নিয়ে গবেষণা—এমন কত কী! তবে সবচেয়ে বেশী জমত বান্ধবীদের নিয়ে আলোচনা। কুমার, কোলী তো ও-ব্যাপারে খাওয়াদাওয়াও ভুলে যেত। দিনের পর দিন দেখেছি ওদের কী সীমাহীন ঔৎসুক্য! কী ভাবে ওরা অপেক্ষা করে দিন গোণে ওদের স্ত্রী অথবা বান্ধবীদের একটা চিঠি পাওয়ার আশায়। ডাক-হরকরা এলে ওরা পরীক্ষার ফলাফল জানতে যাওয়ার মত দুরুদুরু বুকে ছোটে চিঠির সন্ধানে। কুমারের মত জোয়ানও ঘাবড়ে যায় বিশেষ করে এই সময়টিতে। আজকালকার স্ত্রী অথবা বান্ধবীরাও কি ওদের মত এমন করে প্রতীক্ষা করেন? কে তার জবাব দেবে? তবে এ কথা জোর করে বলতে পারি, ওঁদের সামান্য দু-একটি অনুরাগের কথা, অল্প দু-এক টুকরো সহানুভূতির আঁচড়, ওদের মত প্রেম-পাগল অভিযাত্রীদেরও অপরাজেয় দুর্জয় করে তুলতে পারে।

১লা এপ্রিল ॥ শুক্রবার

ঠিক সময়েই ঘুম ভেঙে গেল। 'কৃপা' (মেস্-বয়) এক মগ ধূমায়িত চা এনে হাতে দিল। পরিষ্কার ঝকঝকে সকাল, কিন্তু আজ

যেন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। কী রকম একটা ফাঁকা-ফাঁকা ভাব। একটা আশ্চর্য আলসেমিতে যেন পেয়ে বসেছে আমায়! অথচ দেহ তো চাঙ্গাই রয়েছে, কিন্তু মনের যে কী হয়েছে কে জানে!

এমনিই হয়। মানুষের মন এক তাজ্জবের দেশ। এক জটিল গোলক-ধাঁধার রাজ্য। তাই নিজের মনকেই আমরা সব সময়ে বুঝে উঠতে পারি না। জানি না এর অলিতে-গলিতে, আঁকে-বাঁকে কোথায় কী রহস্য লুকিয়ে আছে। মনের তো কোথাও হারিয়ে যাবার মানা নেই। তাই এখনকার এই অপ্রত্যাশিত আলস্যের অর্থটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না।

অবশ্য আজ আর বাইরে যাব না, সে কথা নন্দাদের কালই বলে দিয়েছি। লেবরেটরির অসমাপ্ত কাজগুলো যেন-তেন-প্রকারেণ শেষ করতেই হবে। অনেকগুলো রক্তের নমুনা এখনও দেখতে বাকী। রাজুটাকে কাল না ছাড়লেই দেখছি ভাল হত। এখন লেবরেটরির সমস্ত কাজ নিজের হাতেই করতে হবে। তবে মনে বেশ একটা তৃপ্তি পাচ্ছি। ভাবছি, কিসের টানে, কিসের আগ্রহে রাজু গেল— এই এত মাইল পথ বরফ ভেঙে, চড়াই ঠেলে, বিরাট বোঝা পিঠে ফেলে আর আচ্ছাদনহীন ফাঁকা মাঠে দুরন্ত শীতের হিমেল হাওয়া তুচ্ছ করে রাত কাটাতে? আর যাই হোক, এটা যে আমার ডাক্তারখানার জন্যে জমি নির্বাচনে নয়, এটা তো আমি হলফ করে বলতে পারি। ঝুরা এবং রাজুর এ ঘটনা তো সর্বকালের সর্বযুগের ঘটনা। এটুকু বলতে পারি এরই টানে পুরুষ সব-কিছু ত্যাগ করে। সুতরাং রাজুর এ কষ্টস্বীকার তো কিছুই নয়। এ ব্যাপারে ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, সব এক। অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজ্যত্যাগ তো এরই নিদর্শন।

'Love never reasons, but profusely gives,
Gives, like a thoughtless prodigal its all,
And trembles then lest it has done too little.'

তাই না একটু আগে বলেছি দুর্জ্ঞেয় মানুষের মন। এখন দেখছি তেমনি দুর্জ্ঞেয় তার প্রেম। প্রেম—সে তো অন্তরলোকের আলো। আলোতে কি মানুষ পথ হারায়? ওই অকপটহৃদয় পাহাড়ী রাজুও কি তবে তার পথ খুঁজে পেয়েছে!

বিছানায় শুয়ে এ-রকম এলোমেলো চিন্তা করতে করতে বেশ বেলা হয়ে গেল। উঠব-উঠব করছি—ঠিক এই সময়ে জনকতক লোক এসে জানাল, একজন রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার সাব্‌কে একবার দয়া করে ওই রুগী দেখতে যেতে হবে প্যাংবুচে গ্রামে। প্রস্তুত হতে গেলুম। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। রুগী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার ইচ্ছে থাকলেও বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করলুম না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি এদের কথার সঙ্গে রুগীর রোগের বিশেষ কিছু মিল থাকে না। খালি জেনে নিলুম রুগী হচ্ছে একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, নন্দা, সোহন, রায় ও রাও বেরুচ্ছে নতুন জলবায়ুসহনে অভ্যস্ত হতে। আজ ওরা চড়বে কাছেরই এক পাহাড়ে ক্যাংটেগার দিকে। আমায় দেখে সোহন জিজ্ঞেস করল, 'কী ডাক্তার, চললে কোথা, অভিসারে নাকি? এই বললে আজ বেরোবে না। কতই জান!'

হাসতে হাসতে বললুম, 'যমের বাড়ি, যাবে নাকি?' ওরা কী বুঝল জানি না, তবে আমার পিছু নিল। রায়কে আমাদের সংযোগাধিকারিক পেয়ে খুশী হলুম, ওকে দোভাষীর কাজে লাগানো যাবে।

ডাক্তারী ব্যাগটা সঙ্গে নিয়েছি আর তার সঙ্গে ক্লিনি-টেস্ট যন্ত্রটিও। আমেরিকার প্রত্যেক ডাক্তারের কাছেই এই যন্ত্রটি থাকে। রুগীর প্রয়োজনীয় রক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা সঙ্গে সঙ্গে করে নেওয়া যায় এর সাহায্যে। বিজ্ঞান আজ আমাদের কোথায় এগিয়ে নিয়ে গেছে ভাবলে অবাক লাগে। কিন্তু এখানে এদের কাছে এটাকে

পরিহাস বলে মনে হয়। এরা এখনও 'ছু'মন্ত্রে বিশ্বাস করে। আর করবে নাই বা কেন? রোগে এক ফোঁটা ওষুধ পাবার তো এদের উপায় নেই। তাই 'ছু'মন্ত্র ছাড়া এদের সান্ত্বনা কোথায়!

ইমজেখোলা নদী পেরিয়ে আমরা চলেছি চড়াই ঠেলে। চাষের ছোট-বড় ক্ষেতকে ডাইনে বাঁয়ে ফেলে। ঘুরে ঘুরে শুধু আমরা চলেছি পথনির্দেশকদের পেছন পেছন। শেষে একটা বাড়ির কাছে এসে ওরা থামল। বুঝলুম, এইটেই বাড়ি। বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই—ওই একই ধরনের বাড়ি, পাথর-দেওয়া দেওয়াল—আর মাথায় ছাউনি। গৃহকর্ত্রী আমাদের সাদরে ভেতরে নিয়ে গেল। একটা ঘরে বসাল। বেশ সপ্রতিভ তার ব্যবহার। বয়স প্রায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। সুঠাম স্বাস্থ্য। ওই পরিবেশে বেশ সুন্দরী বলা অসঙ্গত হবে না। সব সময়েই বেশ একটা হাসি-খুশি ভাব। রুগী হচ্ছে তারই বড় বোন। এবার একটা দশ-বারো বছরের ফুটফুটে মেয়ে আমাদের চা এনে দিল আর তার সঙ্গে দিল আলু ও ডিম-সেদ্ধ। যদিও রুগী দেখতে এসে এসব ভাল লাগছিল না, তবু এদের আন্তরিকতাপূর্ণ এই আপ্যায়ন প্রত্যাখ্যান করাও যায় না। সুজন হই আর দুর্জনই হই, সৌজন্য দেখাতে ক্ষতি কী?

এর পর আমায় পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল রুগী দেখাতে। এ কী! এ কোথায় এলুম! সপ্তলোকের যত অন্ধকার কি এখানেই জমাট বেঁধেছে। কোথাও একটা জানলা আছে বলে মনে হল না। এরা এখানে বোধহয় আলো-বাতাসের প্রবেশ-নিষেধ জারী করেছে। এক কোণে চুল্লী জ্বলছে। তাতে উত্তাপ বিকিরণের চাইতে ধূম্র উদ্গীরণের উপদ্রবটাই বেশী। এরা এতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমাদের চোখ জ্বলে যাচ্ছে। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে হয়তো দম আটকে মরে যাব। কিন্তু এদের কিছুই হয় না—আশ্চর্য।

চেষ্টা করে দেখলুম এক কোণে একটা বিছানার ওপর রুগী শুয়ে রয়েছে। সর্বাঙ্গ তার কম্বলে ঢাকা। রুগীকে বাইরে আলোয় আনিয়ে

ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলুম। মুখটা একদম ফ্যাকাশে, ফোলাফোলা, রক্তহীনতার লক্ষণ, জ্বরও রয়েছে। শরীরের গাঁটগুলো একটু বেশী-মাত্রায় ফোলা। ক্লিনি-টেস্ট যন্ত্রটা দিয়ে রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করে নিলুম সঙ্গে সঙ্গে। রোগটা হচ্ছে রিউম্যাটয়েড আর্থরাইটিস। এ রোগেও টি-বির মত দীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রথম দিকে চিকিৎসা হলে হয়তো সারে, তা না হলে বড় কিছু একটা হয় না।

চিকিৎসার প্রথম সোপান হচ্ছে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম, মুক্তবায়ুসেবন আর যথোপযুক্ত সুষম আহার্য। যাহোক, বিষয়টা ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দিয়ে বিদায় নিলুম।

বাইরে এসে দেখি ছোট একটা জনতা। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতায় ঠাস বোঝাই—এখানকারই সব বাসিন্দা। উন্মুখ হয়ে এরা দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে। আমরা যে তাদেরই গাঁয়ে রুগী দেখতে এসেছি—এতেই তারা কৃতার্থ। তাই সরল প্রাণের সহজ প্রকাশে তারা নৈবেদ্য সাজিয়েছে তাদের চোখে মুখে ভাবে ভঙ্গিতে। মুহূর্তে মনে হল আমি ধন্য। ধন্য আমার সেবাব্রত। যার দৌলত ভাঙিয়ে এই দুর্গম প্রদেশে, এই বিজন গিরি-প্রান্তরে আমার ঘর খুঁজে পেয়েছি, পেয়েছি রাজ্যেশ্বরের সম্মান। এদের এই মূক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন আমার ডাক্তারী জীবনে সব চাইতে বড় পাওয়া—এর তুলনা নেই।

ঠিক এই একই রকম কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে একই রকম অসহায় ভাব দেখেছি গাড়োয়ালের পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে, দেখেছি নাগাপর্বতবাসিন্দাদের মধ্যে, দেখেছি সিকিম-হিমালয়ের লোকেদের মধ্যে, আর দেখেছি ভারতের আরও নানা পার্বত্য অঞ্চলে। অথচ এই সব পার্বত্য লোকেদের হৃদয় ঠিক ওই পর্বতের মতই বিরাট ও উদার। সভ্য-জগতের মত হৃদয়বৃত্তি এখনও এদের ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়নি। এরা সরল অনাড়ম্বর। কৃতজ্ঞতা বলে জিনিসটা এখনও এদের বেঁচে আছে। সততায় এদের জন্মগত অধিকার। এরা কর্মঠ, বিশ্বাসী।

অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। তবু কেন এরা অসহায়ভাবে জীবন যাপন করবে? কেন এরা বিজ্ঞানের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে? পারে না কি আজকের সভ্য মানুষের দল বিজ্ঞানের মহান্ ঐশ্বর্য এদের কাছে পৌঁছে দিতে? এদের এই অসহায় ভাব দূর করতে? আসলে অবিমিশ্র সেবাপরায়ণতায় যে কোন মুনাফা নেই। অবারিত প্রকৃতির মাঝখানে এরা যে নিতান্তই অকিঞ্চন। আমাদের সভ্যতা সে কথা ভালভাবেই জানে!

আশান্বিত হয়েছি, যখন দেখেছি আপার গাড়োয়ালের সেই সব জায়গায়—সুরাইটোটা, জিলাম, ম্যালারি, কেম্পা, নীতি প্রভৃতি স্থানে সভ্যতা থেকে বহুদূরে—আমাদের স্বাধীন সহৃদয় সরকারের অকৃত্রিম প্রচেষ্টা জ্ঞানের দীপ জ্বালাতে—বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষামন্দির ও রোগের প্রতিকারের জন্যে ছোট-বড় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়। নাগাপর্বত অঞ্চলেও ওই একই প্রচেষ্টা চলছে। তবে সবই সময়সাপেক্ষ।

ফিরে চলেছি আমরা প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতে করতে। বেশ দেখতে লাগছে ওই ছোট-বড় ঘরগুলো ও তার সন্নিকটবর্তী ক্ষেতগুলো। আশা-নিরাশা প্রেমে-অপ্রেমে আমাদেরই মত মানুষ যেখানে সংসার পেতেছে।

এমনি একটা ঘরের সামনে এসে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। দেখলুম, তার সংলগ্ন ক্ষেতে একজন স্ত্রীলোক কাজ করছে আর একটা বাচ্চা ছেলে পিঠে একটা বিরাট ঝুড়ি নিয়ে তাকে সমানে সাহায্য করে চলেছে। প্রাচীর দেওয়ার কাজ। স্ত্রীলোকটা একটার পর একটা পাথর সাজাচ্ছে আর ছেলেটা পিঠে-বাঁধা ওই ঝুড়িতে করে সেগুলো তাকে এনে দিচ্ছে। আশ্চর্য! ছেলেটার বয়স হয়তো খুব জোর সাত-আট। স্বাস্থ্যের দ্যুতি সর্বাঙ্গে, মুখে একটা দৃঢ়তার ছাপ। হাসিমুখে পাথর বয়ে চলেছে ও। এক-একখানা পাথরের ওজন কমপক্ষে অন্তত ত্রিশ পাউণ্ড। ভাবছি, এরই মধ্যে হয়তো পাব

ভবিষ্যতের আর-একজন মহান্ তেনজিংকে। কিংবা দানরবু, কাঞ্চা, পাশাং, গিরমি, গিয়ালজেনের মত বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহীদের, যাদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোন অভিযানের সাফল্য কল্পনাও করা যায় না!

ছেলেটাকে আদর করে এক প্যাকেট চকলেট দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটাও এগিয়ে এসে এক প্যাকেট সিগারেট চেয়ে নিল। ধরালও একটা। স্ত্রীলোকটা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, সপ্রতিভ। স্ফূর্তিতে উচ্ছল। বয়স এমন কিছু নয়—চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই হবে। হরিণীর মত ছটফটে। পায়ে লাল জুতো। কাপড়ের তৈরী। দড়ি দিয়ে বাঁধা। গায়ে একটা মোটা উলের অ্যাপ্রন। কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নামানো। হাতে কানে গলায় রূপোর গয়না, তাতে নানা রঙের পাথর বসানো। জানিয়ে দিচ্ছে, নারী চিরকালের মোহিনী। চির-প্রসাধন-প্রিয়া নয়নরঙ্গিনী। পাহাড়ে সমতলে নারীর এ রূপের অন্যথা নেই।

তা হোক, এখানকার এই শেরপা স্ত্রীলোকরা নিঃসন্দেহে খুব কর্মতৎপর। কাজ করে এরা পুরুষের চেয়ে বহুগুণ বেশী। স্বাস্থ্যের আলোয় ঝলমল করছে এদের দেহ। পাহাড়ের উচ্চভাগে মাল নিয়ে ওঠা-নামায়ও এরা পিছিয়ে পড়ে না পুরুষদের কাছে। নির্দিষ্ট একটা উচ্চতায় এরাও অনায়াসে যাতায়াত করে পুরুষদেরই সমান ওজনের মাল নিয়ে। এ ছাড়া এরা নিজেদের গৃহস্থালীর কাজ, ছেলেমেয়ে ও ক্ষেত-খামারের দেখাশোনা, অন্যান্যদের পরিচর্যা, গৃহপালিত জীবদের পর্যবেক্ষণ, তাদের গায়ের লোম থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি প্রভৃতি তো করেই। গৃহনির্মাণ ব্যাপারেও এদের সহযোগিতা অপরিহার্য। এদেরই কর্মতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে এখানকার এক-একটা সংসার। ভাবলে অবাক লাগে, পূর্ণ গর্ভবতী অবস্থাতেও এরা কী ভাবে পুরো বোঝা নিয়ে অভিযাত্রীদের সঙ্গে ওঠা-নামা করে। প্রসববেদনা নিয়েও এরা মাঠে যায়, ছাগল-গরু

চরায়, গোবর কুড়োয়, কাঠ কাটে। প্রসব করার পূর্ব মুহূর্তেও এরা চিন্তিত হয় না—কারও সাহায্যও প্রত্যাশা করে না। এমনও হয়, বাচ্চা হয়ে গেল, তার একটু পরেই মা চলল বাচ্চাকে পিঠে ফেলে কাজ করতে। এমনি অদ্ভুত চরিত্রের স্ত্রীলোক এরা। এদের যত দেখি ততই অবাক মানি, মুগ্ধ হই, আর মগ্ন হই অন্তরের নিভৃত পূজায়। নারী এখানে পুরুষের পায়ের শৃঙ্খলবন্ধন নয়। মুক্ত শক্তির মূর্তিময়ী, সৃষ্টির কল্লোলিত লীলাচাঞ্চল্যে প্রাণময়ী।

ছেলেটাকে আর-একবার তারিফ করে চলার পথে আবার আমরা পা বাড়ালুম। মনে পড়ে গেল তৃতীয় দলের কথা—চাও, রাজ, সোনাম, গাম্বু অনেক করে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে ওদের ক্যাম্পে যাবার জন্যে। সোহনকে কথাটা মনে করিয়ে দিতে ও একেবারে লাফিয়ে উঠল, বলল, 'তবে আর দেরি কেন? চল, চল এখুনি যাওয়া যাক। খাওয়াটা তোফা হবে নিশ্চয়ই।'

ভোজনবিলাসী বেচারী সোহন। কী জুটবে ওর বরাতে কে জানে!

একমনে চলেছি। হঠাৎ পেছন থেকে সোহন হাতটা টেনে ধরে বলল, 'দাঁড়াও।' থমকে দাঁড়ালুম। দূরে একটা ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে ও বলল, 'দেখতে পাচ্ছ?'

সত্যই দেখবার মত। প্রথমে মনে হয়েছিল—একজোড়া ময়ূরই বুঝি দেখছি, কিন্তু পরে বুঝলুম—ময়ূর নয়—এক জোড়া মনাল। দেখতে অনেকটা ময়ূরেরই মত। ঠোঁটটা কালো, ঝুঁটি চক্‌চকে বেগুনে রঙের, ঘাড়টা সবুজ ও নীলের সংমিশ্রণে তৈরী, পাখাতে সবুজ-নীল-সাদার অপূর্ব বাহার। পুচ্ছে গেরুয়া রঙ। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে এই মনাল-দম্পতিকে বড় অদ্ভুত দেখতে লাগছে। মনটা যেন কেমন ভাবালু হয়ে উঠল। ভাবলুম, এরকম ভাবাবেগ তো এর আগে কখনও হয়নি। হিমালয়ে আমি তো এই প্রথম আসছি না আর মনালও তো আমি এই প্রথম দেখছি না—হিমালয়ের বুকে ৮০০০।১৫০০০ ফুটের

মধ্যে সর্বত্রই এদের অবস্থান। সুদূর আফগানিস্তান থেকে ভূটান, নেপালে কোথাও এরা কচিৎ-দৃষ্ট নয়। তবে কেন আজ এ ভাবালুতা !

নন্দার ডাকে খেয়াল হল। ও বলছে, 'ডাক্তার, সমাধিস্থ হলে নাকি ? মনাল-দম্পতি দেখে নিজের কোন 'ইয়ের' কথা মনে পড়ছে না তো ?'

ঝিরঝিরে বাতাস। অদূরে তুষারগিরি। তার ওপর এই অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। মনটা যে রোমান্টিক হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য কী ?

ওদিকে সোহনের বোধ হয় স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেছে। ওকে তাই বলতে শুনলুম, 'কী ব্যাপার বল তো—গত দু-দুটো ডাকের একটাতেও বাড়ির একটা চিঠি এল না ! সব ভাল আছে তো ! কে জানে কী আপদ-বিপদ ঘটলো !'

মিথ্যে নয় আপ্তবাক্য। স্নেহের স্বভাবই এই। অকারণে অমঙ্গল আশঙ্কা করে। হয়তো সবই মিথ্যে, সবই অমূলক, অর্থহীন—ভাবছিলুম। সোহন আবার বলল, 'এখন তো আবার আরও দুটো হপ্তা অপেক্ষা করতে হবে। নন্দা, লক্ষ্মীটি ভাই—ওয়্যারলেসে আজই একটা খবর পাঠিয়ে দাও।'

চড়াই ভেঙে চলেছি। মাঝে মাঝে দু-একটি ছোটখাটো শৃঙ্গও যে অতিক্রম করতে না হচ্ছে এমন নয়। এবার একটা খোলা মাঠে এসে পৌঁছলুম। ইয়কদের চারণক্ষেত এটা। থোলু-খুম্বুর লোকেরা শীতের পর এখানে ইয়ক চরাতে এসে থাকে। দেখলুম অগণিত ইয়ক চরে বেড়াচ্ছে ওপাশে ওই উন্মুক্ত দিগন্তের পটভূমিকায়। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সন্দেহ নেই।

তৃতীয় দলের ক্যাম্প এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ; তাওয়াচের ঠিক পদতলে—১৭০০০ ফুট উঁচুতে। বেলা প্রায় দেড়টার সময় ওখানে গিয়ে পৌঁছলুম। চাওরাও এইমাত্র ফিরে এসেছে।

খুব ভোরেই ওরা যাত্রা করেছিল তাওয়াচের চূড়ায় চড়বার জন্যে। চূড়ায় ওরা ঠিকই উঠত, কিন্তু লীডারের কোন ঝুঁকি নেওয়ার বারণ থাকায় বাধ্য হয়েই ফিরে এসেছে। ওই গ্লেসিয়ারটার শেষ ভাগটা সত্যই বড় ভয়ঙ্কর। তবে ওরা প্রচুর পরিশ্রম করে ওখান থেকে বিস্তর ছবি তুলে এনেছে।

ক্ষিধেয় নাড়ীভুঁড়ি হজম হবার উপক্রম হয়েছে। কালক্ষেপ না করে তাই সত্বর ভোজনে মনোনিবেশ করলুম। প্রচুর মুরগী রান্না হয়েছিল। গো-গ্রাসে তাই গিলে খাচ্ছিলুম মুখ বুজে। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি, রাশীকৃত মুরগীর ঠ্যাঙে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে সোনাম আর সোহনের পাত দুটো। সদ্‌গতি হবার মত জায়গাতেই পড়েছে ওগুলো নিঃসন্দেহে।

খাওয়া শেষে চলল রাজের টেপ-রেকর্ডিংয়ের গল্প। মনালের ডাক থেকে শেরপানীদের গান, কিছুই বাদ গেল না। চাওয়ের খুব ইচ্ছে একটু ব্রীজ খেলতে বসায়। আমাকে থেকে যেতেও তাই ও অনুরোধ করল অনেকবার। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। কারণ গোড়া থেকেই গল্প-গুজবে, হাসি-কৌতুকে দেরি হয়ে গেছে বেশ।

ফিরতি পথে দেখি একপাল বরার (তুষার-হরিণ) পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে নামছে এক অপূর্ব ভঙ্গিতে। চলার সে কী ঠমক! বেশীক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকার অবকাশ নেই। অন্ধকারের পাখা মেলে সন্ধ্যা যে ঘনিয়ে আসছে।

২রা এপ্রিল ॥ শনিবার

কারা যেন ঝাঁকুনি মেরে ঘুমটা ভেঙে দিল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলুম। দেখি, নন্দা আর সোহন হাসছে। বিরক্তিতে মনটা ভরে গেল। এখনও ভোরই হয়নি, আর এ কী আপদ! শেষরাতের এমন

সুন্দর ঘুমটা মাটি করে দিল! ওদের গালাগালি করতে লাগলুম। ওরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষে আমায় বিছানা থেকে তুলে তবে ছাড়ল।

ওদের ইচ্ছে আজ কাংটেগা শৃঙ্গগুলোর দিকে যাওয়ার। যে ক্যাংটেগা আজও মানুষের চির-বিস্ময়। উচ্চতা এমন কিছু নয়, মাত্র ২১।২২ হাজার ফুট। তবু এখনও তার শীর্ষ জয় করতে কেউ সক্ষম হয়নি। কারণ তা করতে যাওয়া একরকম আত্মহত্যারই সামিল। উচ্চতাই পর্বতারোহণের একমাত্র মাপকাঠি নয়, টেকনিকাল সুবিধে-অসুবিধের কথাও চিন্তা করতে হয়।

শুনে আশ্বস্ত হলুম, ওরা প্রধান শিখরে ওঠার ঝুঁকি নেবে না—লীডারের বারণ বলে (তা না হলে সোহন নাকি দেখিয়ে দিত ওতে চড়ে)। ওদেরই ছোট্ট মেয়ে 'লাকপুটি' ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের দক্ষিণে, ওদিকেই নাকি সোহনদের এখন লক্ষ্য। ১৯৫৬ সনে সুইস এভারেস্ট যাত্রীদল তাদের নতুন জলবায়ু অভ্যাসকালে প্রথম ওই শৃঙ্গে আরোহণ করে ওর নাম দেয় 'লাকপুটি'।

লাকপুটি একটা ছোট্ট শেরপা মেয়ে। ওর বাবা ছিল ওই দলের একজন পোর্টার। ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে লাকপুটি। ওই দলের সাহেবদের সকলের প্রিয়পাত্রী। তাই ওরই নামানুসারে ওরা চূড়ার নাম দেয় 'লাকপুটি-পিক্' (১৭৭০০ ফুট)। কথাবার্তায় বুঝলুম সোহনের খুব ইচ্ছে ওই লাকপুটির কাছে আর-একটি নাম-না-জানা যে ভারজিন পিক্ (চূড়া) রয়েছে তাইতে আরোহণ করা। অর্থাৎ ওদেরই মত কৃতিত্বপূর্ণ কিছু একটা করে আসা।

সোহন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু মনে-প্রাণে এখনও যুবক। সব ব্যাপারেই ওর উৎসাহ প্রচুর। কোন কাজেই ও পেছ-পা নয়। সত্যি কথা বলতে কী, বয়স হলে কী হবে, শক্তি ও সামর্থ্য দুই-ই ওর আছে। প্রাণপ্রাচুর্যে ও ভরপুর। বেশ বোঝা যায় পাহাড়ের প্রতি ওর একটা আন্তরিক টান আছে। তাই তো ও হিমালয়ের

ডাক উপেক্ষা করতে পারে না। সুযোগ পেলেই তাই তার সান্নিধ্যলাভে বেরিয়ে পড়ে। ও গেছে কৈলাস মানসসরোবরে, ও দেখেছে অমরনাথ। এইতো সেদিন অত বয়সেও ও হিমালয়-পর্বতারোহণ-প্রতিষ্ঠানের একটা পর্বতারোহণ কোর্স করে এল।

আমাকে আরও উৎসাহিত করতে কালকের ঘটনার জের টেনে সোহন বলতে লাগল, 'ডাক্তার, কাল তো খালি মনাল আর বরার (তুষার-হরিণ) দেখে মুগ্ধ হয়েছ, আজ দেখতে পাবে—স্নো-প্যাটরিজ, ইয়োলো-বিলড-কাফ, ব্লাড-ফেজান্ট, স্নো-কক্, স্নো-পিজন, তা ছাড়া হয়তো হরিণের দল; দেখবে হয়তো বন্য ইয়ক ও ছাগলের দল, এমনকি দু-একটা ভাল্লুক, লেপার্ডও। আর তা ছাড়া যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে যাবে তার তুলনা নেই। রাস্তা আমাদের ওই ঘন রডোডেনড্রন-বনের মধ্য দিয়ে। ভাবছি ওই পরিবেশে তোমার রোমান্টিক মন কোথাও না আবার উধাও হয়ে যায়।

সত্যিই লোভ সামলাতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হবার জন্যে লেগে গেলুম। মনে পড়ছে রাজুর কথা—এই সময় ও থাকলে কোন জিনিসটারই কথা ভাবতে হত না। সবই ও গুছিয়ে দিত অকৃত্রিম উৎসাহে। কিন্তু ও বেচারীই বা থাকে কী করে! রাজুই যদি ওর চলে যায় তাহলে ওরই বা কাজে মন আসে কী করে! যাবার দিন সকালে তো ঝুরা এই নিয়ে একটা হাস্যকর দৃশ্যেরই অবতারণা করল। কায়দা করে ও জেনে নিতে এসেছিল রাজু যাচ্ছে কি-না? ভাবছি নানা কথা, এমন সময় সোহন আবার তাগাদা লাগাল।

ক্যাম্পের দক্ষিণ দিক দিয়ে আমরা চলতে শুরু করলুম। মাঠ পেরিয়ে বনপথ ধরলুম। সত্যই অপূর্ব এ পরিবেশ। এতদিন কাজের তাগিদে এখানকার জীব-জগতের সঙ্গে ভালভাবে পরিচয় করা সম্ভব হয়নি। তাই আজ প্রকৃতির কোলে যা-কিছু দেখছি তাই-ই যেন অপূর্ব লাগছে। আমি এক মধুর গানের ঝঙ্কার শুনতে পাচ্ছি ওই সব পাখির কাকলীরবে। মুগ্ধ হচ্ছি, তন্ময় হচ্ছি। অদূরে দেখছি

কয়েকটা চকোর বসে রয়েছে একটা গাছের পাশে একটু খোলা জায়গায়। ওগুলোকে দেখতে অনেকটা পায়রার মত। গায়ের রঙ ধূসর, ঘাড়ের কাছটা কালো-সাদার সংমিশ্রণে ছোট ছোট ডোরা কাটা, সব সময় যেন এক বেপরোয়া ভাব। আমরা এতটা কাছে এসে পড়া সত্ত্বেও ওদের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে এক-একবার আমাদের দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকাচ্ছে আর বকর বকর করে কী যেন সব বকছে। বোধ হয় ওদের রাজ্যে আমাদের এই অনধিকার প্রবেশটাকে ওরা মোটেই অনুমোদন করতে পারছে না। তাই বলতে চাইছে—'আপদ বিদেয় হও'। ওদের দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়, তবু কেন জানি না এই সময়টিতে ওদের সুন্দর না ভেবে পারছি না।

সন্তর্পণে ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ দেখতে পেলুম এক ঝাঁক তুষার-পারাবত উড়ে চলে গেল ইমজেখোলা নদীর দিকে। অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত নিষ্পলক চোখে আমরা তাকিয়ে রইলুম ওদের দিকে। মনটা ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে! কত কথা মনে পড়ে যায়, কত টুকরো টুকরো স্মৃতি। পায়ের নীচে সদ্য-ঝরে-পড়া বরফ, মাথার ওপরে ঝলমলে সূর্যকিরণ আর দু পাশে ঘন রডোডেন-ড্রনের বন—চলেছি আমরা তাদেরই আচ্ছাদনে, কোমল-মধুর ছায়ায় ছায়ায়। রডোডেনড্রনকে বাদ দিয়ে নেপালের উদ্ভিদ-জগতের কথা চিন্তা করা যায় না। এর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এরা জড়িয়ে রয়েছে—এরা ছড়িয়ে রয়েছে এখানকার উদ্ভিদ-রাজ্যের একরকম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। পাঁচ-ছয় হাজার থেকে সতরো-আঠারো হাজার ফুটে।

হঠাৎ এই সময়ে সোহন একগাদা ফুলপাতা, গাছের ছোট ছোট ডালপালা এনে আমার সামনে ফেলল আর নিজের মনেই বকতে শুরু করল, 'হাঁ, হাঁ বাবা, আজ যেসব নমুনা যোগাড় করেছি তা আর কোন চাঁত্বকে পেতে হবে না।'

অনেক গুণের মধ্যে সোহনের এও আর-একটা গুণ, গাছ-গাছড়ার নমুনা যোগাড় করা। আমাদের এ অভিযানে উদ্ভিজ্জসংগ্রাহক মিশ্র।

কিন্তু লক্ষ্য করেছি সোহন সমানে তাল দিয়ে চলেছে মিশ্রের সঙ্গে এ-ব্যাপারে। থাক্ সে কথা, সোহন এবার আরম্ভ করল ওর বক্তৃতা—কোন্ ফুলটার কী নাম, কোন্ গাছটাকে কী বলে, কোন্ পাতাটাকে কার মত দেখতে—এই সব। এর পর আমায় পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল প্রত্যেকটা নমুনার সঙ্গে—এটা হচ্ছে Primulae, এটা হচ্ছে Poppies, এগুলোর মধ্যে আছে Androsacas, Siline, Sanifragi, Potentilus, Anemones, Ranuncoli, Veronicus, Phanerogamia। শেষে মন্তব্য করল, এসব নমুনা সমতলে পাওয়া যায় না, পেতে হলে অন্তত আট হাজার ফুট উঁচুতে ওঠা চাই। একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল ফুল পাতা ও গাছের বর্ণনা—কোন্টা Plicifolia, কোন্টা Difolia, কোন্টা Trifolia, কোন্টাকে বলে Arenaria, কোন্টাকে বলে Microphylla। বিরক্ত হয়ে উঠলুম এবার। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও উদ্ভিদতত্ত্বের ধারও ধারিনি কোনদিন। তাই এসব ব্যাখ্যার বুঝছি না-ও কিছু। তা ছাড়া জ্ঞানের জিনিসের চাইতে এসব ক্ষেত্রে আমার ভাবের জিনিসই ভাল লাগে বেশী। ফুলের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চেয়ে তার মনোহারিত্বটাই এখন আমার কাছে বেশী উপভোগ্য।

সত্যিই কত রকমেরই না ফুল দেখছি—সাদা, সাদাটে, হলদে, হলদেটে, লাল, গাঢ় লাল, ফিকে লাল, বেগ্‌নে, এছাড়া নানা রঙের সংমিশ্রণেও। এই ফুল সচরাচর ফোটে কোন ডালে একটা, কোন ডালে পাঁচটা, আবার কোন ডালে বা পঁচিশটা। দুধকোশী নদীর দু ধারে এদের সমারোহ দেখেছি আর দেখেছি ইমজেখোলার চতুর্দিকে। ওপরের দিকে গাছগুলোতে দেখা যায় বেশীর ভাগ হলদে রঙের ফুল আর তারও ওপরেরগুলোতে লাল রঙের। সব চেয়ে ওপরের গাছগুলো হয় বেশ একটা গুচ্ছাকারে। বিশেষ এক ধরনের রডোডেনড্রন আছে, তাদের গন্ধ অনেকটা মধুর মত।

মনে পড়ছে সেদিনের কথা। বাস্তবিক সেদিন যে প্রাকৃতিক দৃশ্য

উপভোগ করেছি তার তুলনা মেলা ভার। আসছিলুম নামচে থেকে থ্যাংবুচে হয়ে প্যাংবুচেতে। হঠাৎ দেখলুম প্রকৃতির রূপ যেন পাল্টে গেছে—মর্ত্যলোক ছেড়ে বুঝি-বা আমরা ইন্দ্রলোকে এসে হাজির হয়েছি। যেদিকে ফিরি সেদিকেই অবাক লাগে—সহস্র সহস্র রডোডেনড্রন গাছের মিছিল চারিদিকে—তাদেরই শাখায় শাখায় লাখো লাখো ফুলের মেলা—কী তার ভুবন-ভোলানো রূপ—কী তার রঙের বাহার! শুধু কি তাই! ওই সব ফুলকে ঘিরে দল বেঁধে এসে বসেছিল রঙ-বেরঙের পাহাড়ী পাখি। আবেগে আনন্দে সোহাগে চুম্বনে তারা বিস্রস্ত করে তুলছিল তাদের পাপড়ীগুলো—উদার ছন্দে পরমানন্দে তারা কূজনে মুখরিত করে রেখেছিল সারাটা স্থান।

আজও কোথাও যেন তার ব্যতিক্রম দেখি না। সেই পাখিদের কলকাকলী, সেই রডোডেনড্রনের চমক-লাগানো শোভা, সেই অরণ্য-প্রান্তর নদী-নির্ঝর চারিদিকে। সৃষ্টিকর্তার শিল্পচাতুর্যের যেন এক-একটি প্রাণবন্ত রূপ। যেদিকেই চাই সেদিকেই যেন তাঁর শিল্পকলার অভিনবত্ব।

ওই যে মাথার ওপর উন্মুক্ত নীলাকাশ, যেখানে খণ্ড খণ্ড মেঘের মধ্যে চলেছে নানা রঙের খেলা—ওই যে অদূরে চতুর্দিকে তুষারের শ্বেতবস্ত্রে আবৃত হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরপুঞ্জ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে রূপের ছটায় আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে—আর এই যে চারিদিকে বনপ্রকৃতি নানা বর্ণে গন্ধে ছন্দে বাঙ্ময়—কোথায় না রয়েছে তাঁর মৌলিকত্ব! কবির মত, কী জানি কেন, আমারও যেন আজ মনে হচ্ছে—

> 'হয়তো হোথাই যক্ষপতির অলকানগর,
> হয়তো হবে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর;
> রজতগিরি শঙ্করেরি অঙ্কোপরি, হায়,
> কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মূরছায়!
> হয়তো আদিবুদ্ধ হোথায় সুখাবতীর মাঝে
> অবলোকন করেন ভূলোক সাজি কিরণ সাজে!'

তাই ভাবছি, আজ আমি কত ভাগ্যবান। নেপালের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় তো আমার এখনই হচ্ছে। এর আগেও আমি নেপালে এসেছি কিন্তু তখন আমি এই উপত্যকা-অধিত্যকা, এই বন-উপবন, এই গিরি-গহ্বরকে তো এমন করে দেখিনি। তখন বেশীর ভাগ সময়েই আমি এর কৃত্রিম জাঁকজমকে বেশী অভিভূত হয়েছি। কারণ আরামপ্রিয় মন আমার তখন শহরের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই আসক্ত ছিল বেশী। তাই আরামের উপকরণকে বাদ দিয়ে সে তখন অন্য-কিছুকে কিছুতেই বড় করে দেখতে পারেনি। কিন্তু আজ সে মোহ বহুলাংশে দূরীভূত হয়েছে বলেই বোধ হয় নতুন করে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। আজ তাই এটা সত্য বলেই জেনেছি—উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগৎকে বাদ দিয়ে নেপাল দেখা সম্পূর্ণ হয় না।

ভাবতে বেশ লাগে, সেই জয়নগর থেকে যাত্রা হল শুরু। তারপর দেখলুম বাংলা দেশের মত বড় বড় মাঠ, ধান-গম-ভুট্টা-ইক্ষুর ক্ষেত—দেখলুম আম-লিচুর বাগান—রাস্তার ধারে ধারে বিরাট বিরাট বট-অশ্বত্থ গাছ—তারপর এক সময় এসে পৌঁছলুম পাহাড়ে। সেখান থেকে শুরু হল সাইপ্রেস সিডার আর পাইনের বন—তারপর আরও উঁচুতে (১০,০০০-১৫,০০০ ফুট) জুনিপারের সারি, গায়ে তাদের ধূপের সুরভি।

থাক্ সে কথা। সোহনকে বললুম, 'খুব তো বড়াই করলে—লেপার্ড কেন, একটা বনবেড়াল দেখলেও যে বাঁচি।'

ঠিক এই সময় সোহন অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলল, 'ওই দেখ মাস্ক্-ডিয়ার।'

ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখলুম। তারপর ব্যঙ্গ করে রাওকে জিজ্ঞেস করলুম, 'সোহনের মাস্ক্-ডিয়ার দেখলে তো?'

রাও হাসতে হাসতে বলল, 'রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় শুনেছি, কিন্তু ছাগলে হরিণভ্রম কখনো শুনিনি।'

ক্যাম্পে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে গেল। খাওয়াদাওয়া সেরে

আর তাই বিশ্রাম নেওয়া গেল না। ডিস্‌পেন্‌সারিতে এসে বসলুম। রক্তের যে সব নমুনা পরীক্ষা করতে বাকী আছে, সেগুলো আজ যতদূর সম্ভব সেরে ফেলতে হবে। আর তারপর কিছু লেখালিখির কাজও করতে হবে—তার মধ্যে দুখানা চিঠি খুবই জরুরী। এবারের ডাকে না পাঠালেই নয়।

৩রা এপ্রিল ॥ রবিবার

'ডাক্তার সাব্, চা—।' চোখ চেয়ে দেখি কৃপা এক মগ গরম চা হাতে দাঁড়িয়ে। কেমন যেন অবাক লাগছে সব। এইমাত্র আমি কোথায় ছিলুম? আর এখন কোথায় আমি? না না, আমি তো ঠিকই আছি। সেই টেণ্টে, সেই চেনা-জানা পরিচিতদের মধ্যে।

তবে? তবে কি আমি স্বপ্ন দেখছিলুম? টেণ্ট ছেড়ে অভিযান ফেলে মিলেমিশে ছিলুম আমি এতক্ষণ বাড়িতে আমার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে। মধুর গালগল্পে হৈ চৈ-এ মাত করে তুলছিলুম আমি সারা বাড়িটা। ছায়াছবির মত একের পর এক দৃশ্য এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মানসপটে :

বাইরের ঘরে আমি বসে আছি। সকালবেলা। হঠাৎ বউদি যেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমায় বলল—কী খাবে বল?

কপট ভাবে মুখের দিকে চাইলুম।

—বল টপ্ করে। অনেক কাজ আজ। যা বলবে তাই খাওয়াব।

—উচ্ছ্বাসটা যে আজ দেখছি বড্ড বেশী। ব্যাপার কী?

—হওয়াই স্বাভাবিক। 'ডাক্তারবাবু'র যে আজ জন্মতিথি।

—তাই না কি?

—হ্যাঁ, হাঁদাকান্ত। আমার কিন্তু এই ছোটখাটো তিথিতে আর মন ওঠে না। বড় তিথিটাকে যে কবে পাকড়াও করব!

—মানে ?

—মানে তোমার বিয়েটা দেব। একটা টুকটুকে বউয়ের হাতে তোমার সব ভার তুলে দিতে পারলে তবে তো আমাদের নিশ্চিন্তি।

—বাঃ! বেশ যে পাকা গিন্নীর মত কথা বলছ দেখছি।

—সময়বিশেষে অমন বলতে হয়।

—বলতে হয় বুঝি ? দাদাকেও অমন বল ?—আলতো করে জিজ্ঞেস করলুম।

—জানি না।—খেঁকিয়ে উঠল বউদি—বলবে তো বল কী খাবে ? নইলে চললুম।

রাণু এতক্ষণ চুপ করে টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে একটা বিস্কুট গলাধঃকরণ করছিল। সবটুকু নিঃশেষ করে বুদ্ধিমতীর মত এবার আমাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলল, 'হ্যাঁ কাকু, বাবাকেও বলে।'

—কী, কী বলে মা-মণি ?

—পত্ত। 'আপন হাত জগন্নাথ'।

—বাঃ বাঃ! বেশ পত্ত।—দারুণ শব্দ করে বিকট ভাবে হেসে উঠলুম।

বউদি প্রায় থতমত খেয়ে বলল—'পাগল নাকি ?' তারপর রাণুর দিকে চেয়ে—'আয় তুই এদিকে। তোকে একবার দেখাচ্ছি আমি।'

ওকে দু হাতে আড়াল করে বললুম—'দেখাবে কী ? তুমি পত্ত বলেছ ও মুখস্থ করেছে। এতে দেখাদেখির কী আছে ?' আবার হেসে উঠলুম।

মা এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল—'কী কথা হচ্ছে গো বউমা ? ও অমন হাসছে কেন ?'

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমি বলতে গেলুম—'বউদি আজকাল প—।'

লজ্জায় জিব কেটে বউদি আঁচল দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরে মাকে বলল—'ও কিছু না মা। যতসব ফাজলামি—'

এমন সময় ঘুমটা ভেঙে গেল রুপার ডাকে।

আটটা নাগাদ লেবরেটরিতে এসে বসলুম। অনেকগুলো রক্তের নমুনা এখনও দেখতে বাকী। কবে যে ওগুলো শেষ করতে পারব বলতে পারি না। ভগ্নানী থাকলে এতটা চাপ আমার ওপর পড়ত না। দুজনে ভাগ-বাটোয়ারা করে সেরে ফেলতুম সব দু-একদিনে। আর পরামর্শ করে কাজ করার মধ্যে গতিও থাকত সব সময়। তার ওপর রাজু। মেশিনের মত হাতে হাতে ও জুগিয়ে যেত সব। কোন্টার পর কোন্ জিনিসটা দরকার সবই যেন ওর নখদর্পণে। চাইতেও হত না কিছু। সবশেষে মাঝে মাঝে ঝুরার আনাগোনা।

গতির মধ্যে ও ছিল যেন বিরতি। তাই নতুন উদ্যমে কাজ করার মনোবলটাও থাকত সব সময়। নিরুদ্যম হতুম না কখনও। কারণ কোন কাজকেই ও আমাদের গুরুত্ব দিত না। একান্ত ব্যক্তিগত ওর কথাগুলোকে ও আমার কাছে খুশিমত বলবে। আর সব ফেলে তা শুনতেও হবে। শোনবার উৎসাহ না থাকলে অন্তত উৎসাহের অভিনয়ও করতে হবে। তা না হলেই বিপদ। মুখভার, মান-অভিমান। অবহেলা করা যেত না ওকে কোন সময়ে।

ভাল না-লাগা সত্ত্বেও বেশ কতকগুলো নমুনা পরীক্ষা করে ফেললুম। এ ছাড়া এখন করবারও কিছু নেই। পরীক্ষার ফলাফলে খুশী হলুম। কারণ ঊর্ধ্বভাগে সাধারণত ইওসিনোফিল গণনা অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু সুখের বিষয়, আমাদের দলের কারও তেমন কিছু বাড়েনি। দু-একজনের যাও-বা একটু-আধটু বেড়েছে তা ও-কারণে না হয়ে অন্য কোন কারণেও হতে পারে। সুনিশ্চিত হওয়াটা আরও অনুসন্ধানসাপেক্ষ, এ কথা বলাই বাহুল্য।

লেবরেটরির কাজ সেরে সবে মাত্র বেরিয়ে আসছি, এমন সময়ে দেখি, মাল নিয়ে কয়েকজন পোর্টার এসে হাজির। ফ্লাঃ লেঃ গাড়োয়াল বা খালিফ পাঠিয়েছে ওগুলো। ওতে আছে ট্রান্‌জিস্টর সেট ও গ্লেসিয়ার ক্রীম—পাহাড়ের ঊর্ধ্বভাগে নতুন জলবায়ু সহ্য করার অভ্যাসকালে ওগুলোর প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে।

পোর্টাররা জানাল, ২০শে মার্চ খালিফও জয়নগর থেকে যাত্রা করেছে। একলাটি। সঙ্গে আনছে অভিযানের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস—১৬০টা অক্সিজেন-সিলিণ্ডার। বিলেত থেকে ওগুলো আমদানি করার জন্যে ওকে আটকে পড়তে হয়েছিল একদিন। খালিফকে এতদিন তরলমতি বলেই জানতুম। কিন্তু এখন দেখছি কর্তব্য ব্যাপারে ও-ও ভীষণ নিষ্ঠাবান। ব্রিগেডিয়ার সত্যিই লোকনির্বাচনে অদ্বিতীয়। খালিফকে ঠিকই উনি নির্বাচন করেছেন এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজে। আর তাই নির্বিবাদে চলেও আসতে পেরেছেন সব দায়িত্ব ওর ওপর ন্যস্ত করে।

বিলেতের ফিলিপস্ কোম্পানির কাছ থেকে আমরা ট্রান্‌জিস্টর-সেটগুলো কিনেছি। পাহাড়ের নানা উচ্চতায় নিঃসন্দেহে ব্যবহারের উপযোগী করে ওগুলো তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি সেটের ওজন মাত্র দু-তিন পাউণ্ড। অনায়াসে বুকে লাগিয়ে বহু দূর যাতায়াত করা চলে আর সেই সঙ্গে অন্যের সঙ্গে কথা বলাবলিও করা চলে স্বচ্ছন্দে।

কোম্পানি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের ছ'টা সেট্ উপহার দিয়েছেন। ব্যবহার করে দেখবার জন্যে। আর আমাদের কাছ থেকে ওগুলোর ব্যবহারিক ফলাফলও জানতে চেয়েছেন। ফলাফলের বিবরণ তৈরি করার ভার পড়েছে রাজেন্দ্র বিক্রমের ওপর। ও বৈজ্ঞানিক—এ ব্যাপারে ওর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য।

মাল-বোঝাই বাক্সটা খুলে দেখবার লোভ সম্বরণ করা ক্রমেই আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। অথচ বিবেকেও বাধছে খুলতে, কারণ রাজের এক্তিয়ারে এটা। ও যদি আবার কিছু মনে করে!

ঠিক এই সময় চাও আর সোনাম এসে হাজির। পেছনে ওদের গাম্বু গোপাল ও আরও অনেকে। কী যেন এক অব্যক্ত আনন্দে মন-প্রাণ আমার ভরে উঠল। একরকম ছুটে গেলুম আমি ওদের অভ্যর্থনা করতে। ওরাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল আমার কাছে।

সোনামের মুখের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ওর মুখটা

পুড়ে যেন কালো হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করে জানলুম—নামচেবাজারে ও একজনের কাছ থেকে একটা ফ্রেঞ্চ্ গ্লেসিয়ার-ক্রীম কিনেছিল। গ্লেসিয়ারে কাজ করতে যাবার আগে ও সেটা মুখে মাখে। তারই পরিণাম এই।

পরীক্ষা করে দেখলুম গ্লেসিয়ার ক্রীমটা। আশ্বস্ত হলুম জেনে ওটা গ্লেসিয়ার ক্রীম নয়—ফ্রস্টবিটিন-ক্রীম।

আরও একটু পরে রাজেন্দ্র বিক্রম এল। একসঙ্গে বসে সব চা খেতে খেতে ওর কাছে গত কালের টেপ-রেকর্ডিংয়ের গল্প শুনতে লাগলুম। কাল সমস্তদিন ও প্যাংবুচে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে আর সেই সঙ্গে প্রচুর রেকর্ড করেছে ওখানকার লোক-সংগীতের ও পশু-পক্ষীর ডাকের। রাজের ধৈর্য বাস্তবিক এ ব্যাপারে অপরিসীম।

কথা-প্রসঙ্গে সোনাম জানাল—তাওয়াচের ওপর গ্লেসিয়ারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ থাকায় ওরা শীর্ষজয়ের চেষ্টা কোন রকমে দমন করেছে সত্য, কিন্তু প্রচুর প্রয়োজনীয় পদ্ধতির মহড়া দিয়েছে ওর নানা বিপদসঙ্কুল জায়গায়।

এর পর রাজেন্দ্র বিক্রমকে ধরে খোলা হল বহু-প্রতীক্ষিত ট্রান্‌জিস্টর সেটের প্যাকিং বাক্সটা। আনন্দে বিস্ময়ে আমরা হকচকিয়ে গেলুম কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর ইচ্ছেমত প্রত্যেকে এক-একটা সেট বুকে বেঁধে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলুম ওগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখতে। ক্যাম্প থেকে আমি প্রায় মাইল খানেক তফাতে এসে 'ইয়ার-পিস্'টা কানে লাগিয়ে রাজের সঙ্গে সংযোগ করতে চেষ্টা করলুম। অদ্ভুত ফল পেলুম। আমি বলি রাজ শোনে, রাজ বলে আমি শুনি। এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কথা-বলাবলির পর অপূর্ব এক আনন্দানুভূতি নিয়ে ফিরে এলুম টেণ্টে।

লীডারও এসে গেলেন এই সময়। ট্রান্‌জিস্টর সেট্‌গুলো দেখে আনন্দে উনিও আত্মহারা হলেন। ভুলে গেলেন বিশ্রাম নেওয়ার কথা, ভুলে গেলেন চা খাওয়ার কথা—হাত থেকে আমার সেট্‌টা নিয়ে

বালকের মত উনিও ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দূরে একটা পাহাড়ের বাঁকে। তারপর সংযোগ করতে লাগলেন রাজের সঙ্গে।

লাঞ্চ খেতে খেতে লীডার সকলের কুশল নিলেন। সোনামকে তিনি সমবেদনা জানালেন ওর নির্বুদ্ধিতার পরিণাম দেখে। তারপর ওদের কাজের সবিস্তার বিবরণ শুনলেন মন দিয়ে।

খাওয়া শেষে ব্রিগেডিয়ার সর্বপ্রথমে খালিফ-প্রেরিত গ্লেসিয়ার ক্রীম ও ট্রান্‌জিস্টর সেট্ বিশেষ রানার মারফত প্রত্যেক দলের কাছে হিসেবমত পাঠিয়ে দিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন একদিনের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা।

ব্রিগেডিয়ার বললেন—যাত্রার দিনটা (৩১শে মার্চ) ছিল ভারি চমৎকার। ইমজেখোলা নদীর তীর দিয়ে তাঁরা চলতে শুরু করেন পিঠে পঞ্চাশ-ষাট পাউণ্ডের বোঝা ফেলে। প্রত্যেকেই যেন যুদ্ধের সশস্ত্র সৈনিক। কুচকাওয়াজ করে চলেছেন স্থির কোন লক্ষ্যে। নতুন জলবায়ু সহ্য করার অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা-বহনের যোগ্যতাও অর্জন করা চাই সকলের, তা না হলেই বিপদ প্রতি পদে। পোর্টাররা হাসছিল তাঁদের বোঝা-বহনের রকম দেখে। কিন্তু উপায় কী ? 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ'।

ইমজেখোলা আর খুম্বুখোলার সংযোগস্থলে—তিনি একটু থেমে আবার বললেন—এক মনোরম জায়গায় বসে তাঁরা লাঞ্চ সারেন, তারপর গিয়ে ঢোকেন ডিংবুচে গ্রামে। গ্রামটা এককথায় পরিত্যক্ত। এক-একটা জমির অংশ পাথরের দেওয়াল দিয়ে ভাগ করা। কতকগুলো জীর্ণ কুটির এদিকে-ওদিকে টিম্‌টিম্ করছে অনিয়মিতভাবে। শীতকালে ওখানে কেউ থাকে না। গ্রীষ্মকালে যাহোক তবু দূরাঞ্চলের গ্রামবাসীরা ইয়ক চরাতে এসে ওখানে কিছুদিন থাকে।

গ্রাম ছাড়িয়ে আরও কিছুদূরে এক সুন্দর খোলা জায়গায় তাঁরা সেদিনকার মত ক্যাম্প করেন। তারপর তাস খেলে, খোশ-গল্প করে, ডিনার খেয়ে লম্বা এক ঘুমে রাত কাটিয়ে দেন। পরের দিন

(১লা এপ্রিল)—ব্রিগেডিয়ার বললেন—সকাল আটটায় আবার তাঁরা যাত্রা করেন। লক্ষ্য ছিল তাঁদের সামনের উঁচু খাড়া পাহাড়টা। চড়াই পথ। ভীষণ খাড়া। তবু তার মধ্যে সুবিধে এই, আবরণ ছিল পাহাড়টার গ্রানাইট পাথরের। তাই আরোহণের উপযোগী।

দানামগিয়ালের নেতৃত্বে তাঁরা দড়ির গাঁটছড়া বেঁধে একটু একটু করে ওপরের দিকে উঠতে থাকেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা একভাবে ওঠার পর এক সময়ে তাঁরা চরম লক্ষ্যে পৌঁছেন। ১৯৫৬ সনে সুইস্ অভিযাত্রীদলও নাকি নতুন জলবায়ুসহ্যের অভ্যাসকালে ওখানে উঠেছিল আর তার নিদর্শনরূপে তারা ওখানে রেখে গেছে একটা ক্রেন। সুইস্ ক্রেনের ওপর—লীডার বললেন—তাঁরাও কতকগুলো পাথর সাজিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে নেমে আসেন।

সেই সময়ে তাঁদের নজরে পড়ে একটা প্রেয়ার-ফ্লাগের সন্নিহিত একটা সুন্দর কুটির। দানামগিয়ালের পূর্বপরিচিত কুটিরটা। সেখানে আছেন একজন অতিবৃদ্ধ লামা। তিনি তাঁদের দেখবামাত্র অভ্যর্থনা করে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান। ঘরটা ছোট। অন্ধকার। নানা আসবাবপত্রে বোঝাই।

কথা-প্রসঙ্গে লামা তাঁদের জানান, প্যাংবুচে মঠের বর্তমান লামার অব্যবহিত পূর্বে তিনিই সেখানকার সর্বময় ছিলেন। এক-আধ বছর নয়—দীর্ঘ তিরিশ বছর।

যা হোক, কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর তাঁরা তাঁর বেশ কতকগুলো ছবি তুলে বিদায় নেন সেখান থেকে।

গতকালের (২রা এপ্রিল) কথা-প্রসঙ্গে ব্রিগেডিয়ার বললেন—আবহাওয়া গতকাল মোটেই ভাল ছিল না। তবু তাঁরা সিদ্ধান্তানুযায়ী আমাদাবলাম্ অভিমুখেই রওনা হন। ইমজেখোলার উত্তর ধার দিয়ে, গ্লেসিয়ার 'মোরেন'-এর ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন তাঁরা। সন্ত-পড়া নরম বরফের তলায় কোথায় আছে চোরা ফাটল, কোথায় আছে শিলাখণ্ডের খাঁজ, কিছুই তাঁদের জানা ছিল না। তবু তাঁরা

এগিয়ে যেতে থাকেন সম্পূর্ণ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। দানামগিয়াল, কুমার, মিশ্র, ভোরা ও তিনি একই দড়ির গাঁটছড়ায় বাঁধা। ১৭,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে তাঁরা এক ভয়ঙ্কর ঝড়ের সম্মুখীন হন। হাড়-কাঁপানো তার প্রবাহ। যা হোক, সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা একটা বিরাট শিলাস্তূপের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে সে যাত্রায় রক্ষা পান।

১৯৫৯ সনে ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল আমাদাবলাম্ অভিযানে ওখানে বেস-ক্যাম্প করেছিলেন। আর ওই অভিযানেই তুজন অভিযাত্রী অনেকদূর পর্যন্ত উঠে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।

লীডার আরও জানালেন, ওখান থেকে তাঁরা দূরবীণের সাহায্যে প্রায় তু হাজার ফুট উঁচুতে একটা শক্ত দড়ির লাইন দেখতে পান। কুমার ওই দড়ির লাইন পর্যন্ত যাবার জন্মে ছট্‌ফট্ করতে থাকে। কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দেননি আবহাওয়ার প্রতিকূলতা দেখে।

ব্রিগেডিয়ারের গল্প শেষ হতে চাও আর গোপালের মুখে হাসি ফুটল। খাওয়াদাওয়া আর গল্প-গুজবে সারা তুপুরটাই প্রায় মাটি হয়ে গেছে। কিছু বিশ্বাস নেই আবার হয়তো কোন কারণে লীডার ফাঁসিয়ে দেবেন ব্রীজ খেলার বাকী সময়টুকু। তাড়াতাড়ি তাই তাঁর অনুমতি নিয়ে আমরা মেস্-টেন্টে গিয়ে ঢুকলুম তাসের পিণ্ডি চটকাতে।

৪ঠা এপ্রিল ॥ সোমবার

তিন নম্বর দলের রক্তপরীক্ষাটা আর-একবার হওয়া দরকার। তা হলেই নিশ্চিন্তি। নতুন জলবায়ু সহের অভ্যাসকালীন পরীক্ষা তা হলেই শেষ। কিন্তু তা কি হবার? সোনাম, গাম্বু এবার শুনলে তো লাফিয়ে উঠবে। হয়তো বা পালিয়েই যাবে অভিযান ফেলে। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে বইকি একবার।

ব্রেকফাস্ট সারতে সারতে নানা কথার মাঝখানে লীডারকে উদ্দেশ করে ওদের মধ্যে একবার টোপ ফেলে দেখবার চেষ্টা করলুম—

আমাদের শরীরের ওজনের এগারো ভাগের এক ভাগ অংশ হচ্ছে রক্ত। সুতরাং একটুখানি রক্তপাতে সাধারণ মানুষ যেভাবে আঁতকে ওঠে তাতে মনে হয়, কী না কী যেন হয়ে গেল! আসলে কিন্তু এক পাঁইট রক্তপাতও মারাত্মক ক্ষতির কারণ নয়। এই ধরা যাক না কেন—

গাম্বু এদিকে বলতে আরম্ভ করেছে সোনামকে, শুনতে পাচ্ছি—'ফলাও করে বক্তৃতার সারমর্ম বুঝতে পারছ?'

—তা আর পারছি না! রক্ত নেওয়ার উদ্‌কল্। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সোনাম বলল।

—হাঃ, হাঃ। বুজরুকি করতে এসেছে আমাদের কাছে! ও ফাঁদে আর পা দিচ্ছি না কোনমতে, জেনে রেখো।

—সে আর বলতে! চল না ক্যাবলা সেজে কেটে পড়ি এই ফাঁকে।

—সেই ভাল। চাওকেও ডেকে নাও।

তিনজনে মিলে খুব নিচু গলায় কী যেন পরামর্শ করল। তারপর হঠাৎ আমার কথায় খুব উৎসাহের ভাব দেখাতে লাগল। আমি ওদের এই আকস্মিক মত-পরিবর্তনের অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে আরও দু-একটা কথা বলতে বলতে যেই একটু নজরে ঢিলে দিয়েছি অমনি দেখি তিনজনেই পিছু হটতে আরম্ভ করেছে।

যেতে দিলুম ওদের। এ যাত্রায় হার স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ এখন মরিয়া ওরা। কিছুতেই রক্ত দেবে না। সুতরাং জোরজুলুম এখানে খাটবে না। অন্য উপায় দেখতে হবে।

আজ ওরা এখান থেকে যাবে ডিংবুচে। সেখানে রাত্রি কাটিয়ে কাল আবার রওনা হবে চুংকুঙে। সেখানে প্রায় সতরো-আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে ক্যাম্প করে ওরা নতুন জলবায়ুসহের অভ্যাস শেষবারের মত সমাপ্ত করবে।

ওরা চলে গেল এখান থেকে তৈরী হতে। আমি আর লীডার প্রতীক্ষা করতে লাগলুম ওদের প্রত্যাগমনের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরী হয়ে ওরা ফিরে এল আমাদের কাছে বিদায় নিতে। পিঠে ওদের রুক্স্যাক ব্যাগ। বুকে ট্রানজিস্টর সেট্ (নতুন ওয়াকি-টকি)।

এবার আমি আমার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করলুম ওদের রাজী করাতে—রক্ত দিতে। বললুম ওদের শুনিয়ে লীডারকে, 'এভারেস্টশীর্ষ অভিযানে গাম্বু আর সোনামকে নিশ্চয়ই আপনি নির্বাচন করছেন না। কারণ তার উচিত-করণীয় ওরা কিছুই করছে না। মেডিক্যাল রিপোর্টের ওপর যদি আপনার একাংশও শীর্ষ-অভিযাত্রী-নির্বাচন নির্ভর করে তাহলে বলব, ওদের বিষয়ে আমি কোন রিপোর্ট দিতে নারাজ।'

গাম্বু আর সোনামের মুখ নিমেষে কালো হয়ে গেল। হক্‌চকিয়ে ওরা চেয়ে রইল কিছুক্ষণ আমার দিকে। তারপর উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এসে আমায় বলল, 'নাও ডাক্তার, কত রক্ত নিতে চাও, নাও।'

হাত বাড়িয়েই ছিলুম। সুতরাং দেরি হল না প্রয়োজনমত রক্তের নমুনা নিতে।

বিক্রম আজ যাবে না ওদের সঙ্গে। ও আজ এখানে থেকে সারবে টেপ-রেকর্ডগুলো—যেগুলো ওর মনের মত হয়নি। কাল আবার ও যাত্রা করবে আমাদের সঙ্গে ফ্যাক্সংকার্পো। সেখান থেকে ও চলে যাবে চুংকুং হয়ে তৃতীয় দলে।

আনন্দের বিষয়, এদের সকলেরই শরীর বেশ তাজা আছে। ওজন কারোই কমেনি। জীবনীশক্তি একই রকম আছে—বরঞ্চ একটু কমের দিকে বলতে হবে। ভালই খাচ্ছে সব। খাটছেও খুব আর ঘুমুচ্ছেও কুম্ভকর্ণের মত। সুতরাং ভাবনার কিছু নেই। নতুন জলবায়ুসহের অভ্যাসে ধাতস্থ হওয়ার পরিচায়ক এইসব লক্ষণ।

রক্তের টাটকা নমুনাগুলো নিয়ে আমি লেবরেটরিতে এসে বসলুম। হাতে অনেক কাজ। মন দিলুম তাই ওগুলোর পরীক্ষায়।

কতক্ষণ পরীক্ষায় মনোনিবেশ করেছিলুম জানি না, হঠাৎ কার যেন ডাকে সচকিত হয়ে দেখি, রাজু এক মগ চা হাতে দাঁড়িয়ে। বিস্ময়ে আনন্দে আমি নির্বাক হয়ে গেলুম কয়েক মুহূর্ত। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মত ওকে করতে লাগলুম নানা প্রশ্ন—কখন এলে? কেমন আছ? জায়গাটা কী রকম? ঝুরা কোথায়? আর সকলে কেমন আছে? এমন কত কী প্রশ্ন!

রাজুরও যেন আমার মঙ্গলামঙ্গল চিন্তায় উৎকণ্ঠার শেষ নেই। আমার সব কথার জবাব দিয়ে সেও সহস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত করল আমায়। আমার শরীর, আমার খাওয়াদাওয়া, খাটা-খাটুনির বিষয়ে ওর কী অবিমিশ্র কৌতূহল! কী আন্তরিকতাপূর্ণ অভিযোগ! কবে আমি ভাল ছিলুম না, কখন আমি অনিয়ম করেছি খাওয়ায়, লেবরেটরিতে কাজের হার এখন কী মাত্রায় চলছে—সবই ওর খোঁজ নেওয়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আর তারই কৈফিয়ত ও এখন আদায় করছে আমার কাছ থেকে অভিভাবকের মত। আশ্চর্য এই স্নেহের শাসন! উপেক্ষা করা একে আমার সাধ্যাতীত।

বেশ কিছুক্ষণ কৈফিয়ত আদায় ও আমার ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনার পর ফিরে গেল ও নিজের কথায়। বলতে লাগল—সেদিন ওরা যাত্রার কিছুকাল পর থেকেই ক্রমান্বয়ে হেঁটেছে বরফের ওপর দিয়ে। কড়া রোদ্দুর তখন আর তারই আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল ওই বরফের ওপর ভীষণভাবে। চোখ আপনা হতেই বুজে আসছিল। দারুণ জ্বালাও করতে থাকে সকলের। ওর রুকস্যাকে পাতলা লাল কাগজ ছিল, তাই দিয়ে ও তখনকার মত চশমা বানিয়ে নেয়, আর কিছু বানিয়েও দেয় অন্যান্য সহযাত্রীদের। আশ্চর্য ফল পেয়েছে ওরা সেদিন ওই সামান্য কাগজে।

ঝুরার বুদ্ধিরও সে তারিফ করল এই ব্যাপারে। সে নাকি ওর চুলের গুচ্ছ দিয়ে চোখ ঢেকে দিয়েছিল আর শিখিয়েও দিয়েছিল কৌশলটা আর সব শেরপানীদের।

কিন্তু ওই একবারই ও প্রশংসা করল ঝুরার। তারপরেই তীব্র শ্লেষোক্তি করতে লাগল ওর চরম নির্বুদ্ধিতার। গলাটা খাটো করে ও বলতে লাগল—সেদিন ও না থাকলে আজ ঝুরার এখানে শোকসভা করতে হত। তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। গোরকশেপে ওরা পৌঁছেছে। কন্‌কনে ঝড়ও তখন বইতে শুরু করেছে তীব্র বেগে। পোর্টাররা সব যে যার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে বাক্স-প্যাঁটরার পাশে, বড় বড় পাথরের আড়ালে, ছোটখাটো গুহার অভ্যন্তরে। মেয়েরাও যে কেউ কেউ নেয়নি এমন নয়। কিন্তু ওই বেকুবটা আর লামু খালি নিরুপায়ের মত ছুটাছুটিই করে মরেছে সারা জায়গাটায়। কোন কিনারা করতে পারেনি আত্মরক্ষার। এমন সময় ওরা ওর নজরে পড়ে। দয়াপরবশ হয়েই ও তখন ওদের রক্ষার কাজে লেগে যায়। তুষার-কাটা কুড়ুলটা (আইস-অ্যাক্স) দিয়ে মস্ত একটা বরফের চাঁই কেটে কেটে ওদের একটা ছোট্ট বরফের ঘর বানিয়ে দেয়। আর তারই মধ্যে পুরে দেয় ওদের তুজনকে। এইভাবে ও বাঁচিয়ে দেয় ওদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

এভারেস্ট অভিযানের প্রাথমিক শিক্ষাপর্বে এই পদ্ধতিটা আমাদের অভ্যাস করতে হয়েছিল রীতিমত রেথং গ্লেসিয়ারে। রাজু তখন আমাদের সঙ্গে ছিল। প্রয়োজনে যে ও সে-শিক্ষাটা কাজে লাগিয়েছে তা জেনে আমি খুশীই হলুম।

রাজু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন দমক মেরে ও থেমে গেল। চেয়ে দেখি ঝুরা আসছে।

পরণে ওর কালো ডোরা-কাটা বকু আর সাদা হংজু (ব্লাউজ মত)। কোমরে লাল রঙের পটুকাটা (কোমরবন্ধ)। সব জড়িয়ে ওকে মানিয়েছে সুন্দর।

কাছে এসে ও আমায় অভিবাদন করল। তারপর এক এক করে আমার কুশল নিতে লাগল। একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। আর তারই ফলে হাত লেগে আমার কাচের ছোট

সিলিণ্ডারটা পড়ে চুরমার হয়ে গেল। রাজু অন্য দিকে চেয়ে ছিল। আওয়াজটা শুনেই ও অসঙ্কোচে ঝুরাকে আক্রমণ করল—

—ভাঙলে তো ওটা ?

—তোমার মত তো আর আমি অলক্ষুণে নই।...

লেবরেটরির কাজ সেরে বেরিয়ে দেখি, সোহন আর নন্দ দড়ি নিয়ে গেরো তৈরি ও তার ব্যবহার অভ্যাস করছে (Knot Practice)। হিমালয়-পর্বতারোহণ-প্রতিষ্ঠানে বেসিক্ কোর্সের সময় এই ধরনের অভ্যাস অনেকভাবে আমাদের করতে হয়েছে। তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এখন।

দড়ি পরীক্ষাও করল ওরা এই ফাঁকে। একটা মস্ত বড় পাথরে দড়িটার এক প্রান্ত ভাল করে জড়িয়ে আর-এক প্রান্ত সাত-আটজন বাগিয়ে ধরে মারল হেঁচকা টান। এই এক টানেই দড়িটার তিন-চার হাজার পাউণ্ডের ভারবহনের শক্তি (Breaking stress) পরীক্ষা হয়ে গেল।

তারপর ওরা অভ্যাস করতে লাগল দড়ির প্রান্ত ও মধ্যভাগে অবস্থানকারীদের গেরো ব্যবহারের কৌশল (End man ও Middle man knot), অর্থাৎ যে দু'জন 'V' চিহ্নের প্রান্তে থাকবে তারা কোমরে কী ধরনের গেরো ব্যবহার করবে, আর যারা মধ্যে থাকবে তারাই বা কী ধরনের গেরো ব্যবহার করবে।

ওটা শেষ করেই ওরা ধরল জোড়া গেরো (Double knot) ব্যবহারের অভ্যাস। গ্লেসিয়ারে প্রথমোক্ত ধরনের গেরো (End man অথবা Middle man knot) ব্যবহার করা হয় না—করা হয় দ্বিতীয় ধরনের জোড়া গেরো (Double knot) ব্যবহার। এর একটা বেড় থাকে কোমরে, আর-একটা কোমর থেকে কাঁধে।

আরোহীদের পক্ষে এটা অনেক নিরাপদ। এতে মাথা নিচু করে পড়লেও দড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না।

এ ছাড়া শুনলুম, পাহাড়ে ওঠার বিবিধ পদ্ধতি সম্বন্ধে এদের মধ্যে

ইতিমধ্যেই বিরাট আলোচনা হয়ে গেছে। কী ধরনের কত উঁচু গ্লেসিয়ারে কেমন করে 'পিটন' পুঁতে লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে প্রতিকূল অবস্থাকে প্রতিরোধ করে নেমে আসবে—কোথায় ছোট দড়ি খাটাবে—কোথায় সাধারণ ভাবে স্কন্ধ অথবা পার্শ্ব-প্রতিরোধ করবে—কোথায় হাত পা অথবা পার্শ্বভাগ সংস্থাপন করবে—কতখানি চাপ-প্রয়োগ সে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এইসব নিয়ে আর কী!

ব্রিগেডিয়ারের একটা বিশেষ ক্ষমতা আমি বরাবর লক্ষ্য করছি; তা হচ্ছে, প্রত্যেক সভ্যকে পর্বতারোহণের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তোলা। সত্যিই অদ্ভুত, অপূর্ব। কখন কা'কে তার অজ্ঞান্তে কী ভাবে কোন্ বিষয়ে তিনি পারদর্শী করে তুলছেন তা সব সময় ঠিক বুঝে ওঠাই যায় না। ওই উপায়ে, আজ আমরা উপলব্ধি করছি, তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—ম্যাপ পড়ার, অক্সিজেন ও ট্রানজিস্টর সেট্ ব্যবহারের, বুটেন গ্যাস জ্বালানোর। ওই একই উপায়ে দেখছি আজ তিনি পরখ করে নিচ্ছেন নন্দ আর সোহনের দড়ির ব্যবহার-নিপুণতা।

পর্বতারোহণে দড়ির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাই দড়ির খুঁটিনাটি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্যেক পর্বতারোহীকে অভিজ্ঞ হতেই হবে দীর্ঘ অনুশীলনে। যেমন হতে হয়েছে ও হচ্ছে আমাদের। দড়ি তাই পর্বতারোহীদের কাছে অতি আদরের—অতি শ্রদ্ধার সামগ্রী।

দুই বা ততোধিক পর্বতারোহী যখন থেকে দড়ির গাঁটছড়ায় আবদ্ধ হল তখন থেকে তারা এই প্রতিজ্ঞাই মনে মনে নিষ্ঠার সঙ্গে লালন করে—'অন্যের তরে জীবনপণ। প্রাণ থাকতে সঙ্গীকে কিছুতেই মরতে দেব না।'

বহু আগে পর্বতারোহীরা ম্যানিলা হ্যাম্প দড়ি ব্যবহার করত। বর্তমানে তারা নাইলন দড়ি ব্যবহার করছে। এই নাইলন দড়ি দেখতে যেমন সুন্দর, ব্যবহারেও তেমন মজবুত। ম্যানিলার মত

জোলো হাওয়ায় ক্ষণস্থায়ী এর পরমায়ু নয়। ভারধারণের ক্ষমতাও এর অনেক—তিন হাজার পাউণ্ডেরও কিছু বেশী।

সোহনদের ছেড়ে ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছি, দেখি লীডার একজায়গায় বসে ওয়্যারলেসে কা'র সঙ্গে যেন সংযোগ করতে চেষ্টা করছেন। ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে জানতে পারলুম, কুমারের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন।

কুমার ও তার দলবল এখন ডিংবুচে আছে। আগামী কাল ওরা আর-একবার আমাদাবলাম অভিমুখে অভিযান চালাবে। তারই তোড়জোড়ে ওরা এখন ব্যস্ত।

লীডার ওদের সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিয়ে সোজা ওদের লোবুজ যেতে বললেন, আর সেই সঙ্গে গ্লেসিয়ারের ওপর যা-কিছু করণীয়ও করতে উপদেশ দিলেন।

ওয়্যারলেস্ রেখে লীডার জানালেন—কেকীর একটা লিখিত বার্তা তিনি পেয়েছেন পোর্টারদের কাছ থেকে। তাতে ওরা জানিয়েছে ওদের শরীর এখন বেশ ভাল যাচ্ছে। ডাক্তারের পরামর্শ ওরা যত্নের সঙ্গে মেনে চলেছে। আর সেইমত ওরা প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে জল খাচ্ছে। ভিটামিন-সি ও মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেটও খাচ্ছে আর গ্লেসিয়ারে গগল্স্ও ব্যবহার করছে সব সময়।

সন্ধ্যেবেলা একটু বেড়িয়ে ক্যাম্পে ফিরছি, এমন সময় লছমীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও দু-তিনজন বান্ধবীর সঙ্গে একটা ঢিবির পাশে বসে খুব বোধ হয় হাস্য-পরিহাস করছিল—তারই রেশ এখনও লেগে রয়েছে ওর মুখে চোখে। ওকে এমন প্রগল্ভভাবে এর আগে আর কখনও আমি দেখিনি। এ ক'দিনের কোন অদৃশ্য শক্তিপ্রভাবে ওরও বোধ হয় কিছু পরিবর্তন এসেছে। ভগবান করুন তাই হোক। ও যেন সহজ স্বাভাবিক হয়ে যায়। দুর্ভেদ্য রহস্যে ও যেন না আর নিজেকে রহস্যময়ী করে রাখে। মনে মনে এমন কত কথা ভাবছি, এমন সময় লছমী এগিয়ে এসে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, 'ডাক্তার সাব্, ভাল?'

—হ্যাঁ। কই, তুমি তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে না?

'এসেছিলুম।'—লজ্জিতভাবে লছমী বলল, 'আপনি তখন ব্যস্ত ছিলেন কাজে।'

—তাই নাকি! ডাকলে না কেন?

—সাহস হয়নি।

—এতে আর সাহসের কী আছে লছমী? যাক্, অতদূর যাতায়াতে তোমাদের কোন কষ্ট হয়নি?

—একটুও না। তবে আপনাদের, বিশেষ করে আপনার, যে খুব হবে তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

কত আন্তরিক ওর কথাগুলো! কী মধুর! বড় ভাল লাগছে আজ ওকে আমার। পূর্ণ দুটো চোখ মেলে এই সন্ধ্যার নিমীলিত আলোয় চেয়ে আছি আমি ওর দিকে। ও আরক্ত মুখে একবার আমার দিকে তাকাল, তারপর মাথাটা নিচু করে আধ-আধ সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কেন আপনারা আসেন এই ভয়ঙ্কর পথে প্রতি পদে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে? আমরা আসি পেটের দায়ে। অভাবে আমরা ঘরছাড়া। কিন্তু আপনাদের তো সে ভয় নেই। তবে কেন জেনেশুনে এ কষ্টস্বীকার?'

—একথা আমিও অনেকবার ভেবেছি লছমী। কিন্তু মনের মতন জবাব কিছু এ-পর্যন্ত পাইনি। অবশ্য আমার কথা স্বতন্ত্র। সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আমার নাড়িটেপার কাজ। বেস্-ক্যাম্পই আমাদের অভিযানের শেষ সীমা। কিন্তু সত্যিকারের অভিযান-পাগল যারা, তাদেরও অভিমতের সারমর্ম এই—এই আসার মধ্যে কোথায় যেন এক অপরিহার্য আকর্ষণ আছে, যাকে কোন-কিছুর বিনিময়ে অস্বীকার করার ক্ষমতা তাদের নেই।

হাসতে হাসতে লছমী বলল, 'পাগলের পাগলামি।'

—সব মহৎ কাজই গোড়ায় পাগলামি বলেই অভিহিত হয়ে আসছে। তবু মানুষের আশ মেটেনি। তবু সে এগিয়ে যেতে চাইছে

'কথামৃতে' পড়া সন্ন্যাসীর নির্দেশে কাঠুরিয়ার মত ছুর্নিবার আকর্ষণে ছুর্লভকে লাভ করতে। সোনার খনির সন্ধান যে পেয়েছে সে তুচ্ছ দারুকাঠে সন্তুষ্ট থাকবে কেন ?

—এটা তার লোভ।

—ভুল। এটা তারজানবার সহজাত প্রবৃত্তি। দেখছো না, অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে সে তাই ছুটে যেতে চাইছে ছুর্বার গতিতে সীমার মাঝে অসীমকে জানতে। রূপের মাঝে অপরূপকে প্রত্যক্ষ করতে। তার এই নিয়ত সাধনায়, কালান্ত গবেষণায় দূরের মানুষ কাছে এসেছে, একে অন্যের সঙ্গে সৌহার্দ্যের গাঁটছড়া বেঁধেছে। তবু তার আশ মেটেনি। তবু সে অতৃপ্ত মনে বার বার ছুটে যেতে চাইছে সীমাহীন কষ্টকে মাথায় নিয়ে সেইসব ছুর্গম অজ্ঞাতের মধ্যে যা আজও মানুষের নাগালের বাইরে এক ছুর্জ্ঞেয় রহস্যে সমাসীন। লাভ-লোকসানের তুচ্ছ হিসেবনিকেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ-সব কাজের বিচার হয় না। সর্বকালে সর্বদেশে একদল জেদী সৃষ্টিছাড়া মানুষ থাকে যারা সমষ্টিস্বীকৃত চিরপরিত্যক্ত সর্বনাশার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধন্য হতে চায় তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। এইটেই তার লাভ। এরই এক অপার্থিব আনন্দানুভূতির মোহে তারা পূর্ণ হয়ে থাকে। হয়তো বা বিচ্ছিন্নও হয়ে পড়ে সমাজ ও সংসার থেকে। কিন্তু সেজন্যে তাদের এতটুকু অনুশোচনা নেই। তারা সীমাহীন উপেক্ষায় অস্বীকার করতে চায় হিসেবী মানুষের বিধি-নিষেধের অন্তরালে যুগসঞ্চিত কাপুরুষতাকে, মিথ্যে প্রহসনে যা আচ্ছন্ন করে রেখেছে মানুষের সবল চেতনাশক্তিকে। তারা জানতে চায়, বুঝতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় সেই অনাবিষ্কৃত রহস্যকে—কেন সে মানুষকে বার বার দূরে ঠেলে দেয় ? কী তার শক্তি ? সে শক্তিসাধনায় কেন মানুষ বার বার ভাঙা মনে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে আসে ? সেখানে ব্যর্থতা আসে কোন্ পথে ? যারা জয়ী হয়ে আসে তাদের তুলনায় তারাই বা ছুর্বল কোথায় ? এমন নানা জিজ্ঞাসা তাদের চলার পথে অনুক্ষণ প্রেরণা

জোগায়। তাই তো তাদের মেরুযাত্রা, তুষারশৈল হিমাদ্রির শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ। তাইতো তারা ডুব দিচ্ছে মহাসাগরের অতল তলে, উড়ে যাচ্ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। তাদের এ-অভিযানের শেষ নেই। কারণ কল্পনাপ্রবণ মানুষের কৌতূহলেরও যে আদি নেই অন্ত নেই।

—'লছমী!' লছমীর বান্ধবীরা বোধ হয় অধৈর্য হয়ে ওকে ডাকল। আর সে-ও মিষ্টি হেসে ওদের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ক্যাম্পে ফিরতে ফিরতে শুধু এই কথাটারই হিসেব বার বার করছিলুম—এত কথা লছমী বুঝল কি?

৫ই এপ্রিল ॥ মঙ্গলবার

প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকতে আমার ভাল লাগে। কিন্তু রাজুর জ্বালায় আজ আর তা হবার নয়। আজ আমাদের এখানকার ক্যাম্প তুলে নিয়ে ফ্যালং-কার্পো অভিমুখে যাত্রা করতে হবে। তাই ও আমাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বার নোটিশ দিয়েছে, অবশ্য নিয়মমত এক মগ চা খাইয়ে। উঠতেই হল।

বাইরে এসে দেখি, চতুর্দিকেই একটা কর্মব্যস্ততা। পোর্টাররা সব মালপত্র গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। কেউ টেণ্ট খুলছে, কেউ টেণ্ট প্যাক করছে, কেউ খোলা রেশন বাক্সজাত করছে, কেউ বা আবার সাজ-সরঞ্জাম গোছাচ্ছে। রাজুও দেখছি লেগে গেছে কয়েকজন পোর্টার নিয়ে আমার লেবরেটরির যা-কিছু সব প্যাকিং করতে। ও থাকলে এই একটা সুবিধে, কোন দিকে আর আমায় কিছু দেখতে হয় না।

রাওয়ের তত্ত্বাবধানে কাজ চলছে। শুধু প্যাকিং করাই নয়, প্রত্যেকটা মালে নতুন করে নম্বর দেওয়াও।

রাওয়ের একটা বিশেষত্ব আমি বরাবর লক্ষ্য করছি তা হচ্ছে, ও যখন যে কাজ করে তা অতি মনোযোগের সঙ্গেই করে। সে যত তুচ্ছই হোক না কেন!

আমি ও লীডার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর মাল বণ্টন করা দেখছি পোর্টারদের মধ্যে। নন্দ ও সোহন ওকে সাহায্য করছে। রাও-ও দেখছি সুশৃঙ্খল শাসনকৌশল আয়ত্ত করেছে। আর এতে আশ্চর্য হবারই বা কী আছে? ব্রিগেডিয়ারের অনুগ্রহে সবই সম্ভব।

পোর্টারদের ও লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে মালের নম্বরের সঙ্গে চাকতির নম্বর মিলিয়ে মাল ও চাকতি দিচ্ছে এক-এক করে। কোথাও পক্ষপাতিত্ব নেই, তাড়াহুড়ো নেই। তাই টুঁ শব্দটিও নেই কারও মুখে।

মাল বণ্টন করা শেষ হলে ব্রেক-ফাস্ট করতে আমরা এক জায়গায় সমবেত হলুম।

আজকের পথ অতি অল্প। মাত্র চার-পাঁচ মাইল। তাই কারোই বিশেষ কোন তাড়া নেই। যখন হোক যাত্রা করলেই চলবে।

যাত্রার আয়োজনও হল এক সময়ে। কিন্তু কেন জানি না, আজ এই অখ্যাত অজ্ঞাত জাঁকজমকহীন প্যাংবুচ গ্রামখানাকে ছেড়ে যেতে মনটা কেমন যেন খাঁ-খাঁ করে উঠছে। আশ্চর্য, ক'দিনই বা আছি এখানে? আর কী বা সম্পর্ক এর সঙ্গে আমার? তবু কেন এমন হয়? এই-ই কি তবে মায়ার বন্ধন? কোন যুক্তিতর্কের অজুহাতে যার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই? দুর্বল করে দেবেই বিচ্ছেদকালে যে-কোন সবল মনকেও ক্ষণিকের জন্যে?

আটটারও কিছু পরে আমরা যাত্রা শুরু করলুম। আবহাওয়া আজ মোটেই ভাল নয়। সূর্য ডুব দিয়েছে সকাল থেকে কালো মেঘের সমুদ্রে। ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে এলোমেলো। যে-কোন মুহূর্তে তুষারপাত শুরু হলেও হতে পারে।

পথটা আজকের সহজ সরল। খাড়াই-উৎরাই তেমন কিছু নেই।

তবে বেশীর ভাগ জায়গাই বরফে ঢাকা। বুঝতে আর বাকী থাকে না বরফ-রাজ্যে শুরু হল এবার থেকে আমাদের নিত্য চলাফেরা।

দশটা নাগাদ আমরা ফেরিচ পৌঁছলুম। কুমার ও তার দলবল বোধ হয় ওখানে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। আমাদের দেখবামাত্র ওরা দৌড়ে এল আমাদের অভ্যর্থনা করতে।

কিছুক্ষণ পরস্পরের কুশল-বিনিময়ের পর এক ফাঁকে কুমার আমায় গোপনে বলল, 'দেখ ডাক্তার, এ ক'দিন কিন্তু আমাদের তেমন জুতসই খাওয়াদাওয়া হয়নি। তাই তোমাদের অ্যাডভান্স কিচেন পার্টিকে আটকে দিয়েছি এখানে—শুধু ওদের সঙ্গে প্রচুর মুরগী আছে জেনে।' একটু থেমে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'আজ তো ভরপুর আরাম করে খাওয়া যাক। তারপর কাল থেকে আবার নতুন উদ্যমে লড়া যাবে, কী বল? আর তোমার কথাই তো হচ্ছে—শক্তিকে সঞ্চয় করতে না পারলে শক্তিকে কার্যকরীও করা যায় না—'

—বিলক্ষণ।

—তা হলে আজকের লোবুজ যাওয়াটা বাতিল করিয়ে দাও লীডারকে বলে। তোমার আবেদন উনি মঞ্জুর না করে পারেন না। এছাড়া আরও একটা কথা—ফ্যালংকার্পোয় তুমি এত সুন্দর ক্যাম্প-সাইট পাবে না। আর এখান থেকে ফ্যালংকার্পো এমন কিছু দূরও নয়। মাত্র কয়েক ফার্লং। সুতরাং প্রয়োজনে, যে কোন সময়ে আমাদের এ-পথটা মেক-আপ করে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

বলতেই হল লীডারকে শুধু কুমারেরই মুখ চেয়ে, 'ক'দিন ধরে ২নং দলের ভয়ানক পরিশ্রম গেছে নতুন জলবায়ুসহ্যের শিক্ষা সমাপ্ত করতে। তাই আমার মতে আজ ওদের বিশ্রাম দেওয়া নিতান্ত দরকার।'

বাস্, ওতেই কাজ হল। লীডার ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে হাসতে হাসতে সম্মতি দিলেন।

এখানেও দেখছি পাথর দিয়ে ঘেরা কতকগুলো কুটিরের মত রয়েছে।

শুনলুম, গ্রীষ্মকালে এখানেও নাকি ইয়ক-পালকেরা ইয়ক চরাতে আসে—তাই ইয়ক-পালকদেরই সম্পত্তি এই কুটিরগুলো।

এখানে আর উদ্ভিদ নজরে পড়ে না। ছোট ছোট জুনিপারের ঝোপ-ঝাড় থাকলেও থাকতে পারে, তবে তা এখন বরফে ঢাকা।

এখান থেকে ওই বরফে ঢাকা তাওয়াচে শিখরটাকে কী ভয়ঙ্করই না দেখাচ্ছে! মনে হচ্ছে একটু গেলেই বুঝি ওকে ছোঁয়া যাবে। কিন্তু এদিক থেকে তা নাকি মোটেই সম্ভব নয়। কঠিন তুষারস্তর ও অ্যাভালাঞ্চের উপদ্রব নাকি এখানে প্রতি পদে।

কিন্তু অ্যাভালাঞ্চের উপদ্রব কোথায় যে নয় এটাও একটা ভাববার কথা। তুষারহীন পার্বত্য অঞ্চলেও দেখেছি এর আকস্মিক আবির্ভাব। গাড়োয়ালের ঘটনাটা তো এরই জ্বলন্ত প্রমাণ।

গ্রামটার নাম আজ আর মনে নেই। তবে পার্বত্য এক নালার পাশে যে গ্রামখানার অবস্থান তা বেশ মনে আছে। উচ্চতা প্রায় দশ হাজার ফুট। ক্যাম্প করেছি আমরা সেই গ্রামেই একটা জায়গা পছন্দ করে।

রাত্রি থেকে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয় আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাসও বইতে থাকে একভাবে। ক্যাম্পের ভেতরে থেকেও দুর্ভোগের আমাদের কিছু লাঘব হয়নি। জেগে-জেগেই কাটাতে হয়েছে সারাটা রাত্রি।

সকালেও আবহাওয়ার ওই একই অবস্থা। একঘেয়ে বসে থাকা ক্যাম্পে এক সময় অসহ্য হয়ে উঠল। বেরিয়ে পড়লুম তাই আমরা ক্যাম্প ছেড়ে। ঠিক এই সময় আমাদেরই একজনের প্রস্তাবে ও লীডারের সমর্থনে আমরা দূরে একটা পোড়ো বাড়িতে ক্যাম্পটাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে ভীষণ উৎসাহী হয়ে উঠলুম।

অল্পক্ষণের মধ্যে ক্যাম্পের অধিকাংশ জিনিসপত্র অপসারণ করাও হয়ে গেল। তারপর লেগে গেলুম আমরা নতুন ক্যাম্প খাড়া করতে।

তখন বেলা দশটা। হঠাৎ ভীষণ একটা আওয়াজে আমরা চমকে উঠলুম। একটানা আওয়াজ আর সেই সঙ্গে প্রবল বাতাস। যেন সহস্র সহস্র বজ্র একসঙ্গে হুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে আসছে ধরণীকে গ্রাস করতে। অথবা শত শত আগ্নেয়গিরির মুখ একসঙ্গে অবারিত হয়েছে কোন এক বিকট ধ্বংস-রূপী দানবের জাদুমন্ত্রে। গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ প্রলয়ঙ্কর তার আস্ফালন যেন পৃথিবীর অন্তস্তলকে দলিত-মথিত করে এক বীভৎস বিভীষিকার সৃষ্টি করছে। এ আওয়াজের সঙ্গে পৃথিবীর কোন-কিছুরই তুলনা হয় না। আর এমন অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর আগে আমাদের পরিচয়ও ছিল না কখনও। নরকের দ্বারে দাঁড়িয়ে এ যেন নির্মমতম পীড়নে কোটি কোটি লোকের একত্র আর্তনাদ শোনা। ভাবছি, আমরা হয়তো এখুনি এরই একটা কিছু চরম পরিণতিতে বিলীন হয়ে যাব। চিহ্নটুকু পর্যন্ত আর থাকবে না আমাদের।

বলির পাঁঠার মত দাঁড়িয়ে রইলুম আমরা কম্পিত পদে নিয়তি-নির্দিষ্ট ফলাফলের প্রতীক্ষায়। চোখ মেলে যতদূর দৃষ্টি যায় ভাল করে একবার দেখে নিতে চাইলুম সব শেষবারের মত। হঠাৎ দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে গেল। জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে আমরা দেখতে লাগলুম সামনের সেই গড়ানটা বেয়ে স্ফটিকশুভ্র একটা পাহাড় যেন নেমে আসছে অপ্রতিহত গতিতে। খান্ খান্ করে দিচ্ছে সামনের যা-কিছু। সমাহিতের মত আমরা বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছি সেই ধ্বংসযজ্ঞের পানে। হঠাৎ এই সময়, আমাদের মধ্যে কে যেন কাতরকণ্ঠে ভয়ার্ত ব্যাকুল চিৎকার করে বলে উঠল—'অ্যাভালাঞ্চ।'

পরিত্যক্ত ক্যাম্পটার ওপর দিয়ে চলে গেল ওটা। আর সেই সঙ্গে দশ-বারো ফুট বরফে ঢেকে গেল ওর অতিক্রান্ত পথটা। আর তুষারপাতও শুরু হল ওই একই সঙ্গে সর্বত্র। এতবড় অ্যাভালাঞ্চ এই ধরনের জায়গায় যে আসতে পারে এ আমরা কল্পনাও করিনি। কারণ আশেপাশে এর কোথাও বরফের চিহ্নমাত্রও ছিল না।

দু-এক মিনিট পরেই স্থানীয় লোকেরা ছুটে এসে সীমাহীন

বিস্ময়ে আমাদের জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা এখনও বেঁচে আছেন?'

থাক্ সে কথা।

চা বিতরণ শুরু হয়ে গেছে। বিতরণ করছে শেরপা সাথীরা। এক জায়গায় একত্রে বসে আমরা চা খেতে লেগে গেলুম আর সেই সঙ্গে নানা গল্পগুজবে মুখর হয়ে উঠলুম। কুমার এরই এক অবসরে অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে অদূরবর্তী একটি পাহাড়কে দেখিয়ে বলল যে, ওটার নাম ইয়োলো নিড্‌ল্। কারণ ওর রঙটা অনেকটা হলদে আর চূড়াটাও ছুঁচের মত। অজেয় ওর শীর্ষ। ১৯৫৬ সনে এভারেস্টজয়ী এগ্‌লারের দলও ওটা জয় করতে সক্ষম হননি। কিন্তু কাল ওটা মানুষের পদানত হয়েছে। আর তা করেছে ওরাই।

আনন্দে গর্বে কুমারের মুখ-চোখ ঝল্‌মল্ করছে। আর তা করবারই কথা। কেননা মানুষ যখন সর্বপ্রথম কোন গিরিশীর্ষে তার পদচিহ্ন এঁকে দেয়, সে যত ছোট শীর্ষই হোক না কেন, তখন তার সারা মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি দেখা দেয়, যার ব্যাখ্যা ভাষায় প্রকাশ হয় না। সেই অনুভূতিতে সে ছটফট করতে থাকে সময় সময়। আর তাই-ই হয়েছে আজ কুমারের।

ওর সাফল্যে আমরাও কম আনন্দিত হলুম না। জড়িয়ে ধরে ওকে কতবার আমরা শ্লোগান দিলুম ওর নামে। তারপর ওকে অভ্যর্থনা জানাতে বিরাট একটা ভোজেরও আয়োজন করলুম দুপুরবেলা।

অ্যাংশ্রীং ও দানু দুজনেই লেগে গেল প্রাণপণ চেষ্টা করে নানারকম ভাল ভাল জিনিস রাঁধতে। আমরাও কেউ কেউ মাঝে মাঝে গিয়ে ওদের সাহায্য করতে লাগলুম। এই সময় হঠাৎ রাজু একরকম ছুটে এসে আমায় বলল, 'মজা দেখতে চান তো টপ্ করে আসুন।'

অগত্যা ওর পিছু নিতে হল। সত্যিই মজা বটে। না ডাকলে বোধ হয় দৃশ্যটা মাঠেই মারা যেত।

লামু আর বাহাদুরকে নিয়ে দৃশ্যটা। লামু সেদিন বাহাদুরের কাছে কিছু খেতে চেয়েছিল, মানে—প্রকারান্তরে ওকে প্রশ্রয় দিয়েছিল।

ওর সেদিন সে হুঁশ ছিল না। আজ তাই ও বেকায়দায় পড়েছে। বাহাদুর ওকে উন্মুক্ত দিবালোকে দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে কিছু খাওয়াতে। খাওয়াবেই ও। একটা বড় ঠোঙায় খাবার পড়ে রয়েছে ওর পাশেই। শেরপা-শেরপানীরা সব বাহাদুরের পক্ষ নিয়েছে। 'খাওয়াও বাহাদুর, খাওয়াও' বলে উচ্চৈঃস্বরে ওরা হল্লা করছে। বাহাদুরের সাহস তাতে বেড়ে গেছে আরও। লামুর মুখটাকে ও কোন রকমে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে নিজের দিকে। শেষে লামু নাজেহাল হয়ে রাজী হয়েছে খেতে।

লামু ওর কবলমুক্ত হয়ে বলল, 'খেতে তো চেয়েছিলুম সেদিন। আজ কিসের জন্যে আনতে গেলে?'

—সেদিন খাওয়াতে পারিনি বলেই তো আজ এনেছি। মুখ ফুটে বললে তুমি, আর আমি যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা না দিতে পারি তাহলে মনটা কেমন হয় বল তো?

'আহা-হা, হয় না আবার? কী দুঃখই তুই দিচ্ছিস্ লামু অমন তোর দরদীকে!' পাশ থেকে ফোঁড়ন কাটল লছমী। আর সেই সঙ্গে হাসির প্রলয়ঙ্কর ধ্বনি।

'কেন খাওয়াতে পারলে না সেদিন? পয়সা ছিল না বুঝি?' রুষ্ট হয়ে লামু জিজ্ঞেস করল।

—আরে, না, না। ডাক্তার সাবের একটা জরুরী কাজে আটকে গিয়েছিলুম। যত আসতে চাই তত উনি বলেন—'বাহাদুর, তুমি বিনে কাজটা হতেই পারে না। আর-একটু বরং থেকে যাও—চলে গেলে এত পরিশ্রমের কাজটা মাঠে মারা যাবে।' ফলে দুপুররাত্রি পর্যন্ত ওখানেই আটকে গেলুম।

সত্যিই বাহাদুরকে আমি আটকে রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, আটকে রেখে ওকে লামুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেব। ফলে, খরচটাও বেচারীর বেঁচে যাবে, অপদস্থও আর ওকে গায়ে পড়ে হতে হবে না। কিন্তু সে আর হল কই? পিপীলিকার পাখা শুধু মরিবার তরে।

সুযোগ পেয়েছে বাহাদুর—শেষ পর্যন্ত ও তার সদ্ব্যবহার করবার চেষ্টা করবে বইকি! আর করতেও এসেছে তাই।

লামু বলল, 'বেশ, খাচ্ছি। তবে এই নিয়ে কিন্তু নতুন কোন বিপত্তি করতে পাবে না, বলে দিচ্ছি।'

বাহাদুর সন্তুষ্ট হয়ে ঠোঙাটা ওর হাতে তুলে দিল।

ব্যাপারটা যে এত সহজে মিটতে পারে তা একটু আগেও আমি ভাবিনি। গালি-গালাজ, মান-অভিমান, শেষে অশ্রু-বিসর্জনটাই তো ছিল স্বাভাবিক। যাক্, আমাকে গিয়ে আর দাঁড়াতে হল না মধ্যস্থতার জন্যে। বেঁচে গেছি এ-যাত্রায়। এখন কেটে পড়াই সঙ্গত। নইলে এখুনি ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। খাবার বিলি শুরু হয়ে গেছে। এসে গেল বুঝি আমার কাছে।

দুপুরের ভোজন বেশ ভরপুরই হল। কুমার আর সোহনের তো কথাই নেই। সোহন পেটের বাঁধন আলগা করে দিয়ে খাচ্ছিল। বিনাবাক্যব্যয়ে ও প্রথমে ভাজা ভাল রান্নাগুলো গলাধঃকরণ করে বিগলিত চিত্তে বলল, 'আমার কিন্তু চিকেন-রোস্টটাই সব চেয়ে বেশী ভাল লাগে।'

'তাই বুঝি, তাহলে আর দু-চারখানা চাই নিশ্চয়ই?'—পরিহাস-তরল কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করি।

সকলে হেসে ওঠে সোহনের দিকে চেয়ে।

খাওয়ার পর কুমার চিঠি লিখতে বসল। কাল ওর জীবনের বিরাট একটা দিন গেছে। কারণ কালই ও ইয়োলো নিড্‌ল্-এর শীর্ষে আরোহণ করেছে। সংবাদটা ও তাই ওর বান্ধবীকে না জানিয়ে আর স্থির থাকতে পারছে না।

সন্ধ্যেবেলা রাজেন্দ্র বিক্রম অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। ইয়োলো নিড্‌ল্ জয়কে ও চিরস্থায়ী করে রাখতে চায় টেপ-রেকর্ডে। সাজ-সরঞ্জাম ও তাই সাজাল নিজের হাতে। তারপর কুমারকে দিয়ে বলালো ইয়োলো নিড্‌ল্ জয়ের ধারা-বিবরণী। কুমারের বলা

শেষ হলে লীডারকে দিয়েও একটা বক্তৃতা দেওয়ালো নতুন জলবায়ু-সহের অভ্যাস সম্বন্ধে। বক্তৃতায় লীডার ইয়োলো নিড্‌ল্‌কে অজেয় শীর্ষ বলেই ঘোষণা করলেন।

প্রায় ২০,০০০ ফুট উঁচু এই ইয়োলো নিড্‌ল্‌কে নিয়ে যখন আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সীমা-পরিসীমা নেই, ঠিক সেই সময় রাও এগ্‌লারের একটা বই হাতে আসরে এসে ঢুকল। সকলের মুখের দিকে চেয়ে ভাবগম্ভীর স্বরে বলল, 'থামো।' তারপর আস্তে আস্তে বইটার ৭১ পৃষ্ঠা খুলে বলল, 'যারা দেখনি তারা দেখে যাও। ১৯৫৬ সনে স্বয়ং এগ্‌লার, রেইস ও পাসাং ফারতার ওর চূড়ায় উঠেছিল।'

কুমার, দানামগিয়াল, ভোরা ও মিশ্রের মুখ মুহূর্তে কালো হয়ে গেল।

বিক্রম অপ্রতিভের মত হাসতে হাসতে বলল, 'এলেই যদি, আর-একটু আগে এলে না কেন মানিক? তা হলে আমার তো আর এ দুর্ভোগটা হত না! এখন কী করি!' একটু থেমে ফের বলল, 'দেখি, লীডারের রেকর্ডটা অন্তত সংশোধন করা যায় কিনা?'

শুয়ে শুয়ে, আজ কেন জানি না, এগ্‌লারের কথাই বার বার মনে হতে লাগল। বার বার মনে হতে লাগল তাঁর এভারেস্ট-জয়ের অবিস্মরণীয় কাহিনী। কী রোমাঞ্চকর, কী দুঃসাহসিকতায় ভরা সে কাহিনী! ভাবলেও অবাক লাগে।

এভারেস্ট-জয় বলতে আমরা ১৯৫৩ সনে জন হাণ্টের নেতৃত্বে তেনজিং ও হিলারীর এভারেস্ট-জয়কেই মনে করে থাকি। তাই ১৯৫৬ সনে এগ্‌লারের নেতৃত্বে সুইস্ অভিযাত্রীদের এভারেস্ট-জয়কে আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না।

কিন্তু এই এগ্‌লারের দল এভারেস্ট অভিযানে একসঙ্গে এত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন যার তুলনা মেলা ভার। প্রথমে তাঁরা দুর্ধর্ষ লোৎসের শীর্ষে আরোহণ করেন (১৮ই মে) যা সেদিনও মানুষের অজেয় ছিল। এই সাফল্যের কর্ণধার যাঁরা—তাঁরা লুচসিংগার ও রেইস।

তারপর তাঁরা এভারেস্ট-জয়ে উদ্যোগী হন এবং সেক্ষেত্রেও অভাবনীয়

সাফল্য লাভ করেন। তু-তুটো দল এগ্‌লার এভারেস্ট শীর্ষাভিযানে পাঠিয়েছিলেন। প্রথম দলে ছিলেন—স্মিড ও মারমেট। ২৩শে মে বেলা তুটোয় তাঁরা শীর্ষে আরোহণ করেন। আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল,. তাই এক ঘণ্টা তাঁরা সেখানে অবস্থান করেন। তার মধ্যে কুড়ি মিনিট তাঁরা অক্সিজেন ব্যবহার করেননি।

দ্বিতীয় দলে ছিলেন—রেইস ও ভন্ গাণ্টেন। ২৪শে মে বেলা এগারোটায় তাঁরাও শীর্ষে আরোহণ করেন। সেদিনও আবহাওয়া অনুকূলে ছিল। তাই সেদিনও তাঁরা তু ঘণ্টা তথায় অতিবাহিত করেন।

সেখানে থাকাকালীন তুটো দলই প্রচুর ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ করেন। সেগুলো এককথায় অপূর্ব, বিশ্বের বিস্ময় বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর রঙিন ছবিগুলোর তো কথাই নেই। যত দেখি ততই অবাক লাগে।

এগ্‌লারের কথা ভাবতে ভাবতে কখন নিজেদের কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। মনে মনে পরিকল্পনা করছি—ব্রিটিশরা পাঠিয়েছে একটা দল। সুইস্‌রা পাঠিয়েছে তুটো দল। তা হলে আমরা পাঠাব তিনটে দল। অসম্ভব কিছু নয়, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে জয়ী আমরাও হব নিশ্চয়ই! কারণ আমাদেরও অভিযাত্রীরা কম দক্ষ নয়। কুমার, দানামগিয়াল, সোনাম, গাম্বুর বীরত্বের কথা আজ আর অবিদিত নেই কারও কাছে। তাই আমাদেরও পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দুতে আরোহণ আকাশ-কুসুম কল্পনা নয় কোনমতে।

৬ই এপ্রিল ॥ বুধবার

ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে। চুপচাপ পড়ে আছি বিছানায়। এখনও বোধ হয় দিনের আলো ফোটেনি। এখনও বোধ হয় অন্ধকার চারিদিক। সাতটায় যাত্রারম্ভ। সকাল সকাল যা কিছু সব করণীয় মিটিয়ে নিতে হবে। কিন্তু···? তবে কি মাঝরাতে

আমার ঘুম ভেঙেছে? উঠেওছি তো অনেকক্ষণ। কৌতূহলী হয়ে বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে ভাল করে একবার দেখলুম—আর সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে পড়লুম। আশ্চর্য, এ যে একেবারে সাতটা!

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, দিনটা মোটেই স্থবিধের নয়। দুর্যোগপূর্ণ। তুষার পড়ছে চারিদিকে অবিরল। ইতিমধ্যে কয়েক ইঞ্চি পুরু তুষার জমেও উঠেছে।

অগত্যা ফিরে এলুম বিছানায়। কারণ সাড়াশব্দও তেমন পাচ্ছি না কারও। ঠিক এই সময় রাজু বাঁধা নিয়মে চা এনে হাজির করল। ওর মুখেই শুনলুম, আজ 'যাওয়া বাতিল'। কারণ পোর্টাররা লীডারকে জানিয়েছে, এ ক্যাম্পের পর থেকে নাকি আর কোথাও জ্বালানী কাঠ পাওয়া যাবে না। আর পর্যাপ্ত জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা না থাকলে ওরা ওদের নিত্য-প্রয়োজনীয় কোন কাজও করতে পারবে না। তাই ওরা আজকের দিনটা ছুটি চায় আশপাশের গ্রাম থেকে কিছু কিছু জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্যে। লীডার ওদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।

ভালই করেছেন। দয়াবান তিনি। এবার আমি আর-একবার চিৎ হয়ে নিই। চায়ের পরমায়ু আর কতক্ষণ! একটু একটু করে খেয়েও তো শেষ করে ফেললুম।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে ডিস্‌পেন্‌সারিতে আসতে একটু দেরিই হয়ে গেল। তা হোক্। ছুটির দিন। অমন অনেকেরই হয়।

পোর্টারদের অনেককেই আজ তেমন তাজা দেখছি না। খোঁজ নিয়ে জানলুম, কাল রাতে ওদের খুব কষ্ট গেছে। কারণ কালও ওদের মধ্যে যারা মেস্-টেণ্ট অথবা অন্য ছোট টেণ্টে স্থান সঙ্কুলান করতে পারেনি, রাত কাটাতে গিয়েছিল আশপাশের জীর্ণ মলিন কুটির-গুলোতে। কুটিরগুলোর মাথায় ছাউনি পর্যন্ত ছিল না। পড়ে থাকতে হয়েছে তাই ওদের মুখ বুজে খোলা আকাশের নীচে, বরফের

ওপর, তুষারপাতের মধ্যে খালি একটা ছোট্ট কম্বলে কোনরকমে শরীরটাকে ঢেকে।

সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাই সময় সময় পোর্টারদের এই সহনশীলতা দেখে। মানুষ অভ্যাসে যে কী পরিমাণ কষ্টসহিষ্ণু হতে পারে তা ওদের না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন, আর সীমাহীন উৎসাহ নিয়ে লক্ষ্য করেছি ওই সব পোর্টারদের। যতই দেখেছি ওদের, পরিচয় লাভ করেছি যতই ওদের, ততই বিস্মিত হয়েছি। বাস্তবিকই ওদের চরিত্রের কোথাও বৈসাদৃশ্য দেখিনি। কী গাড়োয়ালে, কী কুমায়ুন হিমালয়ে, কী সিকিম-ভূটান নেপালে। সর্বত্রই ওদের ওই এক রূপ—কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু, কর্তব্যপরায়ণ।

মুখ বুজে ওরা কাজ করে। মুখ বুজে ওরা কষ্টও সহ্য করে। এর জন্যে ওদের অভিযোগ নেই কারও প্রতি। পাহাড়ের পথ-ঘাট ওদের নখদর্পণে। কোথায় কখন কী ধরনের বিপদ-আপদ আসতে পারে, তার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে কী ধরনের প্রতিরোধ প্রয়োজন, সবই ওদের জানা। তাই পর্বতাভিযানে সর্বাগ্রে আমরা ওদেরই খোঁজ করি। ওরা না থাকলে অভিযান একটা প্রহসন মাত্র। আজ পর্যন্ত এত অভিযান হয়েছে হিমালয়ের বুকে, তার সব ক'টিরই অগ্রভাগে থেকে এসেছে ওরা। ওরা চলে আগে আগে, আমরা চলি পেছনে পেছনে। ওরা স্থান থেকে স্থানান্তরে আমাদের ক্যাম্প তৈরি করে দেয় আর আমরা পরম নিশ্চিন্তে তারই মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিই। কঠিন গ্লেসিয়ারের ওপর সিঁড়ি একটার পর একটা ওরাই আমাদের কেটে দেয় আর আমরা কোনরকমে তা' অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছতে সচেষ্ট হই। পৃথিবীর মানুষ আমাদের বাহবা দেয় আর নির্লজ্জ স্বার্থপরের মত আমরা সে বাহবা উপভোগ করি। উপেক্ষা আর অনাদরে ওরা পড়ে থাকে যবনিকার অন্তরালে—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

এর জন্যে ওদের কোন ক্ষোভ আছে কি না জানি না, তবে ওরা আসে আগেরই মত প্রতি বার সামান্য অর্থের বিনিময়ে এই ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল পর্বতাভিযানে। মোট নিয়ে, পথ দেখিয়ে, সিঁড়ি কেটে অকপট কর্তব্যবোধে ওরা ঠিকই নিয়ে চলে আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে। তবে একথা ঠিক—

Solid devotions resemble the rivers which run under the earth—they steal from the eyes of the world to seek the eyes of God ; and it often happens that there of whom we speak least on earth are best known in heaven.

ওরা একলা আসে না। সঙ্গে আসে ওদের ছোট্ট একটা সংসার —তাতে থাকে ওদের গৃহস্থালীর যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম। সময় সময় মেয়েরাও ওদের সঙ্গী হয়। আর তখন ওদের কর্মক্ষমতা যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। পথের কোন প্রতিকূলতাই তখন যেন আর ওদের গতিরোধ করতে পারে না।

চলতি পথেই ওদের মেয়ে-পুরুষের হয় পরিচয়-বিনিময়, প্রেম ও বিবাহ। চলতি পথেই ওদের হয় সহবাস ও সন্তান। চলতি পথেই এমনি করে ওদের গড়ে ওঠে এক-একটি নতুন সংসার।

অদ্ভুত লাগে পোর্টারদের এই জীবনযাত্রা। যত দেখি ততই বিস্মিত হই। থাক্ সে কথা। ব্রিগেডিয়ার দু'জন পোর্টারকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বললেন ওদের পরীক্ষা করতে। খুব নাকি অসুস্থ ওরা। দেখলুম, সত্যিই ওরা অসুস্থ। আঙুলগুলো ওদের নীল হয়ে ফুলে উঠেছে আর তারই যন্ত্রণায় ওরা ছট্‌ফট্ করছে।

পরীক্ষা করে বুঝলুম—দুর্ঘটনাটা ওদের ফ্রস্ট-বাইট্ থেকে নয়, ট্রেঞ্চ ফুট থেকে হলেও হতে পারে। কারণ ফ্রস্ট-বিটিন্ হলে 'ক্রিটিক্যাল উত্তাপ, ৫° সি থেকে ৭° সি হওয়া দরকার। গত রাত্রে কিন্তু আবহাওয়ার ততখানি অবনতি হয়নি। তাই মনে হয়, একটানা

ঠাণ্ডা বাতাসের আক্রমণে ট্রেঞ্চ ফুটেই আক্রান্ত হয়েছে ওরা। আর তার প্রতিক্রিয়া তখনি এইরকম মারাত্মক হয় যখন চরম ঠাণ্ডাহত হয়ে প্রতিকারের জন্যে সহসা খুব উঁচু ডিগ্রীর উত্তাপের আশ্রয় নেওয়া হয়। খোঁজ নিয়ে জানলুম ঠিক তাই-ই। অসাড় আঙুলগুলোকে ওরা প্রথমেই আগুনে সেঁকে নিতে গিয়েছিল, আর তারই পরিণাম এই।

ঠিক এই একই রকম ঘটনা কতবার যে ঘটেছে আমার সামনে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। গাড়োয়ালের ঘটনাটা তো ঠিক এই একই ধরনের—

যাচ্ছিলুম আমরা একটা গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে। উচ্চতা হবে তার প্রায় ২০,০০০ ফুট। চমৎকার আবহাওয়া, পরিষ্কার আকাশ। মনের আনন্দে যাচ্ছি।

হঠাৎ আবহাওয়া পালটে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসও বইতে শুরু করল, আর সেই সঙ্গে অল্প অল্প তুষারপাত। মুশকিলে পড়লুম আমরা। গায়ে শীতবস্ত্র তেমন কিছু নেই, মাত্র একটি ফুলহাতা সোয়েটার ছাড়া। হাতে গ্লাব্‌স্‌ও নেই। বাতাসের এক-একটা ধাক্কায় অসংখ্য তুষারকণা এসে আমাদের চোখে মুখে গায়ে জমা হতে লাগল। দু হাতে ঝেড়ে ঝেড়ে কোনরকমে তবু আমরা চলতে থাকি। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, খালি বরফ আর বরফ। যেন বরফের সমুদ্র। ক্রমে তাও আর দেখা যায় না প্রবল তুষারবর্ষণের মধ্যে। অন্ধের মত অনির্দিষ্ট পথে শুধু বাঁচবার তাগিদেই তবু আমরা এগুতে থাকি।

ক্রমে তুষারের আঘাতে আর বাতাসের ঝাপটে আমাদের হাত-পা জমে আসতে থাকে। অসাড় আঙুল জ্বলতে শুরু করে ভীষণভাবে। থামলে চলবে না এ-অবস্থায়। আরও জোরে, আরও কসরৎ করে চলতে হবে তখন শুধু শরীরের উত্তাপ ঠিকমত নিয়ন্ত্রণের জন্যে। একবার উত্তাপ কমতে আরম্ভ করলে এক্ষেত্রে আর পুনরুদ্ধার অসম্ভব। পরামর্শ দিলুম তাই সঙ্গীদের জোরে জোরে হাত-পা ছুঁড়ে চলতে আর

সেই সঙ্গে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পরস্পরের পিঠে পরস্পরকে কিল মারতে।

সেই মতই চলা হতে লাগল। এক-এক সময় মনে হতে লাগল এই ভাবে পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে ঘুষোঘুষি করে বাঁচার সংগ্রামের চেয়ে আত্মহত্যা করে মরা ঢের ভাল।

এই সময় দেখা দিল আর-এক নতুন বিপত্তি। পোর্টাররা সব তুষারাহত হয়ে ধপাধপ পড়তে লাগল বরফের ওপর। কেউ কেউ উঠতে চেষ্টা করে, কেউ কেউ তাও না। এভাবে পড়ে থাকলে ওরা মরবে নিশ্চয় জেনে আমরা যেন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় গেল আমাদের নরকযন্ত্রণা আর কোথায় গেল আত্মহত্যার কল্পনা!

দৌড়ে গেলুম আমরা ওদের কাছে, টেনে টেনে তুলতে লাগলুম ওদের বরফের ওপর থেকে। তারপর আর-আর পোর্টারদের সহযোগিতায় নিয়ে চললুম ওদের আমাদের অনির্দিষ্ট পথে সহযাত্রী করে।

এরও কিছুক্ষণ পরে বুঝি ভগবানের করুণা হল। তুষারপাত বন্ধ হল, আকাশ পরিষ্কার হল, ঝক্‌ঝকে রোদ্দুরও দেখা দিল চারিদিকে।

পোর্টারদের মধ্যে তিনজন মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তার মধ্যে একজনের আবার 'ঊর্ধ্বভাগের মত্ততা' দেখা দিয়েছে। ওদের নিয়ে কোথায় যাব, কী করব ভাবছি, এমন সময় দূরে নজরে পড়ল একটা শিলাখণ্ড। সমুদ্রে প্রবালদ্বীপের মত যেন। দ্রুত পা চালিয়ে গিয়ে উঠলুম আমরা ওই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

পর দিন সকালবেলা ওইসব পোর্টাররা সুস্থ হয়ে আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই ভাল করে আগুনে পা গরম করে নিতে যায়। আর তার ফলে প্রবল ঘাম নিঃসরণ করে পাগুলো গোদের মত ফুলে ওঠে আর তা একটা নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কাছে।

তাই তো ওদের বার বার নিষেধ করি, ও ধরনের বাহাত্বরি না করতে।

যা হোক, আঙুলগুলো ওদের যথারীতি চিকিৎসা করে, ওষুধ খাইয়ে, হাতে দস্তানা পরিয়ে বিদায় দিলুম।

এর পরই লেগে গেলুম আর-একটি রুগীর চিকিৎসা করতে। রক্তবমি করেছে সে। সেই সঙ্গে ভীষণ জ্বর। বুকে সর্দিও জমেছে খুব। পরীক্ষা করে দেখলুম—রোগটা নিউমোনিয়া।

ইতিমধ্যে কুমার একটা 'স্লিপিং ব্যাগ' এনে হাজির করল। বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছে ও। ওর মধ্যে পুরে ওকে শেরপা-মেস্-টেন্টে নিয়ে যেতে বললুম আর সেই সঙ্গে ওর প্রয়োজনীয় শুশ্রূষাও করতে বললুম রাজুকে।

বেলা প্রায় একটা বাজল আর-সব ছোটখাটো রুগীদের দেখতে। আকাশটা বেশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। তুষারপাতও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ডিস্‌পেন্‌সারি ছেড়ে ওঠবার আয়োজন করছি, এমন সময় প্যাংবুচ গ্রাম থেকে কয়েকজন লোক এসে হাজির। ওষুধ চাই ওদের। একজনের নাকি অনেকবার দাস্ত হয়েছে জলের মত। রুগীর বিষয়ে আরও বিশদ জিজ্ঞাসাদি করে ওষুধ দিলুম। এ ছাড়া চোখের অসুখের ওষুধও ওদের কিছু দিতে হল সেই সঙ্গে।

খাওয়াদাওয়ার পর নিউমোনিয়া রুগীটিকে আর-একবার দেখতে গেলুম। নিশ্চিন্ত হলুম ওকে ঘুমতে দেখে। রাজু সেই থেকেই বোধ হয় বসে আছে। ওর মুখেই শুনলুম, লীডার এরই মধ্যে দুবার রুগীকে দেখে গেছেন। একবার নাকি বসেও ছিলেন অনেকক্ষণ।

ফিরে যাচ্ছিলুম নিজের ক্যাম্পে একটু বিশ্রামের জন্যে। কুমার পথরোধ করে দাঁড়াল। আজ নাকি ওর মনটা বিশেষ ভাল নয়, তাই তাস খেলে ওকে চাঙ্গা হতে হবে। মিশ্র, ভোরা তৈরী হয়েই বসে আছে। শুধু আমি গেলেই হয়।

আর দ্বিরুক্তি নয়। এত বড় সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে আসে! খেলার জন্যে খোসামোদ, তাও আবার দুপুরবেলা! হাসতে হাসতে পিছু নিলুম কুমারের।

কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে জানি না, তখনও 'টু ক্লাব' 'থ্রি ডায়মণ্ডে'র কল্ চলছে অপ্রতিহত গতিতে। হঠাৎ কৃপার ডাকে খেয়াল হল ডিনারের সময় উত্তীর্ণপ্রায়।

৭ই এপ্রিল ॥ বৃহস্পতিবার

কাল রাত্রেও বেশ তুষারপাত হয়েছে। সারাটা জায়গা তাই সদ্য-পড়া তুষারে আবৃত। পরিমাণে আট-দশ ইঞ্চির কম হবে না।

আজ আর পোর্টাররা এখানে নেই। চলে গেছে ওরা কাল ডিংবুচ গ্রামে আশ্রয়ের জন্যে। পরশুরাতের অভিজ্ঞতা ওদের বেশ যে কিছুটা শিক্ষা দিয়েছে তা আর বুঝতে বাকী রইল না। ওরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত অভিযান এখন মুলতবী।

ক্যাম্পের বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা ছোট-বড় অগণিত তুষারের মেলা দেখছি। কুমার হঠাৎ এই সময় ছ-সাতটা তুষারের বল তৈরি করে লোফালুফি শুরু করে দিল। মজাটা তার এই—লোফালুফির সময় দু-তিনটে বল সব সময়েই শূন্যে থাকছে। রাও আর স্থির থাকতে পারল না। এগিয়ে গেল ওর দেখাদেখি। কিন্তু ব্যর্থ হল প্রতি বার। সোহন, ভোরা, মিশ্রও চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শেষে ওরা বিরক্ত হয়ে কুমারের শূন্যের বলগুলোকে তাক্ করে খণ্ড খণ্ড তুষার ছুঁড়তে লাগল। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই কুমার বলশূন্য হল।

এরপর শুরু হল ছোঁড়াছুড়ি আর তারও কিছুক্ষণ পর মারামারি। নিমেষে জায়গাটা রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করল। তুষারবৃষ্টি চলতে লাগল মেম্বারদের মধ্যে।

কুমারের একটা দল আর সোহনের একটা। মার খেতে লাগল সোহনের দলটাই বেশী। আমি কুমারের পেছনে। এক সময় হঠাৎ মিশ্র-কুমারকে কায়দা করল। কুমার সুবিধে করতে না পেরে ছুট মারল। ভোরা চিৎকার করে উঠল, 'ল্যাং মার, ল্যাং মার।' কিন্তু কে কা'কে ল্যাং মারে ?

যুদ্ধের গতি কিন্তু তাতে কিছুমাত্র ব্যাহত হল না। চলতে থাকল ঠিকই অপ্রতিহত গতিতে। কুমারও ওই ফাঁকে এসে আবার যোগ দিল। এই সময় হঠাৎ সোহন চিৎকার করে পড়ে গেল—'বাবারে-এ-এ। গেছি-ই-ই।'

কুমার দৌড়ে গিয়ে বলল, 'লেগেছে নাকি ?' আমিও হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় লাগল ?'

—আর জ্বালিও না তুমি।

পালট মেরে পাটাকে মুড়ে ও টিপে ধরল একটা জায়গা। কুমার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সেখানটা চুষে দিতে লাগল। আর সোহনও মড়ার মত পড়ে রইল।

যুদ্ধ থেমে গেল। মেম্বার ও পোর্টাররা ছুটে এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। রাও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সোহন উঠে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'বাঁচলুম। এক ঢিলে দু পাখি মারা হল।'

হাসতে হাসতে ও চলতে শুরু করল ক্যাম্পের দিকে।

'মানে ?'—কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম আমি ওর পথরোধ করে।

'মানে !'—মুখ ভেংচে সোহন বলল, 'ছেলেখেলা তোমাদের থামালুম কি-না ? আর সেই সঙ্গে একটু আরামও—'

'তা হলে তোমার লাগেনি ?'—বিস্মিত হয়ে বললুম, 'এ ইয়ারকির পরিণাম কী জান ? শেষে ভেড়ার পালে বাঘ পড়ার মত না হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম, এক রাখাল প্রতি দিন তার

ভেড়ার পালে বাঘ পড়েছে বলে চেঁচাত। প্রতিবেশীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে ছুটে এলে সে খুব আমোদ পেত। একদিন সত্যি সত্যিই বাঘ এল—'

—থাক্, থাক্, আর তোমায় ময়নাপনা করতে হবে না। খুব হয়েছে। পালে বাঘ পড়ার গল্প উনি আমায় শোনাতে এলেন নতুন করে!

সকলে অট্টহাস্য করে উঠল ওর কথায়। আর তার মধ্যে আমি যেন কোথায় হারিয়ে গেলুম।

পরিষ্কার দিন। সূর্যের আতপ্ত আলো ছড়িয়ে পড়েছে ওই রাশি রাশি তুষারের ওপর। আর তারই প্রতিফলন হয়েছে ওখান থেকে দিক্‌বিদিকে। এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় চোখ তাই ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তবু যেন ভাল লাগছে এই আলোর বৈচিত্র্য। কারণ রামধনু রঙের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ চলেছে তুষারের খাঁজে খাঁজে, ফাঁকে ফাঁকে, গায়ে গায়ে।

এ আলো চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। পোর্টাররা ফিরে এলে লীডার তাই সর্বপ্রথমে খোঁজ করলেন, ওদের সঙ্গে চশমা আছে কি না! ওরা অস্বীকার করলে তিনি আমাদের অতিরিক্ত চশমাগুলো আনালেন, তারপর এক এক করে তা ওদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। কিন্তু তাতেও কুলাল না। তখন লাল, সবুজ কাগজ দিয়ে ওদের চশমা বানিয়ে নিতে বললেন।

নিউমোনিয়া-রুগীটিকে এই ফাঁকে একবার দেখে এলুম। বেশ ভালই আছে। বোঝা নিয়ে যেতে পারবারও শক্তি পেয়েছে ও—বলছিল। নিষেধ করেছি। আর সেই সঙ্গে ভাল খাবারের ব্যবস্থাও করে দিয়ে এসেছি।

ব্রেকফাস্টের পর বেলা দশটা নাগাদ আমরা যাত্রা শুরু করলুম। লোবুজের দিকে।

তুষারের ওপর দিয়ে চলেছি আমরা। সদ্য-পড়া তুষারে আবৃত

চারিদিক সে-কথা আগেই বলেছি। পা দেবামাত্র তাই পা বসে যাচ্ছে অনেকখানি। এখানেই ভয়। কারণ কোথায় আছে পাথরের খাঁজ, কোথায় আছে চোরা ফাটল, আর কোথায় বা আছে লম্বা গড়ান—কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তাই এগুলোর কোথাও অসাবধানে পা ফেললে সর্বনাশেরও সীমা-পরিসীমা থাকবে না। প্রতি পদে তাই বিপদ এখানে। প্রতি পদে তাই সতর্কতারও প্রয়োজন এখানে।

আমাদের আগে আগে চলেছে শেরপারা, পেছনে পেছনে আসছে পোর্টাররা। পোর্টারদের পিঠে ভারী ভারী বোঝা। ভ্রুক্ষেপ নেই তাতে ওদের। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব করতে করতে ঠিকই ওরা আসছে আগের মত। ওদের কারও কারও পায়ে আবার জুতো নেই। খালি পায়ে নির্লিপ্তের মত তবু ওরা আসছে অম্লান বদনে। সহ্যের একটা সীমা আছে, কিন্তু এক-এক সময় মনে হয়, ওরা যেন তাও অতিক্রম করেছে।

দেখতে দেখতে দলটা নানা ভাগে ভাগ হয়ে গেল আপন আপন গতিছন্দে। কেউ কেউ এগিয়ে গেছে অনেকদূর, যাদের গতি অপেক্ষাকৃত কম তারা রয়েছে মাঝামাঝি, আর যাদের একেবারে মন্থর, তারা পেছনে। ডাক্তার হিসেবে আমার পেছনে থাকবারই কথা। কিন্তু আমি ধরেছি মধ্যপথ। এতে অবশ্য সমস্ত দলটার সঙ্গে সংযোগ রাখতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না কিছু।

ঘণ্টা দুই একভাবে চলার পর আমরা একটা সমতল জায়গার নিকটবর্তী হলুম। বরফে ঢাকা। আর তার অপর প্রান্তে দেখলুম, একটা মস্ত বড় পাথরের ঢিবি আর তার দু' পাশে দুজোড়া পুরুষ ও রমণী, অর্থাৎ আমাদেরই শেরপা ও শেরপানী। জীবমাত্রেরই সেই চিরন্তন ক্ষুধায় ওরা আত্মবিস্মৃত হয়ে আছে। একে অন্যের মধ্যে লীন হয়ে আছে।

উপযুক্ত জায়গাই বটে! আর তা ছাড়া ওদের জায়গাই বা কোথায়? বাঁধাধরা আব্রুর মধ্যে ওদের জীবনযাপন নয়। প্রস্তরাকীর্ণ

পাহাড়ের কোলে ওদের স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন। তাই তো ওরা এতখানি বেপরোয়া। লজ্জায় আমাদেরই মাথা হেঁট হয়ে এল। কোনরকমে পাশ কাটিয়ে আমরা দ্রুত এগিয়ে চললুম আমাদের লক্ষ্যে।

ছুটোর সময় আমরা এসে পৌঁছলুম লোবুজে। আজ এখানেই ক্যাম্প করার কথা। যাত্রা সাঙ্গ করে আমরা ঝিমোতে লাগলুম একটা জায়গায় বসে।

পোর্টাররা কিন্তু নির্বিকার। ওরা একে একে মাল রাখল। তারপর ক্যাম্প খাটাতে লেগে গেল হৈ-চৈ করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ক্যাম্প খাড়া করে তুলল। আর আমরা পরম নিশ্চিন্তে তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলুম।

পোর্টাররা চলে গেল এবার ওদের কাজে। সবই ওদের নিজের হাতে করে নিতে হবে। ক্যাম্প খাটানো থেকে রান্নাবান্না পর্যন্ত। ওদের কি আর এখন বিশ্রামের অবকাশ আছে?

খাওয়াদাওয়ার পর একটু বেরিয়ে বেড়াতে লাগলুম জায়গাটার চারপাশে। রাজু পিছু নিল।

ক্যাম্পের ভেতর এখন আর মন বসতে চায় না। ভাল করে তাই চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম।

এখানেও নজরে পড়ল সেই আগেরই মত ছুটো পোড়ো কুটির। ছাউনিশূন্য। ইয়ক-পালকদেরই হবে নিশ্চয়। কুটির ছুটোর তলা দিয়ে বয়ে গেছে একটা সুন্দর ঝরনা সর্পিলরেখায় দূরে-দূরান্তে। সবই এখন এখানকার তুষারাচ্ছন্ন। তাই ঝরনাটাও এখন জলাভাবে গতিহীন।

এখন কোথাও আর নজরে পড়ে না জীবনের লেশমাত্র চিহ্ন। জীব-জন্তু, গাছ-গাছড়া সব যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। আর দেখতে পাচ্ছি না কোথাও বরারের দল, তুষার-পারাবতের ঝাঁক, ইয়কের ঘোরাঘুরি। শুনতে পাচ্ছি না কোথাও চকোরের 'চিরাক্

চিরাক্' ডাক, মোরগের 'কোঁকর কোঁ' ধ্বনি। আর নজরে পড়ছে না রডোডেনড্রন ম্যাগনোলিয়া অর্কিডের শোভা। দেবদারু ঝাউ শাল পাইনের সবুজ সমারোহ। সবই বিদায় নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় এক এক করে। এখন খালি তুষারের রাজ্যে তুষারের গতিবিধি থেকেই যা কিছু বৈচিত্র্য খুঁজে নেওয়া। এখন—

Only you can look upon the high peaks as things of beauty. There above the far edge of the boulder strewn (although covered with fresh snow at present) glacier, stood Nuptse, the near end of its long ridge assuming the form of sharp snow cone, perched in isolation a plunging precipice of rock, blue ice cliff and shining slope.

অদূরে একটা ঢালের গায়ে কে যেন বসে রয়েছে। নারীমূর্তি বলেই মনে হচ্ছে। বেড়াতে বেড়াতে এগিয়ে গেলুম ওই দিকে। নিকটবর্তী হতেই রাজু চন্‌মন্ করে উঠল। আমায় দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখুন ঝুরা।'

সত্যিই ঝুরা। অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে এই নির্জন পরিবেশে। তা ছাড়া ও আজ সাজগোজও করেছে খুব। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ঝুরা মিষ্টি হেসে চাইল আমার দিকে। আমি বলবার মত কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে মুখে যা এল তাই-ই বললুম, 'আজ যে দেখছি খুব সেজেছ! ব্যাপার কী? কোন উদ্দেশ্য নেই তো?'

'আপনি খালি আমায় সাজতেই দেখেন।'—অভিমানের সুরে ঝুরা বলল।

—এই দেখ! আরে, সাজাটা কি খারাপ নাকি? কত সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ দেখি তোমায়!

রাজু হাসছিল। এবার ওকে রাগাতে বলল, 'দেখালে কী হবে! আসলে তো মাকাল ফল। শুধু রূপের চমকই আছে।—'

ঝুরা কিন্তু রাগল না। কোন জবাবও দিল না, বরং মলিন মুখে বসে রইল।

রাজু আর-একবার ওকে খুঁচিয়ে রাগাতে চেষ্টা করল।

ঝুরা অপলক চোখে একবার ওর দিকে তাকাল, অভিমানে করুণ হয়ে উঠেছে ওর মুখ। মুহূর্তমাত্র। তারপর একরকম দু' হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালাল ও আমাদের কাছ থেকে।

স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি এই নাটকীয় ব্যাপারে। বাস্তবিক, কী এমন ঘটল যা ওকে এতখানি বিব্রত করে তুলল? নারীচরিত্র সত্যিই একটা রহস্য। কে তাকে উদ্ঘাটন করে?

আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা বাতাসও বইতে শুরু করেছে হু-হু করে। তুষারপাতেরও বোধ হয় দেরি নেই আর। এখন ক্যাম্পে ফেরাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৮ই এপ্রিল ॥ শুক্রবার

কাল রাতে ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল। সকালে তাই দেখছি ক্যাম্পের সব মগগুলোর জল বরফ হয়ে আছে। সোহন তো উঠেই ছুটেছে রান্নাঘরের দিকে, ওর দাঁতের পাটি জোড়া উদ্ধার করতে। দাঁতের পাটি দুটো ওর কৃত্রিম। প্রতিদিন রাতে বেচারী ও দুটো খুলে জলে ভিজিয়ে রাখে। সকালে আবার মাজাঘষা করে পরে। আজ আর তার উপায় নেই। আজ জল জমে বরফ হয়ে গেছে ও দুটোকে সঙ্গে নিয়ে। বরফ না গললে আর ও দুটোর উদ্ধার নেই। তাই সর্বপ্রথমে ও বরফ গলাতেই ছুটাছুটি লাগিয়েছে রান্নাঘরে।

কালকের ঠাণ্ডায় আমরা সকলেই খুব কষ্ট পেয়েছি। আমি আবার বাহাদুরি করে খালি একটা গেঞ্জি গায়ে স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকে পড়েছিলুম। বুঝতে পারিনি যে, রাতে এতখানি ঠাণ্ডা পড়তে

পারে। ফলে সমস্ত রাত্রি খুব কেশেছি। কাশিটা অবশ্য শুধু আমার একলারই নয়—সহযাত্রী বন্ধুদেরও। লীডারও এর হাত থেকে রেহাই পাননি। বরং তিনিই বোধ হয় এর প্রতিযোগিতায় সকলকে হার মানিয়েছেন। এখনও চলছে তার পাঁয়তারা সমানে, সকলের মধ্যে।

সর্ব প্রথমে আমি তাই সকলকে গরম নুন-জলে কুলকুচো করতে বললুম। আর যাদের আক্রমণটা বেশী তাদের সেই সঙ্গে গরম বেঞ্জিন জলে হুঁকা খেতে বললুম। সেইমতই কাজ শুরু হল একটু পর থেকে। ফলে কুলকুচোর প্যারেড লেগে গেল ক্যাম্পের মধ্যে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! পাহাড়ের ঊর্ধ্বভাগে পর্বতারোহীদের এই কাশি অহরহ লেগেই থাকে। আর তার একটা কারণও আছে—

ঊর্ধ্বভাগে অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে যথেষ্ট অসুবিধে হয়। ফলে নাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সময় সময় অসাবধানে মুখেও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে হয়। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ক্রমান্বয়ে এই কারণে গলায় লেগে গলা জ্বালা করে ওঠে আর তারই ফলে কাশির উদ্ভব হয়। অনেক সময় এই একই কারণে গলায় বিচি পর্যন্ত দেখা দেয়।

সে আলোচনা এখন থাক্। ব্রেকফাস্টের পর আমরা ক্যাম্পটার পুনর্বিন্যাসে লেগে গেলুম। কারণ এইটাই হবে আমাদের বিশ্রাম-শিবির। এখানে এসে বিশ্রাম নেবে আমাদেরই যারা পাহাড়ের অনেক উঁচুতে কাজ করতে গেছে। ক্লান্ত হয়ে তারা ফিরবে এখানে শক্তি ও উদ্যম পুনর্লাভের জন্যে। সব দিক থেকেই তাই ক্যাম্পটার শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা বজায় থাকা দরকার।

জন হান্টও এখানে বিশ্রাম-শিবির স্থাপন করেছিলেন। আর সেদিক থেকে জায়গাটার যে একটা মাহাত্ম্য আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। উদ্যোগী হয়ে আমি তাই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম ক্যাম্পটার চারপাশ। প্রথমেই আমি নির্বাচন করলুম মলমূত্র ত্যাগ ও আবর্জনার জন্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গা। কিছুদিনের স্থায়ী ক্যাম্পের

রডোডেন্‌ড্রন ল্যানাটম্‌ (৯০০০-১২০০০ ফুট)

এটা একটা দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য। আর সেখানে লাগিয়ে দিলুম একটা সঙ্কেতজ্ঞাপক ফ্ল্যাগ।

এর পর জলাধারের জন্যে নির্দিষ্ট করলুম আর-একটা জায়গা আর সেখানেও লাগিয়ে দিলুম ওই ধরনের আর-একটা ফ্ল্যাগ। আর বরফ খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ করলুম।

ছোটখাটো আরও কিছু কাজ সেরে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি আর-একবার চা খাব বলে, এমন সময় শুনলুম ডাক-হরকরা এসেছে চিঠি নিয়ে। আর যায় কোথায়! রইল পড়ে চা খাওয়া, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলুম চিঠির উদ্দেশ্যে।

ব্রিগেডিয়ার ইতিমধ্যেই চিঠিগুলো বেছে ফেলেছিলেন। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি আমার হাতে আমার চিঠিগুলো তুলে দিলেন। মোট তিনখানা চিঠি। পকেটে পুরে সেগুলো আমি ফিরে এলুম আমার ক্যাম্পে। তারপর শুয়ে পড়লুম বিছানায়।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করলুম চিঠিগুলো কোন্ কোন্ জায়গা থেকে আসতে পারে। কূলকিনারা তার কিছু ঠিক করতে না পেরে হস্তাক্ষর দেখে ধরতে চেষ্টা করলুম চিঠিগুলোর লেখক-লেখিকাকে। শেষ পর্যন্ত তাতেও বিফল হয়ে মনস্থ করলুম চিঠিগুলো খুলতে।

কিন্তু এখানেও আর-এক সমস্যার সম্মুখীন হলুম। কোন্ চিঠিটাকে আগে খুলব? যা হোক, একটু ইতস্তত করে সহসা একটা জোর করে খুলে ফেললুম।

চিঠিটা লিখেছেন মা। আমার শরীরের বিষয় নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে ও উপদেশ দিয়ে মা জানতে চেয়েছেন, কবে আমাদের অভিযান শেষ হচ্ছে? কবে আমি বাড়ি ফিরছি? সবশেষে জানিয়েছেন সেই চিরাচরিত শুভেচ্ছা—'তোমাদের অভিযান সফল হোক, সার্থক হোক। জয়ের মুকুট পরে তোমরা হাসিমুখে ফিরে এসো—এই কামনাই আমি শ্যামসুন্দরের পায়ে নিত্য জানাচ্ছি।'

দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেছেন আমার এক পুরনো শিক্ষক। আমাদের অভিযানকে তিনি তীর্থযাত্রার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি এ আশাও প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে যখন ভারতের যুবশক্তি আমাদেরই অনুসৃত পথে জীবনকে অনুশীলন করার প্রয়োজন বোধ করবে। আর তখন নিত্য নতুন অ্যাডভেঞ্চারে, নিত্য নতুন দুঃসাহসিকতার ঘাত-প্রতিঘাতে তারা দেহ ও মনকে ভেঙে-গড়ে সত্যিকারের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠবে। সবশেষে তিনি জানিয়েছেন আমাদের সকলের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ।

তৃতীয় চিঠিটা লিখেছেন প্রস্তুতি (Sponsoring) কমিটী। এখানে নয়, বাড়িতে। আর তাই দিল্লি থেকে ওটা বাড়ি হয়েই এখানে এসেছে এতদিন পরে।

এও একটা নিশ্চিন্তের বিষয় যে, দিল্লি থেকে আমাদের খবরাখবর নিয়মমত ঠিকই যাচ্ছে আমার বাড়ি—আমার খবর এখান থেকে নিয়মমত যাক্ বা না-যাক্। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিঠিটা তাই আর-একবার পড়তে লাগলুম—

Indian Mount Everest Expedition 1960

C/o Ministry of Defence
Room No. 164,
South Block,
New Delhi.
March 15, 1960.

Dear Sri Das,

This is the first letter I am writing to you about the welfare of the members of the Indian Everest Expedi-

tion. They got a very hearty and warm send-off from Jaynagar and have been keeping to the time schedule that they had laid down. In fact, so far they are one day ahead. Okhal Dungha (height—6000 ft.) which they reached on Sunday had a very festive appearance with the local population celebrating Holi. The weather was very good ; it was bright and sunny and not too hot. Yesterday they reached Thare (height—9500 ft.) which was colder than Okhal Dungha.

All members of the team are in good health and in excellent spirits. I get daily reports from them and I shall be writing to you every 3 or 4 days.

I may however add that if for any reason you do not hear from me, you should assume that everything is well with the Expedition.

Yours sincerely,
H. C. Sarin
Member,
Sponsoring Committee.

লাঞ্চ খাওয়া শেষ করে বাইরে এসে বসেছি। মিনিট পাঁচেকও হয়নি, এমন সময় পূর্বাকাশের একটা কালো মেঘ আস্তে আস্তে পশ্চিমাকাশ ছেয়ে ফেলল। অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। এরও একটু পর ঠাণ্ডা বাতাস উঠল আর সেই সঙ্গে শুরু হল গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত। বাধ্য হয়েই ফিরে এলুম ক্যাম্পে।

আশ্চর্য, একটু আগেও আকাশে কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল

না। উজ্জ্বল সূর্যকিরণে ঝলমল করছিল চারিদিক। আবহাওয়াবিদ্ রাও-ও আজকের সমস্ত দিনের আবহাওয়ার এই রকমই পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে কেমন যেন সব বানচাল হয়ে গেল। রাওকেও বোধ হয় এই কারণে একটু বিচলিত দেখাচ্ছে। পরিহাস-পরায়ণ মন তাই আপনা হতেই রাওয়ের প্রতি আকৃষ্ট হল। ওর কাছে গিয়ে যতদূর সম্ভব গাম্ভীর্য অবলম্বন করে নিরীহের মত বললুম, 'দিনটা বেশ ভালই যাচ্ছিল, হঠাৎ মেঘটা উঠে কেমন যেন সব গোলমাল করে দিল।'

'তাইতো দেখছি—'আমার কৃত্রিম গাম্ভীর্য ধরতে না পেরে ও চিন্তিতভাবে বলল, 'মনে হয়—'

—আরবসাগরে হঠাৎ কোন ডিপ্রেশন দেখা দিয়েছে।

—না, তা ঠিক নয়, মানে—

—তা হলে ভূমধ্যসাগরে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্দেহবশে ও এবার আমার দিকে তাকাল। তারপর কী বুঝল জানি না, ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে বলল, 'গেট আউট—গেট আউট—আই সে, গেট আউট।'

চারটে নাগাদ ফ্লাইট লেঃ গাড়োয়ালের পঁচাশি জন পোর্টার অক্সিজেনের যন্ত্রপাতির সঙ্গে অন্যান্য আরও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হল। আমরা জিনিসগুলোকে ঘিরে খুব হৈ-চৈ শুরু করে দিলুম। ব্রিগেডিয়ারও বেরিয়ে এলেন ক্যাম্প থেকে একমুখ হাসি নিয়ে। এ যেন সেই বিয়ে-বাড়ির তত্ত্ব দেখে আত্মীয়স্বজনের উচ্ছ্বাস—যেমন করে প্রাণ চায় তেমন করে প্রকাশ করার মত আর কী!

মোট ছুশো অক্সিজেন সিলিণ্ডার এসেছে। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে কাজ করার সময় ব্যবহারের জন্যে। কিন্তু, কেন জানি না, মনে আমার বার বার প্রশ্ন জাগছে—অক্সিজেন ব্যতিরেকে কি পাহাড়ের অনেক উঁচুতে ওঠা একেবারেই অসম্ভব? কেউ কি পারেনি কখনও

সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে? সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে জ্বলজ্বল করে উঠল কতকগুলো রেকর্ড—

১৯২২	...	ম্যালরি সমরভেল নর্টন	...	২৭০০০ ফুঃ বিনা অক্সিজেন
১৯২৪	...	নর্টন সমরভেল	...	২৮১২৫ ফুঃ
১৯৩৩	...	উইন হ্যরিস ওয়েগার	...	২৮১২৫ ফুঃ
১৯৩৯	...	এফ. এইচ উইসিনার	...	২৭২৯৬ ফুঃ ”
১৯৫৬	...	স্মিমড মারমেড	...	২৯০০২ ফুঃ ”

সুতরাং একথা ঠিক, মানুষের দ্বারা সবই সম্ভব। মানুষ আত্মবিশ্বাসের জোরে আজ দুর্লঙ্ঘ্য এভারেস্টকেও জয় করেছে। আবার হয়তো সে একদিন এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই পৃথিবীর যে-কোন উচ্চতায় যাতায়াতেরও ক্ষমতা অর্জন করবে। আর তারই অনুশীলন শুরু করেছেন উল্লিখিত পর্বতারোহীরা। এভারেস্ট-জয়ী হিলারিও শুনছি সেই অনুশীলনের বশবর্তী হয়ে মাকালু (২৭৭৯০ ফুট) জয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সম্প্রতি। ভাবছি এই সব কথা, এমন সময় স্বয়ং গাড়োয়াল এসে হাজির। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ওকে আমরা সম্বর্ধনা জানালুম। তাতে ওর আমোদ দেখে কে!

ওর একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু ওর ওই প্যাকিং বাক্সের 'ছাপ'গুলোর মধ্যেই সুপ্রকাশ। তা হচ্ছে একটু আত্মপ্রচার। অবশ্য তার মধ্যে আমি খারাপ কিছু দেখি না, বরং আমোদই পাই ষোল আনা। কিংবা হয়তো সব ধারণাটা আমার আগাগোড়াই ভুল। যা হোক, 'ছাপ'গুলোর কথা হচ্ছে 'GREWAL (IMEE) EXPEDITION—1960' সব কথাগুলোর মধ্যে (IMEE) কথাটার হরফগুলো এত ছোট ও অস্পষ্ট যে নজরেই আসে না সব সময়। ফলে সাধারণ মানুষের

চোখে অভিযানটা গাড়োয়ালের বলেই যে অভিহিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আর এইটাই গাড়োয়ালের, মানে খালিফের অভিপ্রেত কি না তাই বা কে বলতে পারে?

থাক্ সে কথা। খালিফ আমার পুরনো বন্ধু। দিল্লির এক এয়ার-মেসে ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারই সূত্র ধরে আজ আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে দেরি হল না একটুও। কথা-প্রসঙ্গে খালিফ (গাড়োয়াল বা গ্যারী) জানাল, জেন আসছে ওর পেছনে, এসে গেল বলে।

কী আশ্চর্য, এ যে ভাবাই যায় না। সেই জেন। দিল্লিতে যাকে আমরা দেখেছি 'ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে' একটা সাময়িক রিপোর্টারের কাজ করতে। বিখ্যাত সাংবাদিকের খ্যাতিলাভের আশায় যার ব্যস্ততার অভাব দেখিনি কোন সময়ে। সেই সে!

খালিফ আরও জানাল—ও এখানে আসছে ওর সাংবাদিকতার স্বপ্নকে চরিতার্থ করতে। ওর ধারণা আমাদের অভিযানের যাবতীয় সংবাদ আমাদের সঙ্গে থেকে ঠিকমত সরবরাহ করতে পারলে প্রতিষ্ঠা-লাভের আর-কোন বাধাই থাকবে না। ও তাই আসছে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে আমাদের সহযোগিতা পেতে।

খালিফ দুঃখের সঙ্গে বলল, ও যখন জয়নগরে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়, ব্রিগেড়িয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তখন ওর পরিধানে না ছিল কোন শীতবস্ত্র, না ছিল কোন অভিযানের সাজ-সরঞ্জাম। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই ও ওকে নিজস্ব জিনিসের ভাগ দিয়ে সাহায্য করেছে।

খালিফ আরও কী সব যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় জেন এসে উপস্থিত হল।

সত্যিই ওকে দেখলে মায়া হয়। বিষাদমলিন ওর মুখ। ক্লান্ত রুক্ষ ওর শরীর। অবিন্যস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ। একটা অপ্রতিভের হাসি ওর ফ্যাকাসে দুই ঠোঁটে।

এসেই ও আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করল। তারপর আমাদের পীড়াপীড়িতে জলযোগ করে, বিশ্রাম নিয়ে, শুরু করল ব্রিগেডিয়ারের কাছে ওর দুঃখের কাহিনী বলতে। সব শুনেও ব্রিগেডিয়ার ওকে সাংবাদিকতার ব্যাপারে কোনরকম সাহায্য করতে রাজী হলেন না। কারণ প্রস্তুতি কমিটি ইতিমধ্যেই তাঁকে ওয়্যারলেসে নির্দেশ দিয়েছেন, মিঃ জেনকে যেন নামচেবাজারের পর আর এগোতে দেওয়া হয় না।

ওর মনে, ব্রিগেডিয়ারের জবাবে, এখন কী হচ্ছে জানি না—তবে আমরা নিরুপায়। কাল ওকে ফিরে যেতেই হবে আমাদের সংশ্রব ছেড়ে অন্য কোথাও।

৯ই এপ্রিল ॥ শনিবার

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তুষারপাত একভাবেই চলেছে রাত্রি থেকে। দশ-বারো ইঞ্চি তুষারও ইতিমধ্যে জমে গেছে চারপাশে। চতুর্দিক তাই সাদায় সাদা। ধরিত্রী যেন শ্বেতাভরণে আত্মগোপন করেছে।

আবহাওয়ার অবস্থা আজ মোটেই ভাল দেখছি না। মনে হচ্ছে, সমস্তদিন এই একভাবেই যাবে। বেতারেও আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এই একই আভাস দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়ার সঙ্গে বাস্তবিক মনের কী আশ্চর্য সম্পর্ক! বিশ্রী আবহাওয়ায় মনটাও কেমন যেন বিশ্রী হয়ে থাকে। কিছুতেই, হাজার চেষ্টাতেও তাকে যেন আর বাগে আনা যায় না। এক অস্বস্তিকর আড়ষ্টতার আলসেমিতে সব কেমন যেন কুৎসিত হয়ে যায় আপন হতে। এই-ই পরিণতি। এর অন্যথা নেই কোথাও!

সকাল অনেকক্ষণ হয়েছে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে আর মন

চাইছে না। বরং আরও কিছুক্ষণ পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে স্লিপিং-ব্যাগটার মধ্যে। মড়ার মত।

উপায় নেই। উঠতেই হবে। খালিফের পোর্টার-বাহিনী অল্পবিস্তর সকলেই অসুস্থ। কারও পায়ে ফোস্কা, কারও মাথার যন্ত্রণা, কারও সর্দি কাশি জ্বর, কারও বা আবার চোখ জ্বালা।

চোখের কষ্টটাই হচ্ছে বেশীর ভাগ পোর্টারের। কারণ ওদের কারও কাছে চশমা ছিল না। আর তারই ফলে এ ধরনের উচ্চতায় যে অসুবিধে থেকে ওই রোগ হয় তাই-ই হয়েছে। ওদের সকলকেই দেখতে হবে।

উঠব-উঠব করেও কিছু সময় কেটে গেল। আর নয়। ঝোঁকের মাথায় তাই উঠে পড়লুম।

প্রাতঃকৃত্য সেরে সর্বপ্রথমে গেলুম আমি জেনের কাছে। বেচারা তখনও শুয়ে ছিল। আর কী যেন এক অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্‌ করছিল বলে মনে হল। আমি সাড়া দিতেই ও চোখ কচ্‌লে উঠে বসল। আর সেই সঙ্গে জানাল রাতে ভাল ঘুম না হওয়ার কথা, মাথাব্যথার কথা, গা মেজমেজের কথা ও জ্বরভাবের কথা।

বুঝলুম, এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে পুরোদস্তুর খাপ না খাওয়ানোর ফল এটা। কিছুক্ষণ ওর কাছে বসে এবং যথাযথ চিকিৎসা করে চলে এলুম আমি খালিফের পোর্টারদের কাছে। এদের আজ ব্রেকফাস্টের পর বিদায় দেওয়া হবে স্থির করা হয়েছে। কারণ এদের কাছে না আছে উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ, না আছে পাহাড়ে চড়ার সাজ-সরঞ্জাম, না আছে চশমা জুতো কিছুই। সর্বোপরি এরাও আর পুনরগ্রসরে নারাজ।

এ ছাড়া আমাদের হাতেও এখন রয়েছে দুশো জন পোর্টার। পঞ্চাশ জন তাদের মধ্যে গেছে প্যাংবুচে জ্বালানী কাঠ আনতে, আর বাকী সব গেছে বেস-ক্যাম্পে মাল রাখতে। আজই তারা সব ফিরবে। সুতরাং তাদের দিয়েই আমাদের এখানকার কাজ চলে যাবে অনায়াসে।

সময়ের কাঁটা ঘুরতে লাগল আর তারই ফাঁকে ফাঁকে আমাদেরও কাজ এগিয়ে চলল একটু একটু করে।

ব্রেকফাস্ট মিটল, পোর্টারদের মজুরি দেওয়া চুকল, তারপর তাদের বিদায়ও দেওয়া হল একসময়।

ওদের সঙ্গে মিঃ জেনও বিদায় নিতে এসেছিল। কী মর্মস্পর্শী সে দৃশ্য! সব-হারানোর বেদনায় জেন যেন ভেঙে পড়েছিল। অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছিল ওর চোখ দুটো। অবসাদগ্রস্তের মত দেখাচ্ছিল ওর চালচলন। তবু, তবু আশ্চর্য, মলিন হতে দেখলুম না কোন সময় ওর সেই স্বাভাবিক হাসিটুকু।

জেন কী যেন বলতে চেয়েছিল, কী যেন চায়নি—কোনটাই তখন আর অস্পষ্ট ছিল না আমাদের কাছে। কিন্তু সব বুঝেও আমাদের অবুঝই সেজে যেতে হয়েছিল তখনকার মত। কারণ আমরা নরুপায়। কতটুকুই বা ক্ষমতা আমাদের! অবিমৃষ্যকারিতার ফল যে ওকে ভুগতেই হবে কড়ায়-গণ্ডায়।

লীডার এগিয়ে গিয়েছিলেন ওর কাছে তাঁর বুক-ভরা মমতা নিয়ে। তুলে দিয়েছিলেন ওর হাতে প্রসন্ন হেসে কিছু টাকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমনকি সাজ-সরঞ্জাম পর্যন্ত।

জেন চলে গেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মনের ওপর কত বড় যে এক বেদনার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছে তা বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই, শুধু মুখ বুজে হৃদয়ঙ্গম করা ছাড়া। এক নিঃসীম শূন্যতায় তাই থেকে থেকে মন আমার 'হায়' 'হায়' করে উঠছে, কেমন যেন অর্থহীন লাগছে সব। এমনি অর্থহীন লেগেছিল সব-কিছু আরও একদিন, এমনি অসহায় নিঃসঙ্গতায় জ্বালা করে উঠেছিল চোখ দুটো আরও একজনের জন্যে—সে আমাদের থণ্ডু।

জানি না কেন, আজ যেন মানসপটে এদের দুজনকেই পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি। কোথাও অমিল নেই—সেই হতাশায়, রিক্ততায়, সহনশীলতায় দুজনেরই মুখচ্ছবি যেন একাকার হয়ে গেছে।

চিঠি লিখতে বসে বোধ হয় তাই লিখতে পারছি না একটা অক্ষরও। তবু বসে আছি কলম হাতে। লিখতেই হবে চিঠিগুলো আজ। নইলে উপায় নেই, পাঠান হবে না ঠিকমত।

রাজু এসে এইসময় ঢুকল। ওকে একরকম উপেক্ষা করেই লেখায় মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলুম।

অনেকক্ষণ পরে লেখা শেষ হলে দেখি, রাজু তখনও চুপ করে বসে আছে এক কোণে। ও কী বলতে চায় তা আমার অজানা নয় কিছু। তবু ওর মুখ থেকেই শোনবার জন্যে গুন্‌গুন্‌ করে গান ধরলুম। ভাবটা এই—কাজ এবার আমার সারা হয়েছে। তোমার বক্তব্য এবার শুরু করতে পার। ও-ও বোধ হয় বুঝে নিতে পারল আমার মনের কথা। তাই মিন্‌মিন্‌ করে বলল, 'ঝুরা বোধ হয় আমার ওপর রাগ করেছে।'

—বেশ করেছে। তুমি ওকে যখন-তখন যা-তা বলবে, আর ও মুখ বুজে তা হজম করবে, না? বারণ করিনি তোমায় ওরকম বাড়াবাড়ি করতে?

রাজু মাথা নিচু করে যেমন বসে ছিল তেমনই বসে রইল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। ওর দিকে চাইতে পর্যন্ত এখন আমার মায়া হচ্ছে, অথচ ওর কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকেও বরদাস্ত করতে পারছি না কোন রকমে। তাই বিরক্ত হয়েই বললুম, 'আচ্ছা, আমাকে তোমরা কী ভাব বলতো? বার বার দুজনে খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া করবে আর তার মীমাংসার জন্যে ওকালতি করতে হবে আমাকে? আমার আর কী কোন কাজ নেই? ওসব হবে-টবে না। যাও, যাও।'

এবার রাজু সত্যি-সত্যিই ম্লান মুখে উঠে যাচ্ছিল। ডাকলুম ওকে। অপরাধীর মত ও মন্থর পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল। বললুম, 'দেখ, এ ব্যাপারে আমি নিরুপায়। হাজার বললেও কোন কাজ হবে না, যতক্ষণ না তুমি নিজে গিয়ে ওর কাছে বোঝাপড়া করছ।'

—তা হলে ওকে ডেকে আনব এখানে? তারপর না হয় আপনার কথামত কাজ করা যাবে।

—সময়ে ঠিকই ওকে ডাকতে পাঠাব। তৈরী থেকো।

রাজু হাসতে হাসতে চলে গেল।

লাঞ্চের কিছু পরে বেস্-ক্যাম্পের পোর্টাররা ফিরে এল হৈ-হৈ করে ছুটন্ত একটা ইঞ্জিনের মত। আর তারপরেই এল প্যাংবুচের পোর্টাররা। প্রথম দল এল মাল রেখে, দ্বিতীয় দল এল মাল নিয়ে। কর্তব্যে কেউই এরা পরাঙ্মুখ নয়, তাই এদের বিষয়ে ভাবতেও হয় না কিছু কোন সময়ে।

আজ এদের অনেকেই লীডারের কাছে বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করল। লীডারও রাজী হয়ে গেলেন। কারণ, না হয়ে করেনই বা কী? এদের জন্যে মেস্-টেন্ট, অতিরিক্ত ছোট ছোট টেন্ট, ইয়ক-পালকদের কুটিরের ব্যবস্থা করেও আমরা অনেকের স্থান সঙ্কুলান করতে পারিনি, আর তারই ফলে তাদের সীমাহীন কষ্টস্বীকার করতে হচ্ছে এ ক'দিন এই অবিশ্রান্ত তুষারপাতে।

সোহন, ভোরা, দানামগিয়াল ও সর্দার লীডারের নির্দেশে প্রস্থানেচ্ছুদের পাওনা চুকিয়ে দিতে প্রস্তুত হল। আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করতে লাগলুম। এমন সময় নজরে পড়ল দূরে কয়েকজন শেরপানীর মধ্যে বাহাদুর বসে। ওদের মধ্যে লছমী, লামুও রয়েছে। শেরপানীরা সকলেই খুব হাসাহাসি করছে, শুধু লামু ছাড়া।

কৌতূহল হল ব্যাপারটা কী জানবার। সোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম ওদের মধ্যে। লামু ছুটে এসে অভিযোগ করল, 'আচ্ছা, এ কী উপদ্রব বলুন তো? বুড়ো বিচ্ছুটা কিছুতেই আমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না?'

—কেন, কী হল আবার?

—এই দেখুন।

একখানা খামে-মোড়া চিঠি ও আমার হাতে দিল। খামটা আমারই

মনে হল। এ ধরনের একটা খাম ছদিন আগে বাহাত্তুর আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে কি একটা জরুরী খবর পাঠাবার জন্যে।

চিঠিটা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললুম, 'এ লেখা তো আমি পড়তে জানি না।'

লছমী সঙ্গে সঙ্গে লেখাটার মর্মার্থ বুঝিয়ে দিল।

দেখলুম, কোথাও বিশেষত্ব নেই। সেই পুরনো বাঁধা বুলি; সেই ছনিয়ার হতাশ প্রেমিকদের মত বড় বড় বিশেষণে বিরক্তিকর আত্মপ্রচার; সেই প্রত্যাশিতের প্রতি অভয়দান, সান্ত্বনা ও সহানুভূতি-জ্ঞাপন; শেষে আত্মসমর্পণ। শুধু শেষের 'ইতি'টি ছাড়া। ওইটুকুতেই বাহাত্তুরের যা কিছু কৃতিত্ব। ও লিখেছে—ইতি—'তোমার আশে-পাশে।'

সোহম কথাটা শোনামাত্র উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। আমিও হাসতে হাসতে বললুম, 'তা, বাহাত্তুরকেই বা তুমি সন্দেহ করছ কেন?'

অথৈ জলে কুটো ধরার মত বাহাতুর হাঁ হাঁ করে বলে উঠল, 'দেখুন তো!'

লামু রুষ্ট হয়ে লছমীর হাত থেকে খামখানা ছিনিয়ে নিয়ে আমায় দেখাতে দেখাতে বলল, 'দেখুন, দেখুন কোথাও পোস্ট-অফিসের টিকিট মারা আছে কি না? আর তা ছাড়া ক'জনই বা এখানকার লেখাপড়া জানে?'

—তাও তো বটে।

বাহাত্তুরের দিকে চেয়ে দেখি, ও আবার মুষড়ে পড়েছে। মাথা নিচু করে পায়ের আঙ্গুলটা ও জোরে জোরে মাটিতে ঘষে গর্ত করবার চেষ্টা করছে।

—দেখছেন না। ধরা পড়ে গিয়ে কী রকম পোকার মত পড়ে রয়েছে। কিছুই বোঝে না যেন! উঃ, আস্পর্ধা দেখুন। চিঠি দিয়ে মন ভোলাতে এসেছে নির্লজ্জ জানোয়ার।—রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে লামু বলল।

কিন্তু আশ্চর্য! বাহাদুর আজ যেন সীমাহীন সংযমের ওপর আধিপত্য করছে। প্রত্যুত্তরে ও শুধু ক্ষীণ-উদাস কণ্ঠে বলল, 'আমি কী জানি ?'

হাই তুলল ও।

'আমি কী জানি !'—ভেংচি কেটে লামু বলল, 'আবার মিছে কথা! তুই ছাড়া এ-কাজ আর কে করবে। 'আশে-পাশে' আর কে আছে ? লেখ্ লেখ্ তুই। দেখাই সাব্দের তোর লেখার সঙ্গে এ লেখার কোন মিল হয় কি না ?'

—লিখলেই হল যখন-তখন! বাঃ রে!

হাসবার চেষ্টা করল বাহাদুর।

—তা তো বটেই। লিখলে যে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে! তার চেয়ে—

বাহাদুর আর ওকে শেষ করতে দিল না। হঠাৎ কী ভেবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর 'এত রাগারাগির মধ্যে আমি নেই' বলে দ্রুতপদে প্রস্থান করল।

১০ই এপ্রিল ॥ রবিবার

কাল রাত পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে সমানে। আজ সকালে যাহোক একটু থেমেছে। মেঘের গাঢ় ভাবটাও অনেকটা ফিকে হয়ে আসছে। রোদ উঠলেও উঠতে পারে।

কুমার খুব খুশী। ক'দিনের আবহাওয়ায় বেচারী যেন একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। না পারছিল কোন পাহাড়ে চড়তে, না পারছিল কোন দুঃসাহসিক কাজের ঝুঁকি নিতে। ওর মত চঞ্চল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা পুরুষের কি ঘরে বসে থাকা আরামের হয়! বিশেষ করে এই সমস্ত জায়গায়, যেখানে বাহবা পাবার মত কিছু একটা করবার অজস্র

উপকরণ রয়েছে। ও ছুটে যাবে উল্কার মত দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশীর্ষে, যেখানে আজ মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি—মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ক্রমান্বয় সংগ্রাম চালাবে দুর্জয়কে জয় করতে—আনন্দ তো ওর সেইখানেই।

এ ক'দিন আর-কিছু না পারুক, অন্তত আশপাশের ছোট-বড় পাহাড়গুলো তো ওর একবার করে চড়া হয়ে যেত। লোবুজ গ্লেসিয়ারে প্রয়োজনীয় কাজের কিছু কিছু মহড়া তো দেওয়া হত। কিন্তু তার কিছুই ও করতে পারল না, শুধু এই অসময়ের দুর্যোগের জন্যেই না!

কুমারের নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা। নতুন কিছু একটা করে দেখিয়ে প্রশংসা পাবার লোভ ওর চিরদিনের। আর তার জন্যে ও সব রকমের অভাব-অসুবিধে শিরোধার্য করে নিতে প্রস্তুত।

ঠিক এই একই ধরনের প্রকৃতি দেখেছি কোলীর মধ্যে। অদ্ভুত মিল দুজনের। তাই বন্ধুত্বও দুজনের খুব। কোলী এখন রয়েছে প্রথম দলের সঙ্গে বেস্-ক্যাম্পে। গ্লেসিয়ারের নানা বিপদসঙ্কুল জায়গায় ও এখন মনের আনন্দে কত কী যে করে বেড়াচ্ছে তার কি আর কিছু হিসেব আছে! সবই শুনতে পাব বেস্-ক্যাম্পে গিয়ে একটু একটু করে।

এদের কথায় বার বার মনে পড়ে সেদিনের সেই ব্যাপারটা—সেই বম্বের।

একটা পার্টিতে গেছি। একরকম জোর করেই কোলী আমায় নিয়ে গেছে। জমজমাট ব্যাপার। সুন্দরী কয়েকজন তরুণীও বসে রয়েছে এধারে ওধারে নিখুঁত সাজসজ্জায়। প্রথম নজরেই চোখে পড়ে।

কোলীর পায়া বোধ হয় তাই ভারী হয়ে উঠল। গম্ভীর হয়ে ও করমর্দন করতে লাগল সকলের সঙ্গে। তারপর এগিয়ে যেতে লাগল বিশেষ একটি তরুণীর কাছে।

একলাটি সকলের সামনে সহজভাবে আলাপ করাতে কোলী

বোধ হয় অভ্যস্ত নয়, তাই তরুণীটির সঙ্গে দুটি-একটি কথার পর ও থমকে গেল। আমি একটু তফাতে ছিলুম একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে। অসুবিধের এটাও একটা বড় কারণ। মুশকিলে পড়ল ও। চাপা বিরক্তি নিয়ে ও তাই আমায় ডাকল ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। কথাটা শোনামাত্র ইলেকট্রিক সক্ খাওয়ার মত সহসা আমি যেন কেমন হয়ে গেলুম। তোলপাড় করতে লাগল বুকের ভেতরটা। তবু এগিয়ে গেলুম আড়ষ্ট পায়ে ওদের সামনে ভদ্রতার খাতিরে।

আমার অবস্থা দেখে রাগে কোলীর দাঁত কড়মড় করে উঠল। এমন সময় কুমার এসে গেল। বেঁচে গেলুম আমি সে যাত্রায়। কোলী আবার ভাষা পেল। সুতরাং বক্তৃতাও আবার শুরু করল। বক্তৃতার লক্ষ্য, তরুণীদের অভিভূত করা। আর বিষয়বস্তু একমাত্র 'কুমার'। কুমার ত্রিশূল-জয়ী। ত্রিশূল ২৩,৩৬০ ফুট উঁচু। দুরারোহ, দুর্ভেদ্য তার শীর্ষ! এভারেস্ট-জয় করার মত ত্রিশূল-জয়ও একটা মহাকৃতিত্বের ব্যাপার। এই সব ধরনের আর কী!

বড় বড় চোখ করে স্বভাবতই ওরা কুমারের দিকে তাকাল। আর কুমারও সেই সুযোগে ওদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। একটার পর একটা প্রশ্ন করে ওরা, আর ও কখনও হেসে, কখনও বিস্ময় প্রকাশ করে, কখনও বা আবার ব্যঙ্গ করে তার যথাযথ জবাব দেয়। অল্পসময়ের মধ্যেই তাই ঘরখানা ওদের কলকাকলীতে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু কোলী বেচারী একেবারে নির্বাক। সেই যে ও থেমে গেছে, আর কথা কওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না মোটে। মেয়েগুলো ওকে একরকম পেছন করে বসেছে শুধু কুমারের সঙ্গে আলাপের উৎসাহেই। এই অবস্থায় কোলীর সঙ্গে একবার আমার চোখাচোখি হল। ফলে ও যেন আরও রেগে উঠল। কারণ আমিও তো কাটা সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে আছি সেই থেকে। নড়তেও পারিনি একটুও ওদের অনুমতি ব্যতীত।

একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আমিও যেন একসময় ভীষণ

উত্তেজিত হয়ে উঠলুম একটা কিছু বলার জন্যে। প্রস্তুত হয়ে নিলুম ক্ষণকাল। তারপর কুমারের একটা জরুরী কথার মধ্যেই আর্তনাদ করে বলে উঠলুম, 'কোলীও নন্দাকোট জয় করেছে। ইয়ে ফুট উঁচু নন্দাকোট। দু-উ-উ-র্গম—।' চুপ করে গেলুম।

কুমার কথাটা ধরে নিল। উদাত্ত কণ্ঠে ও তুলতে লাগল কোলীকে—২২,৫১০ ফুট উঁচু নন্দাকোট। যেমন ভয়ঙ্কর তেমন বিপজ্জনক। আমার সাধ্য কি নন্দাকোট জয় করি! এ কোলীরই অনমনীয় মনোবলের ফল। ত্রিশূল-জয়ে যদি আমার একগুণ গৌরব থাকে, তাহলে নন্দাকোটে আছে শতগুণ।

ঘুরে চাইল মেয়েগুলো কোলীর দিকে। কোলীর কালো মুখ তাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলল। আর এবার দুজনেই তাতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারল। তারপর পার্টি ভেঙে গেল। যে যার গন্তব্যেও চলে গেল এক এক করে।

আমিও উঠে দাঁড়ালুম। কোলী কিন্তু আমায় ছাড়ল না। টেনে তুলল ওর মোটরে আমায় পৌঁছে দিতে।

পথে ও একসময় আমার দিকে ফিরে অপ্রতিভের মত হাসতে হাসতে বলল, 'ভাগ্যিস্ তুলেছিলে কথাটা।'

কোন্ কথাটা?—বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম।

—কেন, নন্দাকোটের।

ভুলতে পারিনি বম্বের এই ব্যাপারটা আজও।

আজ কুমার ওর দলবল নিয়ে যাবে বেস্-ক্যাম্পে প্রথম দলের কাছ থেকে কার্যভার গ্রহণ করতে। আর প্রথম দল সেই অবকাশে চলে আসবে বিশ্রাম-শিবিরে বিশ্রামের জন্যে। এই ভাবেই আমাদের কাজ এগুবে। এক দলের নির্ধারিত কার্যসূচীর পর আর-এক দলের নতুন উদ্যমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আর সত্য কথা বলতে কী, এইটেই আমাদের কার্যপ্রণালীর কৌশল।

স্থির হল এই প্রসঙ্গে, কুমারের দলের সঙ্গে লীডার যাবেন আর যাবে সিগনাল-অফিসার নন্দ।

ব্রিগেডিয়ার আমায় আগেই জানিয়েছেন, আজ তৃতীয় দল এখানে আসবে। এ ক'দিন তারা চিকিৎসা ব্যাপারে কোন রকম সাহায্য পায়নি, তাই সেদিক থেকে তাদের সর্বতোভাবে খুশী করতে হবে। আর তারপর তাদের নিয়ে ১২ তারিখে যেতে হবে বেস্-ক্যাম্পে।

ব্রেকফাস্টের পর পিঠে ঝোলা নিয়ে, রুক্স্যাকে লাঞ্চ নিয়ে দ্বিতীয় দল—কুমার, ভোরা, নন্দ, লীডার, মিশ্র ও দানামগিয়াল যাত্রা শুরু করল গোরকশেপ অভিমুখে।

মনটা খারাপ হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু খালিফ তা হতে দিল না। টানতে টানতে ও আমায় নিয়ে চলল আশপাশের ছোটখাটো শৃঙ্গগুলোতে একটা করে পাক্ দিতে।

লাঞ্চের পর খালিফকে রেখে একলাই ঘুরে বেড়াতে লাগলুম আমাদের এই ক্যাম্পটার চারদিকে। অনেকদিন পরে রোদ্দুর উঠেছে, তাই সব-কিছুকেই যেন ভাল লাগছে আজ। ঘুরতে ঘুরতে শেরপাদের মজলিসে গিয়ে উঠলুম। ওরা আমায় পেয়ে খুব খুশী হল। সমাদর করে বসাল আমায়। তারপর নিকট-আত্মীয়ের মত জুড়ে দিল নানা গালগল্প।

মুহূর্তে আমিও যেন ওদের একজন হয়ে গেলুম। আর সেই সুযোগে আমি প্রকাশও করে ফেললুম ওদের কাছে আমার সেই গোপন কৌতূহলটা—সেই তুষারমানব সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের বিষয়ে।

উপহাসাস্পদ হবার ভয় নেই এখানে, কারণ সাক্ষাতে কোন মেম্বার নেই। এ ছাড়া আরও একটা কারণ আছে, তা হচ্ছে কাল রাতে আমি ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছিলুম। ঘুমটা আচমকা ভেঙ্গে গিয়েছিল কী যেন একটা আওয়াজে। আর তারপরেই শুনেছিলুম টেণ্টের বাইরে কাদের যেন পায়ে চলার শব্দ। উঠব-উঠব করেও ওঠা হয়নি। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

আর আজও তেমনি বলব-বলব করেও বলা হয়নি কথাটা বন্ধু-মহলে। সমস্যায় পড়েছিলুম। কে কেমনভাবে নেবে ভেবে।

আগেই বলেছি, হিমালয়ের নানা প্রান্তে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন সীমাহীন কষ্টস্বীকার করে, শুধু ভ্রমণের অব্যক্ত আনন্দে। কোথাও তুষারমানবের অস্তিত্বও নজরে পড়েনি। মাঝে মাঝে সন্দেহও হয়েছে—কথাটা কি সত্য? তুষারমানব কি প্রকৃত-পক্ষে একটা অবাস্তব কাল্পনিক জীব? তবে এ কথাও ঠিক এর সুপরিকল্পিত অনুসন্ধানও করিনি কখনও।

আজ কিন্তু যেন এককথায় আশাতীত সাড়া পেলুম শেরপাদের মধ্যে। ওরা বলল, কালকের পায়ের শব্দটা শুক্‌পাদের (তুষার-মানবদের) হলেও হতে পারে। আশ্চর্য কিছু নয়। তবে তার পদচিহ্নও নিশ্চয়ই দেখা যাবে আশপাশে কোথাও না কোথাও।

আমায় বোঝাতে ওরা আরও জানাল—শুক্‌পাদের দেখতে অনেকটা শ্বেত ভালুকের মত। সারা দেহ তামাটে লোমে ঢাকা, তবে মুখে কোন লোম নেই। লম্বায় সাধারণত পাঁচ-ছ ফুট। তবে বারো-তেরো ফুট অতিকায় শুক্‌পারও দেখা কখন-সখন মেলে।

প্রতিটি কথায় দেখলুম ওদের তুষারমানবের অস্তিত্বে অগাধ বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসকে ওরা আমার মধ্যে বদ্ধমূল করে দিতে কত না উৎসাহী। প্রায়-বৃদ্ধ একজন শেরপা তো এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঘটনাই বলে দিল। ঘটনাটা নাকি সংবাদপত্রেও উঠেছিল। ও বলল—

ওদের গ্রামে আট-ন বছরের একটি মেয়েকে একদিন রাতে একদল শুক্‌পা এসে ধরে নিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি অনেকদিন। সকলে ভেবেছিল, বোধ হয় তারা তাকে মেরে ফেলেছে। ফলে তার অনুসন্ধানও স্তিমিত হয়ে যায় ক্রমে ক্রমে।

হঠাৎ, সৌভাগ্যই বলতে হবে, একদিন তার দেখা মিলল তাদের

গ্রামের সেই জায়গাতেই যেখান থেকে তারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল —সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়, এক বীভৎস আকৃতিতে। কথা কইতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না সোজা হয়ে, হামা দিয়ে চলে, উদাস চাউনি চোখে। দেখলে মায়া হয়।

যা হোক, বেশ কিছুদিন পরে অবশ্য সে তার সব ক্ষমতাই ফিরে পায়। আর তখনই তার মুখ থেকে জানতে পারা যায় যে, শুকৃপারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল তাদের ডেরায়। একটা ছোট তিন-চার ফুট গহ্বরে, পাথরের আড়ালে। সোজা হয়ে দাঁড়ানও যায় না সেখানে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার তারা তাকে খেতে দিত সাদা সাদা গম-জাতীয় কী সব জিনিস। প্রথম প্রথম সে খেত না। খুব কাঁদত। তারাও বোধ হয় তার অসুবিধে বুঝে পীড়াপীড়ি করত না। তারপর সবই সয়ে গিয়েছিল।

গ্রামে ফিরে আসার আগের ক'দিন নাকি সে আবার খুব কান্নাকাটি শুরু করে। উপোসও করতে থাকে সমানে। আর তারই ফলে বোধ হয় তারা ভয় পেয়েই তাকে পৌঁছে দিয়ে যায় গ্রামে।

এদের কথা কতদূর সত্য তা যদিও তর্কসাপেক্ষ, তবু বলব তুষারমানবের অস্তিত্ব এককথায় ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতীতের বহু অভিযাত্রীর অভিজ্ঞতা-লিপিতে এর সমর্থন মেলে।

১৯২১ সনে হাওয়ার্ড বেরীর দল সর্বপ্রথম এই তুষারমানবের পদচিহ্ন দেখতে পান ২২শে সেপ্টেম্বর, যাত্রা-ক্যাম্প থেকে কিছুদূরে। নরম তুষারের ওপর অবিকল মানুষের পায়ের দাগের মত। তিব্বতী মালবাহীরা তখুনি তাঁদের জানায়, ওগুলো শুকৃপার পদচিহ্ন।

১৯২২ সনে জেনারেল ব্রুস কৌতূহলবশত রংবুকের লামাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। লামা তাঁর জবাবে জানিয়েছিলেন রংবুক ও তার সন্নিকটবর্তী হিমবাহে মোট পাঁচটা তুষারমানব আছে। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি আরও বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এই

রহস্যজনক জীবটির সম্বন্ধে, আর তার ওপর ভিত্তি করে তিনি গোটাকতক প্রবন্ধও লিখেছিলেন সংবাদপত্রে।

১৯৫১ সনে শিপটন উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে মিনলাং বেসিনের এক হিমবাহের ওপর তুষারমানবের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। অতি স্পষ্ট, সম্পূর্ণ অবিকৃত। মনে হয়েছিল, চব্বিশ ঘণ্টাও উত্তীর্ণ হয়নি তার অতিক্রমণের পর। তিনি ওই চিহ্ন ধরে বরাবর এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোন কিনারা করতে পারেননি শেষপর্যন্ত।

প্রঃ রোয়েরিচ-এর গ্রন্থ থেকেও জানতে পারা যায়, একজন ব্রিটিশ অফিসার নাকি এই হিমালয়ের বুকেই মানুষের মত এক অতিকায় উলঙ্গ প্রাণী দেখেছিলেন।

স্বয়ং তেনজিংও দেখেছেন এই প্রাণীকে একবার এক পলকের জন্য।

এ ছাড়া সংবাদপত্রে পড়েছি এর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভূরি ভূরি ঘটনার কথা। তার একটির কথা আজও ভুলিনি।

একবার এক অভিযাত্রী এখানকারই কোন এক তুষারমণ্ডিত গিরিশীর্ষে তুষারমানবের সন্ধান পেয়ে অনেক রাত অবধি অপেক্ষা করতে থাকেন একাকী এক শিলাস্তূপের আড়ালে। সেদিন ছিল চাঁদনী রাত। তাই বহুদূর পর্যন্ত নজরের কোন অসুবিধে ছিল না। অপেক্ষা করতে করতে একসময় তুষারমানবের দেখা মিলল। দ্রুতপদে সে যেন কী একটা ভারী জিনিস টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল পিচ্ছিল একটা ঢালু গ্লেসিয়ারের পথে। সঙ্গে সঙ্গে অভিযাত্রীটি প্রস্তুত হয়ে 'ফায়ার' করেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলি কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই বিঁধেছিল তুষারমানবের। কিন্তু আশ্চর্য, তবু সে পালিয়ে যায়। ফোঁটা ফোঁটা তার রক্তের দাগ ধরে বহুদূর পর্যন্ত গিয়েও তার কোন হদিসই করতে পারেননি অভিযাত্রীটি।

শেরপাদের মজলিস ছেড়ে চলে এলুম খালিফের কাছে গল্প করতে। বিকেল অনেকক্ষণ হয়েছে। খালিফকে এখন চাই-ই। একলা থাকতে মন চাইছে না কিছুতে, বোধ হয় আজ একলা বলেই।

১১ই এপ্রিল ॥ সোমবার

চমৎকার সকাল। স্বচ্ছ নীলাকাশ। পূর্বদিকে সূর্যোদয়ের সোনালী আভা। অপূর্ব দেখতে লাগছে সামনের তুষারমণ্ডিত অভ্রভ্র গিরিচূড়াগুলো! ওগুলো প্রত্যেকটি যেন এক-একজন সৈন্যাধ্যক্ষ। সূর্যালোকের প্রতিফলনে বিচিত্র বর্ণ বিচ্ছুরণে মনে হচ্ছে যেন ওরা মূল্যবান সাজসজ্জায় সুসজ্জিত হয়েছে। অবাক দৃষ্টিতে আমি চেয়ে আছি ওদের দিকে।

কাল অনেকক্ষণ আমি কাটিয়েছি খালিফের সঙ্গে গ্লেসিয়ারের ওপর ঘুরে ঘুরে, অনির্দিষ্ট ভাবে, ফলে কষ্টও পেয়েছি খুব। তাই আজ ঠিক করেছি ঘুরব না শুধু শুধু।

সাড়ে-ন'টার সময় লীডারের কথামত ঠিকই তৃতীয় দল এসে হাজির হল। ওই দলে আছে—চাও (চৌধুরী), গাম্বু আর সোনাম। ওদের মুখে শুনলুম গত ক'দিনের বিশ্রী আবহাওয়ার জন্যে ওদের সব কার্যসূচী একরকম মাটি হয়ে গেছে।

ওরা ছুখুং এলাকায় গিয়েছিল নতুন আওহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে। ইচ্ছে ছিল ওদের, ছুখুং ও নিকটবর্তী হিমরেখার শীর্ষারোহণ করা আর সেই সঙ্গে অক্সিজেন ব্যবহারের অভ্যাসটাও ভাল করে ঝালিয়ে নেওয়া। কিন্তু সব আশায় ওদের ছাই দিয়েছে এই প্রতিকূল আবহাওয়া।

গতকাল তবু যা হোক ওরা ছুখুং পাহাড়ে আরোহণ করে কিছুটা আশ মিটিয়েছে।

ওরা সকলেই সূর্যদগ্ধ। মুখ অনেকের পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তবে শরীর সকলের বেশ তাজাই আছে দেখছি।

সোনাম হঠাৎ এগিয়ে এসে সোল্লাসে আমার মুখের কাছে একটা থুপকা ধরে বলল, 'খাও।'

থুপকা আমার প্রিয়খাদ্য ও জানে। তিব্বতী খাবার এটা। চাল,

আলু, মাংস ও ডিম এক সঙ্গে পাক করে তৈরী, মাখন দিয়ে মাখা, লঙ্কা-মরিচের গুঁড়োর মিশ্রণে। অদ্ভুত সুস্বাদু।

লোভনীয় হলেও প্রত্যাখ্যান করলুম খেতে। বললুম, 'কফি খেয়েছি এইমাত্র। তাই রুচি নেই এখন খাওয়ার।'

ও কিন্তু শুনল না। জোর-জুলুম শুরু করল। সুতরাং বাধ্য হয়েই খেতে হল। সোহন পাশেই ছিল। বলতেও হল না, আলগোছে ও তুলে নিল ওটার ভারী অংশটা।

খাওয়াদাওয়ার পর সোহন প্রস্তাব করল ক্যাম্পের দক্ষিণ-পশ্চিমের একটা বড় পাহাড়ের চূড়ায় চড়তে যাবার। ধন্যবাদ জানিয়ে ওকে মৃদুস্বরে বললুম, গতকাল খালিফ আর আমি কোন চূড়াই বাদ দিইনি। সুতরাং আজকের মত ও অনুরোধরক্ষার অক্ষমতা মাপ করতে।

খালিফ পরিহাসপরায়ণ। এই সুযোগে সেই অভ্যাসটার সদ্ব্যবহার করল। সোহনকে কটাক্ষ করে ও আমায় বলল, 'নাই বা গেলে তুমি, সোহন একাই একশো। কাউকে কি ও ডরায়, দেখ না, একলাই হয়তো ও চড়ে আসবে ওর চূড়ায়।' সোহনের দিকে ফিরে বলল, 'কি গো সোহন, ঠিক বলিনি!'

সোহন রাগতভাবেই যেন একবার ওর দিকে তাকিয়ে সিধে চলতে লাগল ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যে। ফিরেও তাকাল না আর। সামনের চড়াইটা বেয়ে ও উঠছে। হাঁটু পর্যন্ত পা ওর ডুবে যাচ্ছে বরফে। ভ্রূক্ষেপ নেই।

খালিফ তবু শেষবারের মত ওকে খোঁচা দিতে চিৎকার করে বলল, 'ওটা 'রঙ্ রুট'। সাবধান।'

সোহন জবাবে কিছুই বলল না। শুধু ওর প্রতি একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্বিগুণ দ্রুততায় ওই পথেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাহাড়ে একলা যাওয়া, বিশেষ করে এই সমস্ত জায়গায়, বিপজ্জনক। তাই প্রয়োজনে ওকে সাহায্য করতে দু'জন শেরপাকে পাঠালুম ওর অনুসরণ করতে। কিছুক্ষণ বাদেই অবশ্য সোহন ফিরে এল।

লাঞ্চের পর বাকী দিনটা কাটানো হল শুধু গল্প-গুজবে, আবৃত্তি-গানে, রেডিও ও টেপ-রেকর্ডের হৈ-হল্লায়। মধ্যে কিছুক্ষণ ব্রিজেও বসা হয়েছিল শুধু চাওয়ের অনুরোধে।

সন্ধ্যেবেলা বেস্-ক্যাম্পের পোর্টাররা ফিরে এল। আর সেই সঙ্গে আগামী কাল বেস্-ক্যাম্প অভিমুখে আমাদের যাত্রাও পাকা হয়ে গেল। ওদের মুখেই শুনলুম, প্রথম দল গতকাল (১০ই এপ্রিল) ১নং ক্যাম্প স্থাপন করেছে ১৯,২০০ ফুট উঁচু আইস-ফলে।

বুঝলুম, আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কাজ আমাদের ঠিকই এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে।

১২ই এপ্রিল ॥ মঙ্গলবার

সকাল থেকেই প্রকৃতি আজ করুণাময়ী। তাই বুঝি আকাশ নীল নির্মেঘ। অনেক বৃষ্টি ঝরার পর যেমন আশ্চর্য আলোয় ভরে ওঠে বিশ্ব-নিখিল, তেমনি ঝলমল করছে চারদিক। মনে হয়, মেঘ কেটে গেল, কেটে গেল শাওন দিনের কান্নাঝরা লগ্ন, শেষ হল দুঃখ-সাধনার দুঃসহ প্রহর। তবে কি আমাদের সুদিন আসন্ন!

আশা জাগে—ভরসা জাগে! অথচ যতই পথের বাধা অতিক্রম করি, উৎকণ্ঠার তো নিবৃত্তি হয় না! আশঙ্কার ছায়া দোলে যদি 'আশা শুধু মিছে ছলনা হয়'।

তাড়ার কিছু নেই। পথ অল্প। যাব তো কাছেই, জায়গাটার নাম গোরকশেপ। বেশী চড়াই ঠেলতে হবে না। মোটে ৮০০ফুট। ধীরে-সুস্থে প্রাতরাশ সারা হল। তারপর ন'টা নাগাদ পা বাড়ালুম গোরকশেপের দিকে।

চলেছি একটা হিমরেখার ওপর দিয়ে। সমস্ত জায়গাটা তুষারময়।

সদ্য পড়েই জমে গেছে দশ-বারো ইঞ্চি ঘন হয়ে। পাথর নুড়ি সব চোখের আড়াল হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন একটা তুহিন রাজ্যের মাঝখানে এসে পড়েছি। এখানে তৈরী পথ নেই। তবে একদিন পোর্টারদের যাওয়া-আসাতে আপনা-আপনি একটা পথের ছাপ পড়ে গেছে জমাট-বাঁধা তুষারের বুকে।

খালিফ হেঁট হয়ে চলেছে আমার পাশে পাশে। হঠাৎ ও আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা, সাদা রঙ ছাড়া কি এখানে অন্য রঙের বালাইও থাকতে নেই? কী আজব দেশে এসে পড়লুম রে বাবা।'

চট করে উত্তর দিয়ে বসলুম, 'আরে দোস্ত, এ আর এমন কী দেখছ? সবুর কর। সব সফেদ হো জায়গা, ঘাবড়াও মৎ।'

খালিফ একটু ম্লান হাসল।

বীরকেশরী রঞ্জিৎ সিংহের কথা মনে পড়ল। 'সব লাল হো জায়গা'। মিথ্যে হয়নি তাঁর সে বাণী। ব্রিটিশরা জয়পতাকা তুলে ভারতের সর্বত্র লালে লাল করেছে আগে, তারপর ছেড়েছে হাল। আমার কথাও মিথ্যে হবে না। হিমপুরী হিমালয় আমার দিকেই আছেন জানি—এই আমার ভরসা।

মাথার ওপর জ্বল জ্বল করছে সূর্যের মানিক। উজ্জ্বল তার কিরণ-জাল বরফ থেকে ঠিকরে পড়ে উত্তাপ বিকিরণ করছে তীব্রভাবে। আর যেন জ্বলে যাচ্ছে আমাদের গা।

সোনাম কখন ওর গায়ের পোশাক খুলে ফেলেছে, শুধু গেঞ্জি-গায়েই চলেছে দেখছি। মহাজনো যেন গতঃ—বলে আমিও ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করলুম—তবে গেঞ্জির বদলে পাতলা শার্ট গায়ে দিয়ে চলতে লাগলুম। গরমের দাপটে সোহন, খালিফ ও আর সকলেও 'উইণ্ডপ্রুফ' ও সোয়েটার গা থেকে খুলে ফেলল। তবে ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ এখানে সূর্যদেব হাজির আছেন ততক্ষণ ঠিক আছে। কিন্তু যে-মুহূর্তে তিনি গা-ঢাকা দেবেন সেই মুহূর্তে বিপদ আসবে ঘনিয়ে। কারণ

তাপমাত্রা যাবে নেমে, আর সঙ্গে সঙ্গে গরম পোশাকে শরীর ঢেকে না ফেললে ঠাণ্ডা লেগে যাবার ষোল আনা সম্ভাবনা দেখা দেবে।

গোরকশেপের আর-একটা নাম 'লেক-ক্যাম্প'। এখানে নাকি একটা লেক আছে। সেটাই এই জায়গাটার এই নামের হেতু। নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং জন্ হাণ্ট। তখন থেকে লেক-ক্যাম্প নামেই এর প্রসিদ্ধি।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়েছে। তার খানিক পরেই আমরা এসে পৌঁছলুম গোরকশেপে। লেকের কাছাকাছি পড়ল আমাদের ক্যাম্প।

অনেক উৎসাহ নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে লেক দেখতে গেলুম। কিন্তু হায়! এ লেক শুধু নামেই লেক। জলের ছিটেফোঁটাও দেখছি না এখানে। সব জল জমে যে শক্ত বরফ হয়ে গেছে। এই নির্জন-লোকে পাথরের সংস্পর্শে এসে তরলমতি চঞ্চল জলকণাগুলোও সব যেন পাথরের মতই ধ্যানস্থ হয়ে গেছে। বুঝলুম দু'চার দিনের সূর্যতেজে এ যোগিনীদের ধ্যান ভাঙবার নয়। মানে, এ বরফ গলবার নয়।

এ জায়গাটার উচ্চতা প্রায় ১৭৩০০ ফুট হবে। আমাদের ক্যাম্পের তিন দিকে ত্রিভুজাকৃতি তিনটি হিমরেখার চিহ্ন পড়ে আছে। এর সর্বোচ্চ স্থানটা অতি মনোরম। সেখানে খালিফ আমায় টেনে নিয়ে গেল দুপুরের খাওয়া সারতে।

ওখান থেকে একবার দেখে নিলুম চারদিকটা। ওই দেখা যায় পুমোরি (২৩১৯০ ফুট) শৃঙ্গ—উত্তর-পশ্চিম বরাবর। মনে হচ্ছে কত কাছেই না! উত্তর-পূর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই বিশাল-দেহী নুপৎসে অতিকায় দৈত্যের মত। আর লোহ্‌লাকেও বেশ দেখা যায় উত্তর দিকটায় চোখ মেলে।

খালিফের সঙ্গে এইসব পাহাড় নিয়ে আলোচনা করতে করতে মধ্যাহ্ন-ভোজন সাঙ্গ করলুম। তারপর খালিফ হঠাৎ সটান লম্বা হয়ে পড়ল।

হাত ধরে টেনে বাধা দিতে যাই, 'আরে, ও কী, শুয়ে পড়লে যে?'

'দাঁড়াও, দুচোখ ভরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে দাও আগে।'—বলে ও আয়েস করে হাই তুলে আস্তে আস্তে চোখ দুটো বুজল।

আহা বেচারী! উপভোগ করুক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

কিন্তু আমি কী করি! পোড়া চোখ আমার যে ঘুম জানে না! তার তৃষ্ণার যে অন্ত নেই! এত দেখছি, তবু দেখেও সাধ মেটে কই!

বেরিয়ে পড়লুম। চতুর্দিক ঘুরে-ফিরে দেখতে।

স্তব্ধ চতুর্দিক। খালি বরফের রূপ। সাদা—তুলোর মত—খড়ির মত—দুধের মত। ফিকে ফিকে—হালকা আসমানী, সবুজ শেওলার ইশারা কোনখানে।

এই বরফের ওপরই ঘুরছি, দৌড়চ্ছি। কখনও দাঁড়াচ্ছি, কখনও বসছি, চলছি ফিরছি, বরফ নিয়ে শিশুর মতই ছোঁড়াছুঁড়ি করছি। কী জীবনই না কাটাচ্ছি এখানে!

এক-এক সময় মনে হচ্ছে, দিল্লি কোলকাতায় এখন তো গ্রীষ্মকালের তপ্ত দুপুর—সেখানে গরমে জীবজগৎ ছটফট করছে, একমুঠো শীতল শান্তির জন্যে ক্ষণে ক্ষণে আকাশলোকে বার্তা পাঠাচ্ছে, এক টুকরো বরফের জন্যে কতজনে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। আর আমরা এখানে মজাসে বরফের ওপর ঘুরছি, তারই ওপর ঘুমচ্ছি, এমনকি, বরফ গলিয়ে জল করে তৃষ্ণা নিবারণ করছি।

লক্ষ লক্ষ টন বরফ এখানে। ভাবছি এর কিছু পরিমাণ অংশ যদি এখন কোলকাতা দিল্লি নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আর দেখতে হবে না। একদিনেই সপ্তমে বৃহস্পতি চেপে বসবেন। তারপর গাড়ি-বাড়ি প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই আর পেতে বাকী থাকবে না। সবই আপনা হতে হবে।

দুর! কী সব ছাইপাঁশ ভাবছি।

নিজের আস্তানায় ফিরে এলুম। আর এসেই স্লিপিং-ব্যাগের

মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়লুম আরাম করে। মনে কী ভাবের উদয় হল জানি না, বিশ্বকবির একটি প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করে দিলুম সুর করে।

এই সময় খালিফ এসে ঢুকল আমার টেণ্টে। জিজ্ঞেস করল, 'গালাগালি দিচ্ছ নাকি ভাই কাউকে? যা বলছ তার তো একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না, একটু না হয় পরিষ্কার করেই বল।'

—সকলের বোঝবার জন্যে সব জিনিস নয়। তা ছাড়া এটা একটু উচ্চমার্গেরও বটে।

সোজা বেরিয়ে এলুম টেণ্ট ছেড়ে, কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়ে ওর মন্তব্যে।

অনেকটা দূরে নির্জনে একটা শিলাখণ্ডের ওপর এসে বসেছি, দেখি বাহাতুরের হাতটা বাগিয়ে ধরে লামু লাফাতে লাফাতে আমার দিকেই আসছে।

আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নেই। এ তুনিয়ায় সবই সম্ভব। লামুর সঙ্গেও বাহাতুরের ভালবাসা হতে পারে! তুদিন আগেই না এই লামু বাহাতুরকে সহস্র ঝাঁটা মারার আস্ফালন করেছিল! আজ কে বলবে বাহাতুরের একতরফা প্রেম বরাবর নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে?

আজ এককথায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—একাগ্রতা আর সংযম দিয়ে সব-কিছুই জয় করা যায়। সময়সাপেক্ষ হতে পারে তা, কিন্তু অসম্ভব নয় কিছু। থাক্ সে কথা। লামু একেবারে কাছে এসে গেছে। ফিক্ করে ও হেসে পূর্ণ তুটো চোখ মেলে চাইল বাহাতুরের দিকে, আর বাহাতুরও বুড়ো হলেও তেমন করে হেসে প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করল। আমি সেটা উপেক্ষা করে প্রশ্ন করলুম, 'কী ব্যাপার, আজ যে দেখছি তুজনে খুব ভাব!'

—না হবার আর তো কোন কারণ নেই। এখন ইনি আমাদের জামাইবাবু।

বিস্মিত হয়েও যতদূর সম্ভব স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করলুম, 'তাই নাকি? তা ভগ্নীটি কে?'

—লছমীদি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এ যাবৎ আমি লামুকেই সন্দেহ করে এসেছি। এখন দেখছি সবই উল্টো। লামু তা হলে ঠিকই আছে। ওর জেদ তাহলে ও বরাবরই বজায় রেখেছে। আর রাখবে নাই বা কেন? মর্যাদা নজর রুচিবোধ কোনটারই তো অভাব দেখি না ওর মধ্যে। আজও ও তাই খাঁটি সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে আমার সামনে। নিজেকে ও বিকিয়ে দেয়নি কোনোমতে কোনদিন, কোন-কিছুর বিনিময়ে, যাকে ও একবার প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশেষ করে সংসার-জীবনে যার সঙ্গে বয়সের কোন সামঞ্জস্য নেই। ধন্য মেয়ে লামু।

কিন্তু লছমী? সত্যিই কি ও কোথাও ভুল করল? না এটা ওর জীবনে অপ্রত্যাশিত প্রাপ্য? তলিয়ে বিচার করবার সময় নয় এটা। ওরা দুজন মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লেগে গেছে এরই মধ্যে আমার মৌন গাম্ভীর্য দেখে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভাব তাই মুখে টেনে বললুম, 'লছমী! লছমী আমাদের! এ তো ভাবাই যায় না। দাও, দাও, পাঠিয়ে দাও লছমীকে আমার কাছে।'

ওরা চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে বধূর বেশে লজ্জা কুণ্ঠা ভয়ের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব নারীমূর্তিতে লছমী আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আনন্দে বিহ্বল হয়ে বললুম, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও ঠিক হয়ে, একবার ভাল করে দেখি।'

'যান, কী যে বলেন? আমার ভারি লজ্জা করছে।'—কুণ্ঠিতভাবে লছমী বলল।

এও কি সম্ভব? দুদিন আগে যে লছমীর লজ্জার বালাই বলতেও কিছু ছিল না—স্বামী-শোকে অহরহ মুহ্যমানা—উপেক্ষিত জীবনের মর্মদাহে রিক্তসর্বস্বা—তার আজ লজ্জা করে, তাও কিনা আমার কাছে? বিস্ময়কে গোপন করে যতদূর সম্ভব সহজভাবে জিজ্ঞেস করলুম, 'খুশী হয়েছ লছমী? কিন্তু কেমন করে এটা ঘটল বলবে আমায়?'

লছমী কোনরকম ভণিতা না করে, কোনরকম প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে স্পষ্ট অথচ মৃদুস্বরে বলতে লাগল—

'এমন যে ঘটতে পারে তা আমারও একটু আগে জানা ছিল না। আমারও এখন কেমন যেন আশ্চর্য লাগে। সেদিন লামু ওকে ওভাবে অপমান না করলে হয়তো আমার জীবনটার গতি একমুখোই থাকত। কিন্তু ওই পোড়ামুখীই আমার সর্বনাশ করল।

'সেখান থেকে সোজা আমি সেদিন ক্যাম্পের দিকেই যাচ্ছিলুম। হঠাৎ নজরে পড়ল দূরে একটা নির্জন পাহাড়ের বাঁকে বাহাদুর বসে রয়েছে। কী খেয়াল হল, লামুকে ফিরতে বলে একলা আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ও তা নজরও করেনি। কাঁদছিল ও ছেলেমানুষের মত। এমন অসহায়ভাবে আমি কখনও কাউকে কাঁদতে দেখিনি। এমনি অসহায়ভাবে বার বার বোধ হয় আমিও কেঁদেছি—এমনি নির্জনে—লোকচক্ষুর আড়ালে—নিষ্ফল আক্রোশে। বড় মায়া হল। সমবেদনার সুরে ডাকলুম—বাহাদুর!

'তাড়াতাড়ি ও চোখটা মুছে আমার দিকে না চেয়েই গম্ভীরভাবে সাড়া দিল—কী?

—কাঁদছ কেন?

—কই, কাঁদিনি তো। কাঁদতে যাব কোন্ দুঃখে?

—ছিঃ, তুমি না পুরুষ। চোখের জল তোমার সাজে না।

—বার্ধক্যে সবই সাজে লছমী। আর্দ্রকণ্ঠে ও বলল—আমি কি জানি না, আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি। এ জীবনে সে ব্যর্থতা আর কিছুতেই মিটবে না, মিটতে পারে না। তাইতো আমার আজ কোন দাম নেই।

—কে বললে?

'বাহাদুর কী যেন বুঝল, কী যেন বুঝল না। হঠাৎ লাফিয়ে এসে ও আমার হাতটা চেপে ধরল। একটা কথাও আর বলতে পারলুম না।

'এ ক'দিন ও ওর সহযাত্রী বন্ধু-বান্ধবদের খুব খাওয়াচ্ছে।'

একটু থেমে, ম্লান হেসে লছমী আমায় জিজ্ঞেস করলে, 'আমি কি কিছু অন্যায় করলুম ডাক্তার সাব্?'

—না, কোন অন্যায় তুমি করনি।

অব্যক্ত আনন্দে লছমীর মুখ-চোখ ঝল্‌মল্‌ করতে লাগল।

১৩ই এপ্রিল ॥ বুধবার

মনটা ভার-ভার। সকাল থেকেই।

ভোরের দুঃস্বপ্নটা মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। অভিযানের ফলাফল বিশেষ যেন আশাপ্রদ হবে না—কোথায় যেন কী সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে—শীর্ষাভিযাত্রীরা নাস্তানাবুদ হয়ে ভাঙা মনে ফিরে আসবে, এই সব আর কী!

কিন্তু আমাদের আসল অভিযানের এইতো সবে শুরু। সুতরাং এখন তো আর আমার এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যায় না। নিজের মধ্যেই গোপন করে রাখতে হচ্ছে—আর তাই অজান্তে-বেঁধা কাঁটার মত তার বেদনার অস্তিত্বটা আরও বেশী করে বুকে বাজছে।

যা হোক, গোরকশেপ ছাড়তে হল এক সময়ে।

এগিয়ে চললুম বেস্-ক্যাম্প অভিমুখে। পথ চলার আনন্দ ও পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য ক্রমশ ভুলিয়ে দিল আমার মনের সকল ক্ষোভ। সকলেই খুশী মনে এগিয়ে চলেছে তালে তালে পা ফেলে। সবার খুশীর স্রোতে আমার একান্ত দুঃখের তরীখানা যে কোথায় কখন ভেসে উধাও হল, তা বুঝতেও পারিনি।

আজকের সারা পথটাই কুম্ভ গ্লেসিয়ারের হিমরেখার ওপর দিয়ে। জায়গাটা ছোট-বড় নুড়িতে বোঝাই। ওগুলো চলতি পায়ের বাধা। তাই সাবধানে চলতে হয় পদে পদে।

এ ক'দিনের রোদের তেজ একটু অস্বাভাবিকই বলতে হয়।

তাই বরফ গলে যাচ্ছে—আস্তে আস্তে এখানে সেখানে পাথর ও নুড়ির মাথাগুলো বেরিয়ে পড়ছে। এখান-ওখান থেকে নানা ধরনের শ্রুত-অশ্রুত শব্দতরঙ্গ ভেসে ছড়িয়ে পড়ছে বায়ু-সমুদ্রে। কারণ, বরফ গলে যাওয়ার জন্যে ওদের পরস্পরের একে অন্যকে বাঁধবার বা ধরে রাখার ক্ষমতা ফেলছে হারিয়ে—আর তাই আলগা নুড়িগুলো সব গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে বিদ্যুৎগতিতে পরস্পর ঠোকাঠুকি করতে করতে। তা ছাড়া বরফ গলে ছোট ছোট ধারায় প্রস্রবণ ও নদীর সৃষ্টি হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে—বেশ শুনতে পাচ্ছি কোন কোন জায়গায় গ্লেসিয়ারের তলা দিয়ে কুলকুল করে জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াই। শব্দস্পর্শরূপগন্ধময় বসুন্ধরার দিকে চেয়ে চেয়ে নবজাত শিশুর মুখে যেমন ভাষা বাঁধ মানে না, তেমনি ওই নবোদ্ভিন্ন তটিনীরাও অবাকবিস্ময়ে নৃত্যে ছন্দে গানের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে সমুখপানে। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।

বেস-ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে গেছি। আর বোধ হয় সিকি মাইল। এই দূরত্বটুকুর সৌন্দর্যের তুলনা নেই। এই পরিবেশের মাধুর্য বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। হেথা-সেথা তুষারগাত্রের বিচিত্র বর্ণালীর রঙ্‌বেরঙ্‌ ঠিকরে পড়ছে। কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও স্তিমিত। পায়ের তলায় সদ্য-পড়া তুষারের ফেনশুভ্র কার্পেট। সুকঠিন বরফের স্তম্ভ একটার পর একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে সার বেঁধে চতুর্দিকে—মর্মরমূর্তির মত। অনুপম তাদের দেহভঙ্গিমা। অনবদ্য তাদের গঠনশিল্পকলা। কে জানে কোন্ মহাশিল্পীর ভাবসৌন্দর্যে মণ্ডিত এরা! ধন্য সে শিল্পী! প্রণম্য চিরকালের।

বিচিত্র এই স্তম্ভমূর্তিগুলোর ঠমক। কোথাও আশ্চর্য কৌতুকে দণ্ডায়মানা নারীমূর্তি—যার তনুলাবণ্যে উর্বশীও মুখ লুকোয়। কোথাও বিহ্বল আত্মহারা উপলব্ধিতে শোভমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাতরু। কোন গাছে বা পাখি, কোন শাখে বা জীবজন্তু।

কোথাও বা সুদৃশ্য সিংহাসন পাতা। অবসরযাপনের যোগ্য ঠাঁই—বিশ্রামগ্রহণের বা সৌন্দর্য-উপভোগের—তারই মাঝখান দিয়ে বহমান জলধারা। কোথাও সূচ্যগ্রপরিমাণ বরফস্তূপের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিরাট প্রস্তরস্তূপ। নিঃসন্দেহে যেটাকে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের প্রথম বলে সোচ্চারে ঘোষণা করা যায়। কোথাও বা নানা কারুকার্যখচিত প্রাচীরগাত্রের স্মৃতিফলক, কাচের মত স্বচ্ছ, ঝকঝকে। সব-কিছু থেকে একটা হাল্কা বেগুনী আভার বিচ্ছুরণ।

এ যেন স্বর্গলোকের নন্দনকানন—কল্পরাজ্যের উপবন। এরই মধ্য দিয়ে আমাদের পথ গিয়েছে এঁকেবেঁকে। সে পথ ধরে একসময় বেস-ক্যাম্পে উপস্থিত হলুম। হঠাৎ চমকে উঠে শুনি আমাদের পূব আর পশ্চিম দুদিক থেকেই গুরুগম্ভীর এক ধ্বনি আরম্ভ হয়েছে।

অদূরে চেয়ে দেখি—অ্যাভালাঞ্চ নেমে আসছে, একটা নামছে পুমোরি থেকে, অন্যটা নুপৎসে থেকে। মনে হয়, পার্বত্য প্রকৃতি যেন আমাদের সাদর অভিবাদন করে অভ্যর্থনা করলেন।

এদিকে আমাদের গলার আওয়াজ পেয়ে ভগু, কেকী, কোলী আর জঙ্গল দৌড়ে টেণ্ট থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। ভগু আমায় জড়িয়ে ধরল। ও আমার পরম বন্ধু। ও-ও ডাক্তার।

ডাক্তার হলেও ও প্রধান প্রধান পর্বতারোহীদের সঙ্গে সমানে পা চালাতে অপারগ নয়। পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা যদিও ওর অপ্রচুর, তবু অবিচ্ছিন্ন তুষারপাতের সময়েও ও সমানে কাজ করে গেছে। ১নং শিবির স্থাপনে সাহায্য করেছে। দুর্বল ওর দেহ, কিন্তু মনোবল প্রচুর। মোট কথা, মানুষটি প্রশংসনীয়। নানা গুণে গরীয়ান বলেই।

আর কোলী, ওকে এখন পায় কে? ও-ও ফিরে এসেছে বেস-ক্যাম্পে ১নং ক্যাম্প স্থাপন করে এবং সেখানে এক রাত্রি ঘুমিয়ে। এবার ওর শুরু করবার কথা নন্দাকোট কাহিনী—হাজার বার যে কাহিনী ও শুনিয়েছে আমাদের। বেচারার আজ বড় দুঃখ, সব সদস্য আজ এখানে নেই। বিশেষ করে কুমার—ওর পরম দোস্ত।

সুতরাং ফলাও করে গলা চড়িয়ে উৎসাহের সঙ্গে ওর বিজয়কাহিনী বলবার মত ক্ষেত্র ও পাচ্ছে না। কেকী একদম নির্বিকার, আর আছে জঙ্গল, আঙ তেম্বা। ওদের কী বলবে, আসলে ওরাই তো সব ঝক্কি মাথায় নিয়ে এই ১নং ক্যাম্প স্থাপন করেছে। তাই ধৈর্য ধরে ওকে অপেক্ষা করতে হবে উপযুক্ত ক্ষেত্রের জন্যে।

ইতিমধ্যে শুনলুম ওর দুবার 'লোলা-পাস' অভিযান হয়ে গেছে। যদিও লীডারের আদেশ দেওয়া আছে, কেউ অনাবশ্যক ঝুঁকি নেবে না, বিশেষত সেই সমস্ত জায়গায় যে-সব জায়গা আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু কোলী অন্য প্রকৃতির—ও ওর শ্রেষ্ঠত্ব সকলকে দেখাবেই, জাঁক করে গুণপনা দেখানো যে ওর স্বভাব।

যেহেতু লোলা-পাসের সবটাই সবসময়ে কঠিন বরফে ঢাকা—সর্বনেশে অ্যাভালাঞ্চপাতের ভয় সর্বত্র, সেইহেতু ওকে ওখানে যেতেই হবে! অবশ্য ব্যর্থ হয়ে ও শুনিয়েও দিয়েছে, অব্যর্থ অজুহাত—লীডারের নিষেধানুযায়ী ও আর ঝুঁকি নেয়নি, নইলে নাকি দেখিয়ে দিত।

থাক্ সে কথা। প্রথম দল এখন তৈরী হচ্ছে রেস্ট ক্যাম্পে যাবার জন্যে, লোবুজে। লীডারও এখন ১নং ক্যাম্পে (১৯,২০০ ফুট)।

শুনলুম, দ্বিতীয় দল এখন কাজ করছে আইস-ফলে। কুমাররা ইতিমধ্যে ১নং ক্যাম্প থেকে অনেক ওপরে উঠে গেছে। আগেভাগে রাস্তা তৈরি করছে—হয়তো এতক্ষণে ২নং শিবির স্থাপন করেই ফেলেছে।

ঘুরে ফিরে জায়গাটা দেখতে শুরু করলুম।

বেস্-ক্যাম্প পড়েছে আমাদের কুম্ভ গ্লেসিয়ারের হিমরেখার ওপরেই। ওই গ্লেসিয়ার বেঁকে চলে গেছে পশ্চিমে পুমোরির দিকে আর ডুব মেরেছে নিজেরই ভাঙা পাথর, ধুলো ইত্যাদির কবরে। এর ওপরেই বসেছে আমাদের বেস্-ক্যাম্প।

১৯৫৬ সনে সুইস্ অভিযাত্রী দলও এখানে বেস্-ক্যাম্প ফেলেছিল। জায়গাটা মনোরম ও বিস্তীর্ণ। ওরা ঠিকই বলেছে, একটা গোটা রেজিমেণ্ট এখানে রাখা যায়। এছাড়া স্থানটা বেশ নিরাপদও বটে। এখানে এসে পৌঁছায় না কোন অ্যাভালাঞ্চ, উঁচু পাহাড় থেকে নেমে-আসা কোন ধস। অথচ আইস-ফলের সম্পূর্ণ দৃশ্য এখান থেকে সুস্পষ্ট দেখা যায়।

স্থানটা কৌটোর মত। বড় বড় পাহাড়ে তিন দিক ঘেরা। পশ্চিমে—পুমোরি, লিংট্রেন, খুবুসে; উত্তরে—লোহ্‌লা; উত্তর-পূর্বে—এভারেস্টের পশ্চিম শৃঙ্গ; পূর্বে—আইস-ফল; পূর্ব-দক্ষিণে—নুপৎসে। বেস্-ক্যাম্প থেকে এভারেস্টের চূড়া দেখা যায় না। কিন্তু আইস-ফলের মধ্য দিয়ে দেখা যায়।

আর দেখা যায় কালোবরণ লোৎসেকে (২৭,৮৯০ ফুট)। পবনদেবের লীলাক্ষেত্র ওই পর্বতটি। ওর উপরিভাগে সবসময় তীব্রবেগে বায়ু চলছে, তাই বরফ ওখানে জমতে পারে না। নীচের দিকটায় স্ফটিকশুভ্র বরফের আচ্ছাদন। বেস্-ক্যাম্প থেকে খালি ওর ওপরের ভাগটাই নজরে পড়ে।

কুম্ভ গ্লেসিয়ার একদিন হয়তো প্রসারিত ছিল ফ্যালাংকারপো পর্যন্ত। এখন ওখানে প্রচুর নুড়িনাড়া জড়ো হয়েছে। তারপর কালক্রমে এ স্থানের ব্যাপ্তি গেছে কমে। আজকের দেখা হিমরেখাগুলোই অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে।

ছোট-বড় অজস্র স্রোতে পুষ্ট বরফনদীর ধারাটি (কুম্ভ গ্লেসিয়ার) বয়ে গেছে পশ্চিম অববাহিকায়। এই অববাহিকার বা খাদের গভীরতা কেউই ঠিক জানে না। তবে খুবই যে গভীর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই গ্লেসিয়ারের প্রাণদায়িনী শক্তি বিরামবিহীন তুষারপতনে ও হিমবিগলিত জলধারায়। এদের উৎস নুপৎসে, লোৎসে ও এভারেস্টের পশ্চিম শৃঙ্গ।

হিমানী প্রপাত থেকে যে পাউডারের মত গুঁড়ো তুষার উড়ে

আসে তারাও যোগান দেয় এর জীবনরসকে। আর আনন্দঘন প্রাণবন্যার ব্যাকুল আবেগে ছুটে চলে কুম্ভ গ্লেসিয়ার।

আইস-ফল দেখলে ভয় হয়। কী বিচিত্র, কী ভয়াল ভয়ঙ্কর এর রূপ। এতে যে কত শত ফাটল—তার ঠিক নেই। কোনটা দৈত্যের মত মুখব্যাদান করে আছে, কোনটার সূক্ষ্মগর্ভে অন্ধকারের রহস্যময় বিচরণ। কোনটা তির্যক, কোনটা সরল রৈখিক। আড়াআড়ি, পাশাপাশি। সর্বত্রই অসংখ্য তুষারশৃঙ্গের মৌন মজলিস।

এদেরই মাঝখানে চলেছে প্রকৃতির অবিরাম ভাঙাগড়া। এই দেখছি চোখের সামনে দুর্লঙ্ঘ্য তুষার-প্রাচীর, মুহূর্তের পলকপাতে তাকেই বিলীন হয়ে যেতে দেখছি এক সুগভীর ফাটলের অতলান্তে। আবার দেখছি বর্তমানের এক গহ্বরের স্মৃতিকে অনাগত বিস্মৃতির মাঝখানে ঘুম পাড়িয়ে জেগে উঠছে এক অনতিক্রম্য শৈলশিখর। শুধুই তুষারে মণ্ডিত তার দেহসুষমা। এই নিয়ত ধ্বংস আর সৃষ্টিলীলার সম্মুখে এসে দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে যায়, বিহ্বল হয়ে যায় বুদ্ধিবৃত্তি।

আইস-ফলটা দৈর্ঘ্যে হবে প্রায় তিন মাইল, প্রস্থে আধ মাইল আর গভীরতায় বেশ কয়েক শো ফুট। এর স্মৃতি আমাদের কাছে এক চিরবিস্ময়ের সামগ্রী হয়ে রইল। সত্যি, এহেন স্থানে কাজ করা এক দুরূহ ব্যাপার। এই মাত্র পতাকা উড়িয়ে পথ তৈরি করা হল বটে, কিছুক্ষণ পরেই দেখা যাবে কোথায় গেল পথ আর কোথায়ই বা তার পতাকা। সব যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে এক জাদুমন্ত্রের অলৌকিক মায়াজালে।

তবু আমাদের কাজ এগিয়ে চলেছে বেশ দ্রুতই বলা চলে। এই খেয়ালখুশীর ধ্বংসরাজ্যের মাঝখানেই ১নং ঘাঁটি বসে গেছে, আর ২নংও শেষ হব-হব।

বেস্‌-ক্যাম্পটাকে ছবির মত লাগছে। যেন রাতারাতি এক স্বপ্নপুরী গড়ে উঠেছে। এই খেয়ালী প্রকৃতিরই কোন এক দুরন্ত

ইচ্ছে যেন প্রাণবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। নানা রঙের তাঁবু পড়েছে নানা জায়গায়। তিনটি মেস-টেণ্ট, তার মধ্যে একটি খাবার, একটি সভ্যদের থাকবার জন্যে, আর-একটি পোর্টারদের। বাকি সব ছোট ছোট টেণ্ট।

এখানে নানা আকৃতির পাথর সুলভ। তারই কিছু কিছু কুড়িয়ে কুড়িয়ে থাকে থাকে সাজানো হয়েছে। দেওয়াল উঠেছে। তেরপল খাটিয়ে রান্নাঘরের ছাদও এবার সম্পূর্ণ হল। আমার ডাক্তারখানাও কালকের মধ্যে তৈরি করে ফেলতে হবে।

মেস-টেণ্টের মধ্যে প্যাকিং বাক্স সাজিয়ে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হয়েছে খাবার ঘরের অন্তর্ভাগ, আর-একটা বহির্ভাগ। এ ছাড়া সভাও হবে আমাদের এখানে।

ও দিকটায় হয়েছে নন্দর বেতারকেন্দ্র। এখন বাকি আছে রাও-এর আবহাওয়া দপ্তর বসানো। আর আমার ডিস্‌পেন্‌সারির কাজও যে বাকি আছে, সে কথা তো আগেই বলেছি।

এই বেস-ক্যাম্প এখন চালু থাকবে বেশ কিছুদিন। সুতরাং বেশ লক্ষ্য রাখতে হবে, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পয়ঃপ্রণালী তথা ময়লানিষ্কাশনের দিকে। প্রথমেই জলসরবরাহের স্থানে একটা ফ্ল্যাগ লাগালুম, তারপর মলমূত্রত্যাগের স্থান ঠিক করে দিলুম।

আগেই বলেছি এখানে পাথরের ছড়াছড়ি। এক-একটা জায়গায় কী বিরাট বিরাট পাথরই না পড়ে রয়েছে। কোন-কোনটাকে বেশ বসবার রোয়াকের মত ব্যবহার করা যাবে স্বচ্ছন্দে। তবে বেশীর ভাগই বরফে-ঢাকা। অনুমান হয়, শিগগিরই এ বরফ গলে যাবে।

কোন কোন জায়গায় দুটো বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের মাঝখানে বেরিয়ে রয়েছে শক্ত বরফের চূড়া, জানিয়ে দিচ্ছে গ্লেসিয়ারের অবস্থান।

গোপালের ডাকে মেস-টেণ্টে ঢুকে কথা কইছি—এমন সময়

অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনলুম টেন্টের তলা থেকে। বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলুম—গোপালের কথায় আশ্বস্ত হলুম। ও যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে—টেন্টের নীচে দিয়ে গ্লেসিয়ারের জল বয়ে যাচ্ছে আর তার জন্যেই নাকি ওই আওয়াজ হচ্ছে, একটানা কল্‌কল্‌ করে। কখনও বেশ জোরে, কখনও অস্ফুট শব্দের মত।

কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর বেরিয়ে আসছি টেন্ট থেকে, সামনেই দেখলুম সেই প্রকাণ্ড কুকুরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক দরজার সামনেই। আদর করে পিঠটা ওর চাপড়ে দিলুম। ও আমাদের ধর্মের কুকুর। একটু যত্ন-আত্তি না করলে যদি অভিমান করে!

আজ সাধারণ পোর্টাররা ও শেরপানীরা সব চলে যাবে। সোহন, চাও, খালিফ ও গাম্বু খুব ব্যস্ত। ওরা মজুরি মিটিয়ে দিচ্ছে ওদের।

ওরা চলে গেলে সঙ্গে থাকবে আমাদের সাথী শেরপারা।

কিছু পোর্টারকে কিন্তু ছাড়া হল না। ওরা আমাদের নিয়মিত ভাবে কাঠ যোগাবে, রেশন এনে দেবে। প্যাংবুচ থেকে ওরা আনবে কাঠ আর নামচেবাজার থেকে আনবে আলু, শব্জী, সাম্পা, কেরোসিন ইত্যাদি।

বেলা বেড়ে চলেছে।

পোর্টাররা এবার চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ওই সঙ্গে শেরপানীরাও।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাই ভাবছি। আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় মনটা থেকে থেকে কেমন যেন ভারী হয়ে উঠছে।...এতদিন ওরা সুখে-দুঃখে আমাদের পাশে ছিল। সর্বতোভাবে ওরা আমাদের সাহায্য করে এসেছে, যখনই ওদের আমরা ডেকেছি। দিনের পর দিন একসঙ্গে পাশাপাশি চলায়, থাকায় অজ্ঞাতে ওদের সঙ্গে আমাদের যেন একটা নিবিড় সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। আজ এই বিদায়বেলায় বিদায়ের সাজগোছে ওদের দেখে মনটা কেমন যেন তাই টন টন করে উঠছে। সন্ধ্যেবেলা শেরপানীদের নাচ গান আর হবে না, পোর্টারদের

ক্রীড়া-কৌতুকের উল্লাসে ক্যাম্পগুলো আর গম গম করবে না, নিত্য ওদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কলহের মীমাংসার জন্যে ছোটাছুটি আর আমাদের করতে হবে না, শেরপানীদের ওষুধ দেওয়ার বদলে আমায়ও আর চিনি দিয়ে মন রাখতে হবে না—সব চুকে-বুকে গেল।

ওদের যে যখন পারছে একবার করে এসে আমায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাচ্ছে। এল শেরপানীরা দলে দলে। এল পোর্টাররাও একে একে। বিশেষ করে যারা উপকৃত হয়েছে আমার কাছে তারা এসে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। সেই যে পোর্টারটা যার নিউমোনিয়া হয়েছিল, সেই যে পোর্টারটা যার পিঠে দগদগে ঘা ছিল, সেই নান্টু, তাকে আঘাতকারী সেই ছোট ছেলেটা ও তার বুড়ো বাপ, সেই রাত্রি-বেলা ছাঙ খেয়ে দাঙ্গাকারী দুজন—এমন অনেকে এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে লামু, লছমী, বাহাদুর। লছমীর চোখ দুটো তো জলে টল টল করে উঠেছিল। তবে ও স্তম্ভিতও আমায় করে গেছে খুব। কবে ওকে একটা আমি পদ্য লিখে দিয়েছিলুম, সেটা ঠিকই ও সঙ্গে করে রেখেছে। যাবার সময় ও কাগজটা দেখিয়ে বলে গেছে—ইহজীবনে ও ওটা হাতছাড়া করবে না।

আরও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে তারা, যারা একদা কোন-না-কোন ভাবে আমার কাছে উপকৃত হয়েছে।

সকলেই নির্বিশেষে এখন আসছে যাচ্ছে, এল না এখনও শুধু ঝুরা। কোথায় গেল ও! খোঁজ করলুম চেনা-পরিচিতদের কাছে, কিন্তু কেউ সন্ধান দিতে পারল না ওর। শেষে বিরক্ত হয়ে চলে এলুম টেন্টে। টেন্ট নিস্তব্ধ নিঃঝুম। কেউ কোথাও নেই। সকলেই এখন ব্যস্ত বাইরে নানা কাজে। একটু বসে বিশ্রাম নেব ভেবে বিছানার কাছে এসে দেখি, বাক্সগুলোর ওপাশে ঝুরা পেছন ফিরে চুপটি করে বসে আছে। আনন্দে বুকটা দুলে উঠল। খুশী হয়ে বললুম, 'তুমি এখানে, আর আমি সারা দুনিয়া তোমায় খুঁজে মরছি। আচ্ছা ঠকান ঠকালে যা হোক যাবার দিনে।'

কোন জবাব দিল না ও।

আবার বললুম, 'বাড়িই না হয় ফিরছ, তার আনন্দে কি এমন করেই আমাকে ভুলে যেতে হয়? দেখা পর্যন্ত করতে চাও না।'

তবু ও কোন সাড়া দিল না।

—আর হয়তো দেখা হবে না তোমার সঙ্গে, তবু বলে যাই—ইহজন্মে কোনদিন তোমায় ভুলতে পারব না। আমার পরম স্নেহের পাত্রী, আমার ভাইঝি রাণুর মধ্যে তুমি বেঁচে থাকবে চিরকাল। রাজুটাই বা গেল কোথায়? রাসকেলটা এই সময় তোমায় যে একটু সাহায্য করবে তাও পারে না?

ঝুরা তেমনি আগের মত নিশ্চুপ। সন্দেহ হল। কাছে গিয়ে ওর মুখটা সস্নেহে নিজের দিকে তুলে দেখলুম, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ও ফুলিয়ে ফেলেছে।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে ঝুরা? কাঁদছ কেন? বল, বল কী হয়েছে?'

কিছুই ও বলল না। শুধু হাত দুটো ও আমার টেনে নিয়ে অতি অসহায়ার মত আরও প্রবলভাবে কেঁদে উঠল।

—ছিঃ, কাঁদে না। যাবার সময় কি কাঁদতে আছে? হাসি-খুশী মুখে যেতে হয়। রাজু দেখলে কী ভাববে বল তো? আচ্ছা, ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? ও কিছু বলেনি?

এতক্ষণ বাদে ও কথা কয়ে উঠল। ব্যাকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে ও শুধু বলল, 'জানি না—জানি না—জানি না।'

হঠাৎ যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গিরণ শুরু হল আমার বুকের মধ্যে। ধক ধক করতে লাগল বুকটা। তবে কি যা সন্দেহ করেছিলুম তাই-ই? রাজুকে হারানোর বেদনায়ই ও এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে? আর-একটু তলিয়ে দেখবার জন্যে বললুম, 'রাজুটাকে এখানে রাখতেই হবে, নইলে ডিস্‌পেন্‌সারির দেখাশোনা করবে কে? সত্যিকারের

কাজ তো এবার থেকেই আমাদের শুরু। প্রত্যেককে এখন থেকে ভীষণ রকম ব্যস্ত—'

'আমিও থাকব আপনাদের সঙ্গে। পারব না—পারব না আমি ফিরে যেতে।'—কথার মাঝখানে ঝুরা আর্তনাদ করে বলে উঠল।

এতদিনে, এতদিনে ঝুরা হার মানল। অহংকারের আগল আজ ওর ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। তাই ও অতি অসহায়ার মত আমার কাছে এসে আশ্রয় খুঁজছে। ছেলেমানুষ বেচারী। কিন্তু শুচিশুভ্র মেয়ের পূর্ণ মর্যাদাবোধ রয়েছে ওর মধ্যে। রাজুর কাছে ছোট ও হবে না কিছুতে। কিছুতেই ও ওর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। মরে গেলেও না। অথচ আজই চরম ফয়সালার দিন। আজই তার যা হোক একটা কিনারা না হলে চিরতরে ও হারাবে রাজুকে। খেঁই ঠিকভাবে না ধরলে আর পরিত্রাণ নেই—চিরবিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। যাত্রার আয়োজনও শুরু হয়ে গেছে। তাই ওর কান্না আর বাগ মানছে না। তাই ও ছুটে এসেছে আমার কাছে—কিনারার প্রত্যাশায়। কিন্তু এখানেও ও সহজে ধরা দেয়নি। একটু গোপন রেখেছে নিজেকে, যাতে আমিই উৎসুক হয়ে তন্নতন্ন করে খোঁজ করি কান্নার কারণটা; আর ও তারই অবকাশে সুবিধেমত জানিয়ে দেয় সব। উদ্যোগ-আয়োজন আমাকেই করতে হবে আর ও সেই আগেরই মত বীতরাগ দেখিয়ে যাবে রাজুর ব্যাপারে। কী আশ্চর্য এই মেয়েদের মন! কী প্রহেলিকাময় ওদের এই দাবি প্রেমাস্পদের কাছে। বোঝাই যায় না সব সময়। তবে এটুকু বেশ পরিষ্কার, ও আমারই ওপর নির্ভর করেছে অকপট বিশ্বাসে। তাই ওকে প্রতারণা করা আমার উচিত হবে না কোন মতে। সব জেনেও না-জানার ভান করা আর শোভন নয় এখন।

ডাকতে পাঠালুম তাই রাজুকে। ডিস্‌পেন্‌সারির বিশেষ কতকগুলো জরুরী কাজে ওকে ব্যস্ত রেখে এসেছি সেখানে। ও ছটফট করছিল তখন কাজ না করবার নানা অজুহাত দেখিয়ে। এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে সব। এখন বুঝতে পেরেছি তার কারণ। বুঝতে

পেরেছি, কাল থেকে কেন ও মলিন মুখে সবসময় আমার পিছু পিছু ঘুরেছে! কেন বলছিল—আমার আর থাকতে ভাল লাগছে না এখানে, চলে যাব, যেখানে হোক।

ওর কথার মর্মার্থ তখন বুঝতে না পেরে সরলভাবে বলেছিলুম—'সবই সয়ে যাবে রাজু এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হতে। আজ যে নতুন পরিবেশের বিপদ-আপদের ভয় তুমি করছ, ভবিষ্যতে দেখবে তার মধ্যে থেকেও কত তুমি সহজ হয়ে গেছ। হাসি পাবে তখন আজকের এই অর্থহীন উৎকণ্ঠার কথা ভেবে।'

—আপনি যা ভাবছেন সে ভয়ের কথা আমি বলছি না ডাক্তার সাব্। আমার কথা আপনি বুঝতে পারেননি, বোঝবার দরকারও বোধ করেননি।

মনের গোপন কোন এক ক্ষত থেকে নিঙড়ে নিঙড়ে ও যেন কথাগুলো বলেছিল। অতি-মাত্রায় সতর্ক হয়ে তাই ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—'কী কথা রাজু? তুমি অমন করে কথা বলছ কেন?'

—পারব না, বলতে পারব না। শুধু জেনে রাখুন আমি যাবই। কেউ আমায় আটকাতে পারবে না।

ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে ও কোনরকমে কথাগুলো শেষ করে ছুটে পালিয়েছিল।

সমস্ত রাত্রি আমি ভেবেছি ওর কথাগুলো। কেন হঠাৎ ও অতখানি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠল? কী এমন হয়েছে? অথচ এই সহজ কথাটা কিছুতেই মাথায় আসেনি। এমন আহাম্মুক আমি!

রাজু মলিন মুখে সামনে এসে দাঁড়াল। পুরনো দুষ্টুমির লোভটা সংবরণ করতে পারলুম না কিছুতেই। বললুম, 'ঝুরা কোথায়, জান? খুঁজে খুঁজে তো ওকে সারা হয়ে গেলুম। কোথাও দেখতে পেলুম না। লছমী, লামুরাও এখন হাল ছেড়েছে।'

'সে কী? ঝুরা চলে গেছে! কাউকে কিছু না বলে! জানতুম, জানতুম এই-ই হবে।'—উদগত অশ্রুকে ঢাকতে ঢাকতে

ও ছুটে চলে যাচ্ছিল বোধ হয় ঝুরারই সন্ধানে। দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরে ফেললুম। বললুম, 'তা কি ও যেতে পারে রে পাগল, আমার হাত থেকে? ধরে রেখেছি ওকে, দেখবি চল্।'

—ও আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে।

বাক্স-পেঁটরার কাছে নিয়ে এলুম ওকে। ঝুরাকে দেখামাত্র আনন্দাতিশয্যে ও চিৎকার করে উঠল, 'ঝুরা!'

ঝুরার আনন্দও আর বাঁধ মানছে না। মুখে-চোখে তার স্পষ্ট অভিব্যক্তি। কিন্তু আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বাইরে চলে এলুম। উদার প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখলুম— কী সুন্দর! কী অদ্ভুত! এমন সুন্দর করে বোধ হয় কোন-কিছুকেই কোনদিন দেখিনি। সব-কিছুকেই যেন ভাল লাগছে। সব-কিছুতেই যেন দয়াময়ের অবিমিশ্র করুণার স্পর্শ খুঁজে পাচ্ছি। কী যেন এক মধুর অনুভূতিতে প্রাণ-মন আমার উত্তল হয়ে উঠছে, তা ব্যক্ত করার ক্ষমতা আমার নেই, শুধু মূক হয়ে হৃদয়ঙ্গম করা ছাড়া।

রাজু, ঝুরা বেরিয়ে যাচ্ছিল। ডাকলুম ঝুরাকে। ওরা দুজনেই সামনে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করে জোর করে ঝুরার হাতে গুঁজে দিয়ে বললুম, 'নাও। ছোটবোনের বিয়েয় দাদার কিছু উপহার। আর তো কখনও দেখা হবে না, তাই মিটিয়ে রাখলুম পাওনাটা। ফিরিয়ে দিলে কষ্ট পাব খুব।'

ঝুরা আরক্ত হয়ে মাথা নিচু করল, আর রাজু লজ্জিতভাবে হাসতে লাগল মুখ ফিরিয়ে।

মুহূর্তকাল।

তারপর ভীষণ গম্ভীর হয়ে রাজুকে কাজে যেতে বললুম। ও চলে গেল।

ঝুরাকে বললুম, 'তোমার কাছে আজ কিন্তু আমি একটা জিনিস চাইব, দেবে?'

—কী, কী জিনিস বলুন। নিশ্চয়ই দেব।

—ভেবে দেখ, মুখ ভার হয়ে যাবে না তো?

—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

সত্যিই ও আমার পা ছুঁল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'কী সে জিনিস যা আমার মত ভিখিরিনীর কাছে আপনাকে চাইতে হচ্ছে?'

—রাজু—রাজুকে আমার চাই। ও ছাড়া ডিস্‌পেন্‌সারি চালাবার দ্বিতীয় লোক আমার নেই। কে আমায় সাহায্য করবে এই সঙ্কটজনক অবস্থায়? ফেরবার পথে, কথা দিচ্ছি, তোমার রাজুকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যাব অক্ষত অবস্থায়। কোনও ভয় নেই।

ঝুরার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবু সন্দেহমুক্ত হতে গিয়ে বললুম, 'কী, পারবে না? তবে থাক্‌। যা ভবিতব্য তাই হোক। তুমি যাও।'

এবার ও যেন অতিকষ্টে আনন্দের ভাব মুখে ফুটিয়ে বলল, 'পারব, পারব। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।' তারপর দৌড়ে চলে গেল ও রাজুর কাছে।

অনেকক্ষণ বসে ছিলুম সেইখানেই। কী যেন সব ভাবছিলুম এলোমেলো পাগলের মত। এমন সময় হাঁফাতে হাঁফাতে রাজু এসে বলল, 'তাই হবে, তাই হবে ডাক্তার সাব্‌। আপনি যা বলেছেন তাই হবে।' তারপর যেমনভাবে ও এসেছিল তেমনিভাবেই ও অন্তর্হিত হয়ে গেল।

* * *

পোর্টার ও শেরপানীরা সব চলে যাচ্ছে নানা সাজে, নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিমায়—মিলেমিশে, হল্লা করে, ঠিক যেমনভাবে ওরা এসেছিল। ওদের সঙ্গে আমারও মন চুপিচুপি পালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান বিধিনিষেধের এলাকা ছেড়ে বাধাবন্ধহীন হয়ে সেই খুশীর দেশে,

সেই বাঞ্ছিত আশ্রয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—কোথায় যেন আমি ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা ছুটতে ছুটতে গিয়ে পৌঁছলুম আমার আবাল্যের লীলাস্থল সেই বহুপরিচিত দেবভূমি খড়দহে। সন্ধ্যা তখন যেন ঘনিয়ে আসছে পৃথিবীর বুকে। বাড়ির গায়েই প্রবহমান পুণ্যতোয়া গঙ্গার দিকে একবার ফিরে তাকালুম। দখিনা হাওয়ায় খল্‌খল্‌ ছল্‌ছল্‌ করে ছুটে চলেছে তার উদ্দাম জলস্রোত। আকাশে অস্তরাগের রঙের সমারোহ তখনও নিঃশেষে মিলিয়ে যায়নি। অপূর্ব এক প্রশান্তি নিয়ে বাড়ির দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়ালুম। ডাকতেও আর হল না কাউকে। মা সামনেই দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখামাত্র সস্নেহে বলে উঠলেন—'এসেছিস্‌ রে, আয়, আয়। কতদিন তোকে দেখিনি। থেকে থেকে মনটা কী রকম যে হু-হু করে ওঠে তা আর তোকে কী বলব? ভগবান জানেন।'

হাসতে হাসতে আমি মায়ের পায়ে মাথা রাখলুম।